এই লেখকের

কর্ণাটরাগ, তীরভূমি, দ্বিতীয় অন্তর, সীমান্ত শিবির, অস্তি গোদাবরী তীরে (দেবকন্যা), সিন্ধুর টিপ, নীলাঞ্জন ছায়া, নয়ানজুলি, পটমঞ্জরী, জলকন্যার মন, সীমাস্বর্গ, বিদিশার নিশা, শান্তির স্বাক্ষর, নতুন নাম নতুন ঘর, অপরিচিতের নাম, আনন্দ ভৈরবী, সুদক্ষিণা (এই তীর্থ), মাস্তুল (ঢেউ ওঠে পড়ে), কতো আলোর সঙ্গ, স্বপ্নসঞ্চার, নীলসিন্ধু, শ্বেতকপোত, এ জন্মের ইতিহাস, সাক্ষী বালুচর

প্রভৃতি

"ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতি-স্নিগ্ধৈর্জনপদবধূ-লোচনৈঃ পীয়মানঃ।"

—কালিদাস—[মেঘদূতম্ ॥ পূর্বমেঘ ॥ ১৬]

"কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা
জনপদবধূ কিঙ্কিনী কল-কলনা,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয় পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।"

—রবীন্দ্রনাথ

জনপদবধূ

এ যুগের মানুষ আমি, কালও আধুনিক, কিন্তু ও অঞ্চলে সেদিন যখন পা ফেলেছিলাম, মনে হয়েছিল যেন সত্যিই সুপ্রাচীন কোনও জনপদে এসে পড়েছি। এদিককার বাড়িগুলো সাধারণত যেমন হয়, তেমনি নিচু-নিচু আর একতলা,—কিন্তু শ্রীর দিক থেকে একটা প্রাচীনত্ব বহন করে চলেছে। সরু সরু থামওয়ালা বারান্দা, জাফরি-কাটা খিলান, মোটা কাঠের দরজায় নানান রকমের ফুল, লতা-পাতা আঁকা। এমন কি, অলিন্দে ভবন-শিখীরও অভাব নেই দেখেছিলাম। পেখম ধরে নি তখন, কিন্তু লম্ববান বিচিত্র পুচ্ছ ধারণ করে মাথার ঝুঁটি দুলিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঝরোঝরো বর্ষণের দিনে মেঘডম্বরুর তালে-তালে ভবন শিখীকে নাচাবার মতো ঝঙ্কৃত-কঙ্কণ তরুণী পথিক-ললনারও যে অভাব হবে না, জানালার ফাঁকে দুটি-একটি ভাবাকুললোচনার মুখ দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলাম।

বাড়ির দরজায় সিঁদুরে-আঁকা একটি চক্রবন্ধনীর মধ্যে স্বস্তিকা-চিহ্ন মুদ্রিত রয়েছে দেখে আমার সঙ্গী বললে,—হ্যাঁ, ঠিকই এসেছি। এই বাড়ি।

বলে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে দরজায় বার-কয়েক ঘা দিলো। খুলে গেল দরজা।

ভাগ্য ভালো, লম্বা প্যান্টের ওপরে সাদা-হাফশার্ট-পরা হাই-পাওয়ারের-পুরু-কাচের-চশমা চোখে আমাদের সেই চেনা ছেলেটিই দরজায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল, আমার সঙ্গীকে বললে,—আরে আসুন, আসুন। আপনারা কিন্তু দু ঘণ্টা লেট। আমরা বসে বসে শেষ পর্যন্ত কাজে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম আর কি!

আমাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে আমার সঙ্গী রসিকতা ক'রে বললে,—লেট হই আর যাই হই, শেষ পর্যন্ত এসেছি তো?

হেঁ-হেঁ ক'রে হেসে ছেলেটি বললে,—তা যা বলেছেন, এসব ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে এসেও শেষ পর্যন্ত অনেকে আবার পিছিয়ে যায়।

বছর সাতেক ধ'রে এসব অঞ্চলে কর্মব্যপদেশে ঘোরাঘুরি করছি,

সুতরাং ওদের ভাষা বুঝতে একটুও কষ্ট হচ্ছিল না আমার। আমি ততক্ষণে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম, যে ঘরখানায় আমরা প্রবেশ করেছি সেই ঘরখানা।

ছোট্ট ঘর। প্রকাণ্ড একটা তক্তপোশ, বলা যায় সারাটা ঘরই জুড়ে রয়েছে সেটা। তক্তপোশের ওপরে সাদা ধবধবে একটা চাদর রয়েছে টান-টান করে পাতা। তার ওপরে এক কোণে একটা কাঠের হাতবাক্স আর জলচৌকি পাশা-পাশি সাজানো। জলচৌকির ওপরে একটা লাল খেরো-বাঁধানো খাতা, বিচিত্র একটা গোলাকার দোয়াত, আর পাখির পালকের কলম।

ছেলেটি আমাদের তক্তপোশের ওপর বসিয়ে রেখে ভিতরে চলে গেল। ভিতরের দিকে একটিমাত্র দরজা। সেও এমনি মোটা আর কালো কাঠ দিয়ে তৈরি, নানান নক্শা কাটা। নক্শার মধ্যে শতদল পদ্মই সাজানো রয়েছে বেশি। দরজার মাথায় ছোট্ট একটা কুলুঙ্গিতে ছোট্ট একটি কাঠের মূর্তি—গণেশের। ললাটে কুঙ্কুমের টিপ, দুটি একটি দোপাটি ফুল পড়ে আছে পায়ের কাছে, আর জ্বলছে ক্ষুদ্রাকার শ্বেতপাথরের ধূপদানিতে কয়েকটি ধূপ।

এরই মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম, ভিতরে যাবার দরজাটি ওরা সব সময়ে ভাল করে বন্ধ রাখে। এই যে ছেলেটি ভিতরে গেল, যাবার সময় সন্তর্পণে কপাটটি টেনে ভেজিয়ে দিতে তার ভুল হয় নি। কিন্তু মুহূর্তের সেই ফাঁক দিয়ে কিছু দেখতে না পেলেও শুনতে পেয়েছিলাম একটি স্বর। মেয়ে-কণ্ঠেই সুরেলা একটা তান উঠেছে—ভৈরবীর মতোই করুণ আর আবেগ-বহুল।

আমার সঙ্গীর নাম পান্নলু। মধ্য বয়সী, দোহারা চেহারা, ঘাড়ের কাছটা একটু নুয়ে প'ড়েছে, দেহের বর্ণ ফরসাই বলা চলে। সুগন্ধি পানের খিলি প্রায় সবসময়ই তার মুখে থাকে, মাঝে মাঝে নির্বাক হয়ে সে ঝিমোনোর মতো ভঙ্গি ক'রে জাবর কাট্‌তে থাকে। এবার সে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু জাবর কাট্‌ছিল না, বরং আমার মতোই অবাক হয়ে দেখছিল চারিদিকে তাকিয়ে। ঘরের দেওয়ালগুলোই সব থেকে অদ্ভুত। পুরু পাথরের দেওয়ালের কোনো কোনো জায়গায় স্থাপনা করা হয়েছে কালো পাথরের কয়েকটি দেবমূর্তি, তেল মাখিয়ে উজ্জ্বল ক'রে রাখা। প্রতিটি মূর্তিরই ললাটে কুঙ্কুম, পায়ে দোপাটি ফুলের পাপড়ি আর শ্বেতপাথরের ধূপদানিতে ধূপ। ফলে, সমস্ত ঘরটি আচ্ছন্ন করে আছে ধূপের গন্ধ। ঘরখানার বাইরের দিকে ছোট্ট একটি জানালা দিয়ে চিকচিক

করতে করতে ঘরে এসে ঢুকছে দুটি-একটি চড়াই পাখি, কোনও-কোনও দেবমূর্তির পায়ের কাছে এসে বসেছে, আবার তার পরেই উড়ে যাচ্ছে।

পাম্বলু বললে,—মনে হচ্ছে বাবু, সত্যি-সত্যিই এক দেবালয়ে এসেছি, না ?

বললাম,—হ্যাঁ। তাই বটে।

মূর্তি ছিল নয়টি। সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু আর কেতু—নবগ্রহ।

বললাম,—তুমি এখানে আগে কখনও আসো নি ?

পাম্বলু বললে,—এসেছি। সে বেশ কিছুদিন আগে। এ ঘরের সঠিক চেহারাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।

তারপরে, একটু থেমে, অদ্ভুত এক ভয়-ভয়-করা কণ্ঠে ব'লে উঠলো,—আমার কিন্তু ভাল বোধ হচ্ছে না। কী বাবু, ফিরে যাবেন ?

সংক্ষেপে বললাম,—না।

পর-মুহূর্তেই ভিতরের দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকলো সেই ছেলেটি, তার সঙ্গে একটি লোক। লোকটি আসার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য আবার শুনলাম সেই অপরূপ স্বরবিস্তার, একাকিনী ভৈরবীর সেই সকরুণ মিনতি!

লোকটি মধ্যবয়সী, এবং চেহারা ঈষৎ স্থূল। মাথার চুল বেশ ঘন, আর বড়ো বড়ো, চোখদুটি একটু কোটর নিবিষ্ট এবং তীক্ষ্ণ। গায়ে সাদা একটা ধবধবে সার্ট ছিল, কাঁধে তোয়ালে। পরণের ধুতি সাধারণ ভাবেই পরা। আমাদের নমস্কার জানিয়ে জলচৌকির সামনে এসে বসলো।

আজ এর সম্বন্ধে আমার যে ধারণাই হয়ে থাক্, সেদিন ওকে দেখে মনে হয়েছিল, ভয়ানক গম্ভীর স্থূলরুচিসম্পন্ন একটি লোক। পরে একদিন হাসতে হাসতে ওকে বলেওছিলাম কথাটা। বলেছিলাম, এই পর্বতপ্রমাণ দেহটির মধ্যে তোমার ওই উজ্জ্বল মণির মতো মনটি লুকিয়ে রেখেছিলে কোথায় ?

শুনে মৃদু একটু হেসেছিল, বলেছিল,—বাবুজী, আমি সারা হিন্দুস্থান ঘুরে বেড়িয়েছি এক সময়, আমার কী মনে হয় জানো ? এত সুন্দর দেশ বোধ হয় আর কোথাও নেই। না, শুধু বাইরের সৌন্দর্যই নয়, আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যে যে সুন্দর এক রাজ্য আছে, তা আবিষ্কার করতে পারলে মহান এক ভাবে বিভোর হয়ে যেতে হয়।

কিন্তু সে সব পরের কথা পরে হবে। লোকটি পাম্বলুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো,—ভদ্রলোক কোথাকার ?

পান্থলুকে আগে থাকতে সব শেখানো ছিল, সে আমার পরিচয় না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে বসলো,—এসব না বললে চলবে না বুঝি ?

লোকটি ততক্ষণে তার লাল-খেরো-বাঁধানো খাতাখানা খুলে হাতে পাখের কলম তুলে নিয়ে বসে আছে, বললে,—কেন চলবে না ? কিন্তু বাবুজীকে একবার আমার সামনে আসতে হবে।

নির্দেশমতো ওর সামনে গিয়ে বসলাম। দুই চোখের প্রখর দৃষ্টি মেলে সে আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। এতে পান্থলু আশ্চর্য বোধ করলেও আমি অবাক হই নি। নানান দেশে নানান ধরনের লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে আমাকে। আমি ওর দৃষ্টি দেখেই বুঝলাম, ও আমার মধ্যে কী দেখতে চায়। আমি ওদের ভাষা ততদিনে খানিকটা শিখে গেছি, মোটামুটি বলতেও পারতাম, বললাম,—না, আমার স্বাস্থ্যে কোনও খুঁত নেই।

মৃদু একটু হেসে লোকটি বললে,—চোখের কোণ দেখেই আমরা তা বুঝতে পারি বাবুজী। সেটুকু শিক্ষা ভগবানের কৃপায় আমাদের আছে।

তারপরেই হাত বাড়িয়ে বললে,—তিরিশটি টাকা লাগবে।

পিছন থেকে হৈ-হৈ করে উঠলো পান্থলু,—কেন ? তিরিশ টাকা কেন ? তেমন তো কথা ছিল না। কী হে বিশ্বনাথম্ ?

চোখে-চশমা ছেলেটির নাম বিশ্বনাথম্, সে মাথা চুলকে আমতা আমতা ক'রে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে লোকটি বললে,—পান্থলু, বাবুজীকে দেখেই বুঝেছি উনি বড়োঘরের মানুষ। ওঁকে আমরা বড়ো আসনেই অভ্যর্থনা করতে চাই।

পান্থলুকে আর-কোনও কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে লোকটির হাতে আমি গুঁজে দিলাম তিরিশটি টাকা। সে সেটা বাক্সে রেখে তার খেরো-বাঁধনো খাতাটা টেনে নিয়ে কী যেন লিখতে লাগলো।

বাইরে থেকে ময়ূরের কেঙ্কার ভেসে এলো এই সময়। বারান্দার খোপে-খোপে পায়রাগুলিও বোধ হয় ডাকতে লাগলো—বক্‌বকম্ বক্‌বকম্।

পান্থলু বললে,—বৃষ্টি এলো ব'লে।

বিশ্বনাথম্ উত্তর দিলো,--না। মেঘ করে এসেছে সবে। তবে, মেঘ হয়ত উড়ে যাবে না, বর্ষা নামতেও পারে।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই বাইরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো আরেকটি

মানুষ, কণ্ঠে গুণ গুণ করছে একটা গানের কলি—"গরজে ঘটাঘন, কারে কারে পাবস ঋতু আই, দুলহন মনভায়ে !"

স্বর কানে যেতেই মুখ তুললো স্থূলকায় মানুষটি, বললে,—আরে এসো, নটরাজন। কবে এলে ?

আগন্তুকের বয়স তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, গায়ের রং কালো হলেও বেশ একটা লাবণ্য আছে চেহারায়, চোখ-মুখও বুদ্ধিদীপ্ত। সে তক্তপোশের এক কোণে বসে পড়ে বললে,—এই তো আজ এলাম।

এদেশীয় লোকের মুখে হিন্দী গানের ভাষা শুনে আমিও একটু অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম লোকটির মুখের দিকে। আমাদের সবার প্রতিই একবার সে চোখ বুলিয়ে নিলো, নিরুৎসুক দুটি বড়ো বড়ো আয়ত চক্ষু। বললে,—আসছি সেই জয়পুর থেকে। বেশ কাটলো কয়েকটা দিন।

স্থূলকায় মানুষটি বললে,—উঠেছো কোথায় ? সরস্বতী আম্মার ওখানে ?

নটরাজন বললে,—হ্যাঁ, আমার আর কে আছে বলো ?

তারপর চশমা-পরা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললে,—কী হে ? কেমন আছো তোমরা বিশ্বনাথম্ ? ভামতীর খবর কী ?

ছোকরাটি ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি মুখে তর্জনী স্থাপনা করে ইঙ্গিতে বোধ হয় জানাতে চাইলো,—চুপ ওসব কথা এখানে নয়।

স্থূলকায় লোকটি সোজা হয়ে বসে ছিল ততক্ষণে, আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে,—আচ্ছা বাবুজী, তা হলে এবার আপনারা আসুন। ঠিক সন্ধ্যার সময় আসবেন।

উঠে দাঁড়ালাম আমরা। পান্থলু বললে,—আমি আসবো না সঙ্গে, বাবুজী একাই আসবেন। দেখবেন যেন কোনও অসুবিধা না হয় ওঁর।

হাসলো সে, বললে,—কিছু ভাববেন না, আপনার বাবুজী জলে পড়বেন না এসে।

কপাট পেরিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে তখনও শুনছি নটরাজনের কণ্ঠস্বর। গুণ গুণ ছেড়ে এবার সে জোরেই তান ধরেছে,—গরজে ঘটাঘন—

যে-বাড়িতে এসে উঠেছিলাম, সেটি ঘনশ্যামদাস বলে এক ব্যবসায়ীর গদির ওপরকার দোতলা। দোতলাবাড়ি এ-অঞ্চলে নেই বললেই চলে, যে দু-তিনটি

আছে, তার মধ্যে হলদে, গোলাপী আর সবুজ—পর্যায়ক্রমে এই তিন রঙে রঙ-করা এই বাড়িটি অন্যতম।

যে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে এখানে আমি এসেছি, তাদের সঙ্গে ঘনশ্যামদাসজীর ব্যবসায়সূত্রে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার জন্যই আমার পক্ষে এই অভাবিত স্থানলাভ করা সম্ভব হয়েছে, নইলে এ-অঞ্চলে এক দূরবর্তী ডাক-বাংলোটি ছাড়া আর-কোনও বাস করবার উপযুক্ত জায়গা নেই বললেই চলে।

সংকীর্ণ ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে বারান্দায় ইজিচেয়ারে ধপ করে এলিয়ে দিলাম নিজেকে। বেশ বেড়ে গেছে বেলা। আমার কাছে কাজের ব্যাপারে লোকজন এইবার আসতে শুরু করলো ব'লে।

আমাদের বাড়িটির সামনেই ছোট্ট একটি ত্রিকোণ পার্ক। নাম দিয়েছে —গান্ধীপার্ক। এক পাশে একটা পেট্রোল-পাম্পের দোকানের সামনে ধূলিধূসরিত সবুজ রঙের একটি বাস অপেক্ষা করছে; যাত্রী ভর্তি হয়ে যাওয়ায় কণ্ডাক্টার আর যাত্রী নিচ্ছে না, কিন্তু কতকগুলো লোক বাসে ওঠবার জন্য কলরব করতেও দ্বিধা করছে না। লোকগুলোর মধ্যে কারুর কারুর মাথায় পাগড়ী, আর, সকলের কাঁধেই তোয়ালে।

অদ্ভুত এই জনস্থলীটি। নানা কারণে এর নাম প্রকাশ করা যাবে না। একটি সুবৃহৎ পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই জনপদ। পার্বত্য ভেষজ, তামাকপাতা এবং আরও বহুবিধ দ্রব্যাদির বড়ো ব্যবসায়কেন্দ্রও একে বলতে পারা যায়। অথচ, মূল শহরতলি থেকে বহুদূরে এই পল্লী, রেল-লাইন সেই চল্লিশ মাইল বাসের ধূলিধূসরিত পথ পেরিয়ে একেবারে নরশাপুর।

পাস্থলু ভিতর থেকে ঘুরে এসে বললে,—ঘনশ্যামদাসবাবু গদিতে গিয়ে বসেছেন। যাবেন নাকি একবার নিচে?

আমার বাঁ দিকে কাঠের পার্টিশন করে বারান্দাটা ভাগ করা, বাড়ির ওই অংশে থাকেন তিনি স্বয়ং। ঘর-সংসার সব ফেলে এসেছেন সেই সুদূর মারোয়াড়ের কোন অঞ্চলে কে জানে! দুটি পুত্র, ছোটটি থাকে মায়ের কাছে, বড়োটি দিল্লীতে। ঘনশ্যামদাসবাবুর ভাষায়, বড়োটি কালেজে পড়ছে, শীগ্‌গিরই বি-এ প্যাশ করে বেরবে। বহুৎ এলেমদার নও-জোয়ান। তবে এখানে আনছি না, কলকাতায় গদি খুলে তাকে বসাবো। তখন আপনি একটু দেখবেন তাকে

বাবুজী। দেখবেন কী, যে আলতু-ফালতু লোক এসে তাকে যেন না ঠকায়! বেশক্, সে-ও পড়িলিখি আদমী, তাকেও ঠকানো মুশকিল হবে।

ঘনশ্যামদাসবাবু এখানেও একটি সংসার করেছেন। সন্তানাদি অবশ্য আসে নি এ-সংসারে, তবে ভদ্রমহিলা যে দক্ষিণী হয়েও নিদারুণ পর্দানসীনা, এটা এ কয়দিনেই বুঝে গেছি।

ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পান্থলুকে বললাম,—চলো।

গণেশজীকে প্রণাম করে ধুপ-ধুনো জ্বালিয়ে সবেমাত্র গদিতে আসীন হয়েছেন ঘনশ্যামদাসবাবু। আমাকে দেখতে পেয়ে বিশেষভাবেই অভ্যর্থনা জানালেন,—আসুন বাবুজী, আসুন, বসুন।

নমস্কার জানিয়ে আমি আর পান্থলু আসন গ্রহণ করলাম। পান্থলু বসলো গদিতে, আর আমার পরণে প্যাণ্ট থাকায়, বসলাম গিয়ে চেয়ারে। ঘনশ্যামদাসবাবুর হাতে কাঁসার ঝকঝকে একটা থালা, তাতে গোটা দুই হাতে-চাপড়ানো প্রকাণ্ড রুটি আর একতাল কিশমিশ দেওয়া হালুয়া। গণেশমূর্তির দিকে থালাটা বাড়িয়ে দিয়ে বারকয়েক আরতির ভঙ্গিতে হাত দুটি আন্দোলিত করলেন। তারপর ডেকে উঠলেন,—বাচ্চু! বাচ্চু!

ঘনশ্যামদাসবাবুর প্রাতরাশ সমাপ্ত হয় নি দেখে উঠে যাবো কি যাবো না এ-কথা ভাবছি, হঠাৎ দেখি ঠুং-ঠুং-ঠুং-ঠুং শব্দ করতে করতে ভিতরের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো কালো মতন কী একটা জন্তু। প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারি নি, পরে ভাল করে তাকিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার বিস্ময় আর সীমারেখা মানলো না। গলায় সোনার ছোট ঘণ্টা পরানো প্রকাণ্ড একটা ইঁদুর। হ্যাঁ, আকারে একটা বেড়ালেরও বড়ো হবে। ছোট ছোট চারটি পা ফেলে বেজির মতন গোলাপী ঠোঁট মেলে রুটি দুটি একসঙ্গে টেনে নিলো মুখের মধ্যে, তারপর আবার পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে গেল অন্তরালে।

পান্থলু ঘনশ্যামদাসবাবুরই লোক, এ সব দেখতে হয়তো সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাই সে ওসব দিকে দৃক্‌পাত না করে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে বাজার-দরের পৃষ্ঠাটা খুঁজতে লাগলো। আমি সাধারণত এত সকালে কাজে বসি না, তাই দিনকয়েক হলো এখানে এসেছি বটে, তবু এসব কিছু আগে লক্ষ্য করতে পারি নি। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে বলে উঠলাম,—ওটা কী শেঠজী, ইঁদুর?

থালাশুদ্ধ হাতটা কপালে ঠেকিয়ে শেঠজী বললেন,—গণেশজীর বাহন।

—পুষেছেন?

—আরে রাম-রাম,—শেঠজী আবার গণেশজীর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানালেন, বললেন,—পুষেছি বলবেন না বাবু, বাচ্চু দয়া করে আমার ঘরে আছে। ও চলে গেলে আমার ব্যবসায়ের পড়তা থাকবে না, লক্ষ্মীমায়ীও থাকবেন না, আমি মরে যাবো।

ঠুং ঠুং করতে করতে বাচ্চু আবার ঘরে এলো। শেঠজীর হাত থেকে হালুয়ার তালটা টুকরো-টুকরো করে ভেঙে খেতে লাগলো নির্ভয়ে। আর শেঠজী বার বার অস্ফুট কণ্ঠে কী যেন এক মন্ত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন।

ওর খাওয়া আর শেঠজীর মন্ত্র শেষ হলে বললাম—কোথায় থাকে ?

ঠুং-ঠুং করতে করতে চলে গেল ইঁদুরটা। সেই দিকে সস্নেহে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপরে বললেন,—থাকে কোথাও বাড়ির আনাচে-কানাচে। ডাকলেই আসে। ওর গলার ঘন্টি গড়িয়ে দিয়েছি, এবার আমাদের এই কাজটা হাতে এলে বাবুজী, মানত করেছি, ওর কানের মাকড়িভি গড়িয়ে দেবো।

যে কাজের এইমাত্র ইঙ্গিত করলেন ঘনশ্যামদাসবাবু, সেই কাজের ব্যাপারেই আমার এখানে আসা। এই জনস্থলীর পাহাড়ের সানুদেশে বেশ কিছু অংশ জুড়ে ম্যাঙ্গানীজ ওর-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। এর লীজ নিয়েছেন শেঠজী নিজে, দীর্ঘদিনের মেয়াদী লীজ, আমি এসেছি এই ম্যাঙ্গানীজ-স্তরের বিভিন্ন অংশ নিয়ে পরীক্ষা করতে। যদি ভালো পারসেন্টেজের "ওর" পাওয়া যায়, যেটা আশা করছি আমরা পাবো, তা হলে শেঠজী আর আমাদের ফার্মের যোগাযোগে একটা লাভজনক ব্যবসা গড়ে উঠতে পারে।

বললেন,—ভাইজাগ থেকে আজকাল বেশি ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানি হচ্ছে বাবুজী, আমি দেখে এসেছি। আপনি কি মনে করেন—এ ব্যবসাটা চলবে ?

—চলবে মানে ?

—মানে হচ্ছে কী, গভর্নমেণ্ট না আবার ঝট করে বন্ধ ক'রে দেয়। আমাদের দেশী গভর্নমেণ্টের ব্যাপার তো এখন।

বললাম,—উপায় নেই গভর্নমেণ্টের। ম্যাঙ্গানীজ বাইরে পাঠাতেই হবে। নইলে ডলার আর্নিং চলবে কী করে ?

—ডলার আর্নিং ব্যাপারটা কী বাবুজী ?

শেঠজীকে সংক্ষেপে বোঝালাম ব্যাপারটা।

ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগলো কাজের চাপ। স্নানাদি ভোরেই সেরে নিয়েছিলাম, কাজকর্ম সেরে হোটেলে খেতে যেতে হয়ে গেল বেশ দেরি, বেলা দুটো।

পাম্বলুকে শেঠজী দিয়েছেন আমার দেখাশোনা করতে। সে আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে নিজের বাড়িতে চলে গেল। তার বাড়ি এখান থেকে বেশ খানিকটা দূর,—কী এক নামের অগ্রহারমে যেন। অগ্রহারম্ বলে ব্রাহ্মণ-পল্লীকে, পাম্বলু জাতিতে ব্রাহ্মণ।

হোটেলে আমার খাবার টেবিলের সামনে বসে পাম্বলু বলছিলো,—শেঠজীর গদিতে কাজ করি কমিশন হিসাবে নেহাতই পেটের দায়ে। নইলে বামুন মানুষ, আমারই কি চাকরি করা উচিত?

—তুমি তো বেশ লেখাপড়া করেছো, ইংরাজি লেখা তো তোমার ভালই দেখলাম।

প্রসন্ন ভঙ্গিতে পাম্বলু বললে,—তা স্যার, বি-এ পর্যন্ত পড়েছিলাম অন্ধ্র য়ুনিভারসিটিতে। পয়সার অভাবে পড়া ছেড়ে চাকরি নিতে হয়েছিল। ঐ বিশাখাপত্তনমেই এক স্টিভেডোরের ফার্মে কাজ নিয়েছিলাম। আমার অফিস-মাস্টারের নাম ছিল মুখার্জিবাবু। বেশ লোক। আমি বি-এ পড়তে পড়তে টাইপ শিখেছিলাম তো! মুখার্জিবাবু আমার ঝড়ের বেগে টাইপ করা দেখে খুব খুসি হতেন। বলতেন, 'সাবাস পাম্বলু, সাবাস।' কিন্তু স্যার, শেষে ঐ টাইপ করাই আমার কাল হলো। শেষ পর্যন্ত চাকরি রাতারাতি ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরে এলাম।

—কেন?

বললে,—একটা জাহাজে খাবার-দাবার সাপ্লাই করা হয়েছে। তার বিল টাইপ করে চলেছি। রাইস এক হাজার পাউণ্ড, আটা আট শো পাউণ্ড, পোট্যাটো দুশো পাউণ্ড, কিন্তু তারপরের আইটেমে এসেই টাইপ করা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হলো। বললাম,—না স্যার ওটা আমি টাইপ করতে পারবো না। আমি হিন্দুর ছেলে, তায় ব্রাহ্মণ।

বলে উঠলাম,—কী টাইপ করতে পারলে না পাম্বলু? বীফ?

সঙ্গে সঙ্গেই জিভ কেটে কাণে আঙুল দিলো পাম্বলু, বললে,—আ ছি-ছি, কথাটা উচ্চারণ করে ফেললেন! দাঁড়ান, হাত মুখ ধুয়ে আসি।

ওর অবস্থা লক্ষ্য ক'রে হো হো করে হেসে উঠলাম।

ফেরার পথে পাম্বলু এক সময় জিজ্ঞাসা করলো,—একটা কথা বলবো বাবু?

—কী?

—সন্ধ্যার সময় ওখানে যাবেন ?

ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ফিরে বললাম,—যাবোই তো। তোমার কি আপত্তি আছে নাকি পাম্বলু ?

জিভ কেটে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—আ ছি-ছি তা নয়। গেলে শেঠজী খুসিই হবেন। কিন্তু—

—কিন্তু কী ?

বললে,—যতো লোক এ যাবৎ শেঠজীর কাছে এসেছে, তাদের থেকে আপনি একটু ভিন্নপ্রকৃতির। তাই বলছিলাম, নাই বা গেলেন ওখানে !

একটু হেসে বললাম,—শেঠজীর কাছে আর যারা এসেছে, তাদেরও সঙ্গী ছিলে নাকি তুমি পাম্বলু ?

—না বাবুজী—পাম্বলু বললে,—তারা সন্ধ্যার সময় কী সব যা তা খেতো বলে আমি কাছে ঘেঁসতাম না। কী বিশ্রী গন্ধ, যেন ঠেলে বমি আসছে !

হাসি পেলো কথাটা শুনে। কিন্তু সে ভাবটা দমন ক'রে প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বলে উঠলাম,—আচ্ছা, এই বিশ্বনাথম্ ছোকরা কি আগেও আসতো ? এসে ঘুরঘুর করতো শেঠজীর আশেপাশে ?

—না। ওকে দেখছি তো হালে। তবে, শেঠজীর অন্দরমহলে ওর আসা-যাওয়া ছিল আগে থাকতেই।

—ও !

নিজের পরিচিতি সহজে দেবো না বলেই প্যাণ্ট শার্ট আর টাই পরে গিয়েছিলাম। লোকটির ঘরে সেই নটি মূর্তির পায়ের কাছে জ্বলছে নটি ক্ষুদ্রকায় প্রদীপ, নটি দেবতার গলায় ঝুলছে নটি বেলকুঁড়ির মালা। তেমনি ধূপের গন্ধে সারা ঘর আমোদিত। একটি কেরোসিনের টেবিল-ল্যাম্প শোভা পাচ্ছে জলচৌকির ওপরে। সেই স্থূলকায় মানুষটি তন্ত্রসাধকের মতো লাল একটা পট্টবস্ত্র পরে আছে, খালি গায়ে রক্তকরবীর মালা, কপালে কুঙ্কুমের টিপ।

আমি ভেতরে যেতেই দরজাটা বন্ধ করে দিলো সে, বললে,—বসুন।

বসলাম। আমার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ। ভিতরে সেই কাঠের নক্‌শা কাটা দরজাটা তেমনি বন্ধ করা। সমস্ত পরিবেশের মধ্যে এমন

একটা গাম্ভীর্য, এমন একটা থমথমে ভাব আছে যে, তার প্রতিক্রিয়া মনের মধ্যে হতে বাধ্য।

বললাম,—বাইরের দরজা বন্ধ করলেন কেন?

অল্প একটু হেসে বললে,—আপনার সঙ্গে কথা বলবো বলে। যারা আসবে তারা বাইরে অপেক্ষা করবে। আপনার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হলেই দরজা খুলে দেবো। এতে কোনও অসুবিধা নেই, আপনি ছাড়া সবাই পুরানো, সবাই জানে আমাদের নিয়ম-কানুন।

তারপরে একটু থেমে আবার বললে,—বাবুজী, আমাদের নিয়ম-কানুন আপনাকেও মানতে হবে। এই ঘরে বসে বলুন, মানবেন?

সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি দেবমূর্তির থেকে রাহু আর কেতুর মূর্তির মধ্যেই যেন একটা তীক্ষ্ণ তিরস্কার লুকিয়ে আছে মনে হলো। আমার মতো শক্ত দশ-দেশ-ঘোরা লোকেরও বুকের ভিতরটা বার কয়েক কেঁপে উঠলো। বললাম,—কী নিয়ম বলুন? মানবো।

উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল লোকটির মুখ, হাতের কাছের সেই লাল-খেরো বাঁধানো খাতাটা খুলে কী যেন দেখতে লাগলো একমনে, দু-একটা পৃষ্ঠাও উলটে গেল, তারপরে বললে,—বাবুজী, একটা ফুলের নাম করুন।

—ফুলের নাম! কেন?

হেসে বললে,—আমাদের নিয়ম মানবেন বলেছেন। করুন একটা ফুলের নাম?

গলায় ওর দুলছে রক্তকরবীর মালা, গণেশজীর পায়ের কাছে তখনও শুকিয়ে আছে সকালের সেই দোপাটি ফুল, সেখান থেকে চোখ গেল নবগ্রহের নটি মূর্তির দিকে। নটি বেলকুঁড়ির মালা। তাকালাম ভিতরের সেই পদ্মফুলের-নকশাকাটা কাঠের দরজাটির দিকে। রক্তকরবী, দোপাটি, বেলকুঁড়ি আর পদ্ম। কিন্তু কী আশ্চর্য ঘটনা, আজও মনে মনে ভেবে অবাক হয়ে যাই, এই চারটে ফুলের নাম করাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তা করি নি। কেন করি নি, আর কেন যে বেছে বেছে মনের কোণে চাঁপাফুলের নামটিই ফুটে উঠলো, তার সঠিক কারণ আজও আমি নির্ণয় করতে পারি নি।

হ্যাঁ, স্পষ্ট উচ্চারণ করেছিলাম,—চাঁপাফুল।

ভ্রূকুঞ্চিত করে আমার দিকে তাকিয়ে খেরো-বাঁধানো খাতাটায় কী যেন দেখলো লোকটি; তারপরে উঠে দাঁড়ালো, ভিতরের দরজাটা একটু খুলে কাকে

যেন ডাকতে গিয়েও ডাকলো না, আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলো,—আসুন বাবুজী, আমার সঙ্গে আসুন।

—ব্যাপারটা কী? ফুলের নাম জিজ্ঞাসা করলেন কেন?—আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বললে,—সেটা পরেই জানতে পারবেন।

দরজা পেরিয়ে যেন এক রহস্যলোকে প্রবেশ করলাম আমরা, চারিদিকে ঘোরানো বারান্দা, থাম বসানো, মাঝখানে একটা বাঁধানো উঠোন, চতুষ্কোণ।

বারান্দার দেওয়ালে কিছু দূর অন্তর অন্তর কেরোসিনের দেয়ালগিরি বসানো। তারই স্বল্পালোকে দুটি একটি হাস্যোজ্জ্বল তরুণী-মুখ চোখে পড়তেই চট করে সরে গেল তারা। কোনো একটি কক্ষের কপাটের অন্তরাল থেকে ইমনকল্যাণের তানমালা ভেসে আসছে—মেয়েলী গলার সুরেলা তান।

সঙ্গী মানুষটি আমাকে নিয়ে উঠোনে নামলেন। উঠোনের ওপরে বিস্তৃত আকাশের যেটুকু চোখে পড়ে, তাতে দেখলাম, সন্ধ্যাতারা তখনও বিদায় নেয় নি। আধফালি চাঁদ ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল।

উঠোনের এক দিকে দুটি প্রোথিত লৌহস্তম্ভের মধ্যে একটি দোলনা খাটানো ছিল, কারা যেন দুলছিলও সেই দোলনায়। আমরা কাছে যেতেই তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলো দুটি মেয়ে, পিছন থেকে লোকটি ডেকে উঠলো,—চম্পা!

যে মেয়েটি আগে ছুটে গিয়েছিল, বারান্দায় ওঠবার সিঁড়িতে সে থমকে দাঁড়ালো। আবছা আলোয় তাকে ভালো দেখতে পাচ্ছিলাম না। সঙ্গী দ্রুতপায়ে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে কী যেন বললে ফিসফিস ক'রে, সে মাথা হেলিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে চলে গেল ওখান থেকে।

সঙ্গী আমার কাছে ফিরে এসে আমার হাত ধরে বললে,—আসুন।

আমরা সেই বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা পেরিয়ে একটা ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

দেওয়ালগিরির তেমনি অনুজ্জ্বল আলো শোভা পাচ্ছে ঘরে। এক পাশে একটা খাট, অন্যদিকে মেঝের ওপরে একটা লাল পশমের আসন পাতা। এক ধার থেকে একটা মোড়া টেনে নিয়ে সে বললে,—আপনি বসুন। ও এখুনি আসছে।

তাকে চলে যেতে দেখে আমি তাড়াতাড়ি কী যেন বলতে গিয়েছিলাম, মুখ

ফিরিয়ে হেসে সে বললে,—আপনার সব-কিছু প্রশ্নের উত্তর এখুনি পাবেন। আমি যাই, কেমন ?

প্রথম দিকে একটু অস্বস্তিকর মনে হতে বাধ্য। একবার মনে হলো উঠে যাই, পালাই। তার পরেই মনে হলো, না-না, তা কেন? এসেছি যখন, দেখাই যাক না ব্যাপারটা !

ধীরে ধীরে চোখ মেলে ভালো করে দেখতে লাগলাম ঘরখানা। সব-কিছুই নিপুণ হাতে সাজানো, গোছানো, ঝকঝকে, তকতকে। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে একটি পাথরের ছোট্ট বিষ্ণুমূর্তি, পিতলের পিলসুজে একটি প্রদীপ জ্বলছে, সেখানে একমুঠো লাল করবী ফুল অঞ্জলির মতো পড়ে আছে মূর্তির পায়ে। আর পুড়ছে ধূপদানিতে ধূপ।

হঠাৎ টের পেলাম, খোলা দরজা দিয়ে, এবং বারান্দার দিকে যে জানালাটি বিদ্যমান তার ফাঁক দিয়ে, বহু মুখ উৎসুক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে চায় আমাকে। ফিসফিস করা দুটি একটি কথা, পায়ের মৃদু ধ্বনি, চুড়ির ঝনৎকার, টুকরো টুকরো চাপা হাসি, বুঝি নতুন কোনও বাসরঘরের বিভ্রম সৃষ্টি করতে চায় ওরা।

আর আশ্চর্য, নববধূর মতোই জড়িত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে ঘরে এসে আবির্ভূতা হলো,—সে। দুটি মেয়ে তাকে ধীরে ধীরে নিয়ে এলো। হাতে তার একটা ডালা। ডালার নানান দ্রব্যের মধ্যে একটি ছোট্ট মাটির প্রদীপ। মেয়ে দুটি ওকে পৌঁছে দিয়ে আমার দিকে একটু তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে পালিয়ে গেল।

ময়ূরকণ্ঠী রঙের সিল্কের একটা শাড়ি পরণে, অলঙ্কারের মধ্যে নাসিকায় একটি শুভ্র পাথরের ফুল ঝলমল করছে, কর্ণেও ঝিলমিল করছে দ্যুতিমান দুটি শুভ্র পাথরের দুল। গলায় সরু একটা সোনার হারের উপরে বেলকুঁড়ির মালা, কোমরে আর বাহুতেও বেলকুঁড়ির মালা জড়ানো। হাতে দুগাছি গালা-দিয়ে-তৈরী নকৃশা কাটা বালা। কিন্তু সব অলঙ্কার, সব বেশ বাস তুচ্ছ হয়ে গেছে তার আপন দেহলাবণ্যের কাছে।

দোদুল্যমান দীর্ঘ বেণীর মূলে ফুলের মালা জড়ানো, জরির কাজ করা ময়ূরকণ্ঠী রঙের চোলির 'রবিকা' বা ব্লাউজের বন্ধনীতে সুশোভিত তার বক্ষসম্পদ। একটু হলদে ধরনের ফরসা ওর দেহের বর্ণ, নাসিকার গঠনও হয়তো খুব তীক্ষ্ণ নয়। কিন্তু কৃষ্ণকলিফুলের কুঁড়ি সদ্য ফুটলে যেমন দেখতে লাগে, তেমনি স্ফুরিত ওর

রক্তিম অধর, আর পরম আশ্চর্য যদি কিছু থাকে, তো, সে ওর ঘনপক্ষ্ম টানা-টানা দুটি ভাবময় চোখ।

আমার দিকে ভীরু পাখির মতোই মুহূর্তকাল তাকিয়েছিল সে। তারপরে নিমীলিত চোখে হাতের ডালাটি নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। পায়ের কাছে রাখলো সেই ডালা। আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে ডান হাতে তুলে নিলো প্রদীপখানি। বাঁ হাত ডান হাতের বাজুতে ছুঁইয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বরণ করতে লাগলো আমাকে। প্রথমে প্রদীপ, তারপরে ফুল, তারপরে ছোট্ট একটা মাটির ঘট। এর পরে দু-এক বিন্দু জল নিয়ে ছিটিয়ে দিলো আমার ওপরে, ছিটিয়ে দিল নিজের ওপরেও।

তারপরে ডালাটি মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়ালো, হাতের ইশারায় বললে লাল পশমের আসনটিতে বসতে।

নিদারুণ কৌতূহল নিয়েই এতক্ষণ নিশ্চুপে লক্ষ্য করে চলেছিলাম ওর কার্যকলাপ, এবারে আর থাকতে পারলাম না, ভাঙা ভাঙা ওদেরই ভাষায় বলে উঠলাম,—যদি না শুনি তোমার কথা ?

উল্লাসের দ্যুতিতে ঝলমল করে উঠলো দুটি চোখ, বিস্মিত ভঙ্গিমায় একখানা হাত আরক্তিম কপোলের ওপর ছুঁইয়ে রেখে বলে উঠলো,—কী আশ্চর্য। জানেন আপনি আমাদের ভাষা ?

—কিছু কিছু জানি।

—অনেক দিন আছেন বুঝি আমাদের দেশে ?

—তা আছি।

ভারি কোমল, সরু আর সুরেলা ওর কণ্ঠস্বর, বলার ভঙ্গিও মৃদু, বললে,—বসবেন না এসে আসনে ?

—না।

ধীরে ধীরে একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালো, তারপরে প্রায় অস্ফুট স্বরেই বলে উঠলো—না বলতে নেই। আমার কথা আজ শুনতে হয়। আমার ঘরে এসেছেন, আমার রাজত্বে এসেছেন, আর আমার কথা শুনবেন না ?

ডালাটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে অসহিষ্ণু কণ্ঠেই বলে উঠলাম,—কিন্তু এসব কী ?

একটু ঝুঁকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসলো, বললে,—এসব অনুষ্ঠান আমাদের করতে হয়।

—কেন ?

ধীরে ধীরে তার করপল্লব স্পর্শ করলো আমার বাহুমূল, কিন্তু মুহূর্ত কাল [illegible]। সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কোমল গলায় বলতে লাগলো,—মানুষ তো মানুষের অন্তরটা দেখাতে পারে না, তাই কতগুলি প্রতীক দিয়ে তার ভিতরের ভাবটি সে প্রকাশ করে।

—মানে !

অল্প একটু হাসলো সে, বললো,—এই যে ডালার ছোট্ট দীপটি জ্বলছে, যা দিয়ে আপনাকে আজ বরণ করে নিলাম, যদি বলি, এ আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদীপ-শিখার প্রতীক, তাহলে কি আপনি অবিশ্বাস করবেন ?

—দূর !—উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে, বললাম,—রাখো এসব বানানো কথা, আমি কিন্তু দেরি করতে পারবো না, রাত নটার মধ্যেই আমার হোটেলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

প্রথমটায় অদ্ভুত একটা বেদনার পাণ্ডুর আভা জেগে উঠেছিল তার মুখে, ধীরে ধীরে সেই বেদনার স্পর্শ মুছে গিয়ে ফুটে উঠলো প্রচ্ছন্ন কৌতুকের দ্যুতি, হয়তো বা স্নেহেরও। বললে,—আমার নাম কী বলুন তো ?

বললাম—চম্পা। আচ্ছা, তোমাদের সবারই কি ফুলের নামে নাম ?

কৌতুকহাস্যে তখনও ঝলমল করছে ওর মুখ, মাথা নেড়ে নীরবেই জানালো,—হ্যাঁ।

—এ-রকমটা কী করে হলো ? সবই পাতানো নাম, না ?

—হবে।

বললাম—যদি অন্য কোনো ফুলের নাম করতাম তো তোমার কাছে আসা হতো না আমার, না ?

ঠোঁট টিপে একটু হেসে বললে,—না।

—এই নিয়ম কেন ?

খুব কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো, আবার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে,—নিয়মটা ভালো না ?

বলে উঠলাম,—দূর। বাজে।

—উঁহু। বাজে নয়, কাজের।

—কী করে ? ফুলের নাম নিয়ে তো ভিতরে এলাম, যদি মনে না ধরে, তখন ?

—তখন ?—ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি টেনে এনে বললে,—টাকা ফেরত নিয়ে চলে যাবেন।

—চলে যাবো ?

—হ্যাঁ।—বলতে বলতেই খিলখিল করে হেসে উঠলো, বললে,—কিন্তু কেউ চলে যায় না।

—আবার গিয়ে অন্য ফুলের নাম করে বুঝি ?

—না। সেটা একেবারেই নিয়মবিরুদ্ধ—মেয়েটি বললে,—আসল কথা হচ্ছে কী জানেন ? এই বাড়িতে আমরা থাকি নটি মেয়ে, নটি ফুলের নটি নাম,—আমাদের দেখে কারুরই অপছন্দ হবার কথা নয়। এ হচ্ছে সবার থেকে সেরা বাড়ি, এর নিয়মকানুনও তাই আলাদা।

তারপরেই মুচকি একটু হেসে বলে উঠলো—কেন, অপছন্দ হয়েছে নাকি আমাকে ? চোখ দেখে তো তা মনে হয় না।

—না না তা নয়, আমার তোমাকে—

খিলখিল করে হেসে উঠলো। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে,—আমার নামটি মনে আছে তো, চম্পা, চাঁপাফুল। একটা হিন্দী কথা শুনুন। 'চম্পামে হৈ তিন গুণ, রূপ, রঙ ঔর বাস।' কেমন, আমার মধ্যে আছে তো ?

—কী আছে ?

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগলো—রূপ রঙ ঔর বাস ?

মোহাবিষ্টের মত বলে উঠলাম,—আছে।

—মগর এক হৈ অবগুণ—কী বলুন তো ? কী আছে দোষ চাঁপাফুলের মধ্যে ?

—জানি না।

বললে,—ভ্রমর না আওয়ে পাস। চাঁপার কাছে কখনও ভ্রমর আসে না।

নিশ্চুপে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। সেটা লক্ষ্য করে আবার কৌতুকে কেঁপে উঠলো দুটি চোখের তারা, বললে,—কী, দেখছেন কী ? আমি সত্যিকারের চম্পা, না, মিথ্যে চম্পা, তাই ?

তারপরেই হেসে উঠে,—সে সব দেখবেন পরে। আগে আসুন তো ?

—কোথায় ?

হাতটা ধরে বললে,—এই আসনে।

নেহাতই একটা কৌতূহল। কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই এগিয়ে গিয়ে

বসলাম ওর সেই লাল পশমের আসনটির ওপরে। ও-ও সঙ্গে সঙ্গে কাছে এসে হেঁট হয়ে বসে দুটি হাতে আমার পা থেকে খুলে নিলো জুতো, এক পাশে সরিয়ে রেখে বললে,—মোজাও খুলতে হবে।

—খুলছি।

—না না, আপনি নয়,—পায়ে হাত দিয়ে বললে,—আমাকে খুলতে দিন।

বলেই আমার উত্তরের অপেক্ষা আর না করে ছোট্ট হাফ-মোজায় হাত দিলো সে, বলতে লাগলো—প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা জগৎ আছে, সে জগতের নিয়মকানুন অন্তত তাকে মানতে দিন।

তারপরে একটা ভিজে হলদে রঙের গামছা এনে বেশ করে মুছিয়ে দিলো আমার পা হাত আর মুখ। গামছাটা শুধু হলদে রঙের নয়, কাঁচা হলুদ বেটে মাখিয়েও রাখা হয়েছিল তাতে। বললাম,—এও কি নিয়মের মধ্যে নাকি?

হাসি-হাসি মুখেই বললে,—হ্যাঁ।

তারপরে একটা ধবধবে সাদা তোয়ালে হাতে এনে দিয়ে বললে,—এবার নিজের হাতে মুখটুকু মুছে ফেলুন।

ততক্ষণে ভিতরের জানালা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার কপাট দুটোও টেনে দিয়েছে সে।

আমি উঠে এসে খাটটার ওপরে বালিশ টেনে কাত হয়ে বসে পড়ে বললাম,—যাই বলো এ সবের কোনও অর্থ হয় না।

কাছে এসে বসেছে ততক্ষণে হাঁটু মুড়ে, বললে,—কী সবের অর্থ?

—এই সব বরণ-টরণ আর কী!

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললে,—হয় অর্থ। যদি আরও মেশেন আমাদের সঙ্গে, তা হলে নিজেই একদিন বুঝতে পারবেন।

একটু হেসে ওর হাত হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম,—তুমি বলো না, শুনি?

ও হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দুহাতে ধরলো আমার রঙিন টাইটা, বললে,—কী বলবো? আপনি তো হেসেই উড়িয়ে দেবেন।

—তা হোক, তুমি বলো।

চোখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত, তারপর বললে,—আমার আত্মার প্রতীক এই বরণডালার প্রদীপশিখাটি। সে আপনাকে বরণ করে নিলো, বললে—হে পথিক, এসো।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলাম,—দূর ! এও অর্থহীন।

সে আমার মন্তব্যে কান না দিয়ে নিজের আবেগেই বলতে লাগলো,—আর এই যে ঘট দিয়ে বরণ করলাম, ঘট হচ্ছে আধার, দেহলাবণির প্রতীক।

কণ্ঠে বোধ হয় একটু শ্লেষই ফুটে উঠলো, বললাম,—আর এই জল ছিটানো ?

বোধ হয় বুঝলো আমার মনের ভাব, আর বুঝলো বলেই একটা বেদনার ম্লানিমা ভেসে গেল ওর মুখের উপর দিয়ে। কিন্তু তবু বললে,—আমার দেহ-মনের উচ্ছ্বসিত যে প্রীতি, বারিবিন্দু তারই প্রতীক। আমাকে বিশ্বাস করবেন কী করবেন না সে আপনার ওপরে নির্ভর করছে। কিন্তু আমাকে আমার বিশ্বাস থেকে টলাবেন কী করে ?

গলার টাইটা খুলে ওর হাতে দিলাম, বললাম,—না না, সে কথা বলতে আমি চাই না। আমি শুধু বলতে চাই, ওসব বাহ্যিক অনুষ্ঠান না করেও তো আপন বিশ্বাসকে অটল রাখা যেতে পারে।

—পারে না।—মেয়েটি উঠে টাইটা আলনায় ঝুলিয়ে রেখে আবার ফিরে এসে কাছ ঘেঁষে বসলো তেমনি করে। বললে,—ভাবকে প্রকাশ করতে গেলে যেমন ভাষা চাই, অন্তরের স্থির বিশ্বাস বা প্রত্যয়কে প্রকাশ করতে গেলেও তেমনি কতকগুলি বাহ্যিক আচার-আচরণ চাই।

—কিন্তু, নাই বা করলে প্রকাশ? প্রকাশ যে করতেই হবে, এমন কী কথা আছে ?

—আছে। প্রকাশ না করলে নিজেরই বা বিশ্বাস জন্মাবে কী করে নিজের ওপর ? সব থেকে বড়ো কথা, অভ্যাসের দাস হলেও যন্ত্র হতে পারি নি, আমরা মানুষই আছি। তাই সব-কিছুর জন্যই যেমন একটা প্রস্তুতির প্রয়োজন, আমাদেরও তেমনি নিজেকে প্রস্তুত করবার একটা অবকাশ দিতে হবে।

—পাও না কি সে অবকাশ ?

বোধ হয় কোনও অজ্ঞাত ব্যথার তারেই রিন রিন করে বেজে উঠলো গিয়ে আমার কথা। মুখ নিচু করে স্তব্ধ হয়ে রইলো বেশ কিছুক্ষণ। তারপরে কেমন যেন কাঁপা বেদনার্ত কণ্ঠে বলে উঠলো,—যা পাই সে আর কতটুকু ?

চাঁপাকলির মতো আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করতে করতে বললাম,—থাক এ সব কথা।

—থাক।—বলে আবার তেমনি হাসি হাসি মুখখানা তুলেই তাকালো আমার দিকে।

বললে—এবার আমি যাই ?

ভয়ানক আশ্চর্য হয়েই বললাম,—কোথায় ?

দুষ্টুমি-ভরা একটা হাসিতে ভরে গেল ওর মুখ, বললে,—যাই। আপনি একটু বিশ্রাম করুন ততক্ষণ। আমি এখুনি ফিরে আসছি, কেমন ?

বলেই আর দাঁড়ালো না, ছুটে চলে গেল ঘর থেকে।

শুয়ে শুয়ে নিজের কথা ভেবে নিজেই অবাক হচ্ছিলাম মনে মনে। নিরস, নিছক কাজ-পাগল মানুষ আমি একটি। যাকে বলে সোজা কথায়—কাঠখোট্টা। বিবাহিত নই, সংসারীও নই আমি ঠিক, এ ধরনের কোনো অভিজ্ঞতাও ছিল না। পাম্বলুর কথায় হঠাৎ রাজী হয়ে খেয়ালের বশে এসেছিলাম। লোভও যে ছিল, একথা অস্বীকার করবো না। কিন্তু তাবলে এমনভাবে যে এত সময়ের অর্থহীন অপব্যয় করে যাবো, এ আমার নিজেরও ধারণা ছিল না। অথচ, ঠিক এখন, এই মুহূর্তে, চলে যেতেও ইচ্ছা করছে না। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস বইছে শিয়রের জানালাটি দিয়ে, উত্তপ্ত শিরে এসে লাগছে সেই বিহ্বল বাতাস, প্রচুর যেন আরাম ওর মধ্যে, প্রচুর যেন শ্রান্তির অপনোদন।

বোধ হয় মিনিট পনরো কুড়ির মধ্যেই ফিরে এলো সে। সঙ্গে ঝিয়ের মত একটি বুড়ী, তার হাতে একটা ঝকঝকে পিতলের থালা শালপাতায় ঢাকা। আমার বিমূঢ় বিস্মিত দৃষ্টির সামনে থালাটা নামিয়ে রাখলো সেই লাল পশমের আসনের সামনে। ওর নিজের হাতে ছিল ঝকঝকে একটা জলের গ্লাস। যথাস্থানে সেটি রেখে ঝিটিকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো আবার, বললে,—আসুন।

আমি ব্যাপারটা ততক্ষণে বুঝতে পেরে উঠে বসেছি একেবারে, বললাম,—এ আবার কী !

সস্মিত মুখে হাত দুটো ঈষৎ আন্দোলিত করতে করতে বলে উঠলো—খাবার।

ওর বেশবাসেও একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। ময়ূরকণ্ঠীটা বদলে লাল একটা সাধারণ শাড়ি পরে এসেছে, বাহু কটিদেশ আর কণ্ঠে ফুলের মালাও নেই, লম্বমান বেণীটা বুকের পাশ দিয়ে সামনে টেনে আনা।

আশ্চর্য হয়ে বললাম,—খাবো কী ! হোটেলে ফিরে যাবো যে !

মাথা তুলিয়ে তুলিয়ে বলে উঠলো,—না।

—না কী !

আমার হাত তুটো ধরে বলতে লাগলো,—না খেতে হবে আজ আমার কাছে।

—কেন ?

কৌতুকে উজ্জ্বল তখনও তুটি চোখের তারা, বল্লে,—নিয়ম।

আর বাক্যব্যয় করে লাভ নেই বুঝে বসলাম গিয়ে খাবারের সামনে। পিতলের থালায় শুভ্র ভাত, আর ছোট ছোট বহু বাটি রয়েছে সাজানো চারপাশে। একটা পাখা হাতে নিয়ে বসলো আমার কাছ ঘেঁষে। বললে,—খাওয়া কিন্তু একেবারে নিরামিষ। কারণ আমরা আমিষ খাই না।

তারপরই মুচকি একটু হাসলো। বললে,—তবে, মনে হয়, আপনারও নিরামিষে কোনও অসুবিধা হবে না।

তখনও চলেছে আমার উত্তরোত্তর অবাক হবার পালা। বললাম,—অসুবিধা হবে না মানে ! কী করে তুমি জানলে ?

মিটিমিটি তখনও হাসছে, বললে,—জেনেছি।

—কিন্তু কেমন করে ? তুমি জানো আমি কোথাকার লোক ?

তখনও বিত্যুতের ঝিলিমিলি ওর চোখে, বললে,—ভারতবর্ষের লোক তো বটে !

একটু থেমে তারপর বললাম,—তাতে কী বোঝায় ?

—যেটুকু বোঝায় তাতে অন্তত এটুকু জানি, অসুবিধা হবার কথা নয়।

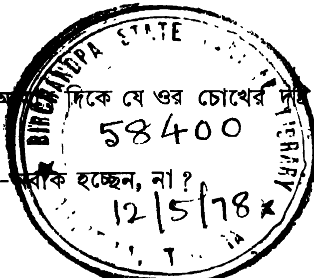
মনে মনে যে চমৎকৃত হই নি—এ কথা বলতে পারি না। আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বাস্তবিকই কোনও ঝামেলা নেই, যে কোনও সাধারণ খাদ্যই আমি তৃপ্তির সঙ্গে খাই, আমিষ বা নিরামিষ—কোনও কিছুর প্রতিই বিশেষ কোন আসক্তি নেই। কিন্তু সে সংবাদ জানতে পারলো কী করে এই মেয়েটি ?

—কই ! খান।

—হ্যাঁ খাচ্ছি।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমার দিকে যে ওর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, তা আমি বুঝতে পারছিলাম।

এক সময়ে বললে,—অবাক হচ্ছেন, না ?



মুখ তুলে বললাম,—হ্যাঁ তা একটু হচ্ছি।

বললে,—আপনার চোখের গভীর দৃষ্টি, মুখের গড়ন, ললাটের উন্নতি, ভ্রুভঙ্গির সরলতা—এসব দেখে অনুমান করা যায়, ভিতরে ভিতরে আপনি কোন্ প্রকৃতির লোক।

ঠোঁটের কোনে অল্প একটু হাসি টেনে এনে বললাম,—শুনি?

মুখখানা তার উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, বললে,—আমার মা হলে আরও ভালো বলতে পারতো।

—তবু শুনিই না তোমার মতামতটা?

একমুহূর্ত আমার চোখের ওপর তার দৃষ্টি স্থাপিত করে বললে,—সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক আপনি। অন্নের গ্রাসশুদ্ধ হাতটা আমার কেঁপে গেল, ভ্রু-কুঞ্চিত ক'রে বলে উঠলাম,—মানে?

—খাওয়া শেষ করুন। বলছি সব। আর-কিছু এনে দেবো?

—না।

কর্মব্যপদেশে নানান জায়গায় ঘুরেছি, নানান পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু ঠিক এ ধরনের অভিজ্ঞতা জীবনে আমার কখনও হয় নি।

বাথরুমটা ছিল কাছেই, বারান্দার কোণে। ঘুরে আসতে আসতে লক্ষ্য করছিলাম, দু-তিনটি মেয়ে উঠোনটার সেই দোলনার কাছে বসে তখনও গল্প করছে। একটা বন্ধ ঘর থেকে নাচের শব্দ ভেসে আসছে। অন্য কোনও বন্ধ দরজার অন্তরাল থেকে—গান।

ঘরে ফিরে এসে বসতেই দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিলো মেয়েটি। ততক্ষণে সেই লাল আসনের সামনের জায়গাটা আগের মতোই আবার পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে সম্ভবত সেই বুড়ী ঝিটি। আলোটা আরও একটু কমিয়ে দিয়ে ও এসে বসলো বিছানায়। বললে,—গরম হচ্ছে, না?

—না। বেশ হাওয়া দিয়েছে তো।

—তা বটে। ভিজে-ভিজে হাওয়া। বৃষ্টি নামবে। কিন্তু তা হোক, শার্টটা আপনি খুলে ফেলুন।

একটু হেসে শার্টটা খুলে ওর হাতে দিতেই আলনায় রেখে এলো সেটা, আর হাতের ঘড়িটি খুলে রেখে দিলো তাকের উপরে। বললাম,—সর্বনাশ, সাড়ে আটটা বেজে গেছে!

—বাজুক।

—বেশী দেরি করা হবে না, বড় জোর সাড়ে নটা।

মুখ টিপে একটু হেসে চুপ করে রইলো, কিছু বললে না।

আমি ততক্ষণে বিছানায় এলিয়ে দিয়েছি নিজেকে। ও ঠিক আগের মতোই কাছে এসে বসেছে হাঁটু মুড়ে। আমার হাতের ওপর হাতখানা রেখে বলে উঠলো,—রাত্রে আপনার ফিরে যাওয়া হবে না।

হেসে বললাম,—এটাও নিয়ম নাকি?

তেমনি হেসেই বললে,—তা বলে সন্ধ্যারাত্রেই যে ফিরে যাবেন, এও নিয়ম নয়।

ওর হাতখানা টেনে নিলাম বুকের ওপর, বললাম,—দু-তিনটি মেয়ে দেখলাম এখনও উঠনে বসে। ওদের কোনো বন্ধু নেই নাকি?

—বন্ধু! আমারও কি বন্ধু আছে নাকি?

হাতখানা বুকের ওপর চেপে ধরে বলে উঠলাম,—আমি কী?

খিলখিল করে হেসে উঠলো, বললে,—ও, তাই বলুন। ওদের বন্ধু হয়তো এখনও আসে নি।

—হয়তো আসবেও না কেউ।

—না। আসবে নিশ্চয়ই। সকালেই আমাদের সব শুনিয়ে দেওয়া হয় কিনা!

বললাম,—একটু রাত হলেও আসা চলে তা হলে?

—ওমা, তা কেন চলবে না?

বলে উঠলাম,—তবে আমার বেলায় এটা কী হলো? আমাকে বলা হয়েছিল কেন, 'গোধূলি-লগ্নে আসবেন আপনি।' ঠিক যেন বিয়ে করতে আসছি।

হেসে উঠলো উচ্ছ্বসিত হয়ে, বললে,—বিয়ে ছাড়া আর কী! অন্তত আমাদের জীবনে তো বটেই।

বোধ হয় মেয়েটি একটু ভাবপ্রবণ, বলতে বলতে হঠাৎই আমার বুকের ওপর রাখল ওর মুখ, অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠলো—আমাদের বাড়ীতে প্রথম কিনা আপনি আজ, তাই গোধূলি-লগ্নে আপনার আবাহন।

—তাই নিয়ম বুঝি?

মাথা তুলে আমার মুখের কাছে নিয়ে এল মুখ, দু হাতে আমার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো,—বিয়েই আমার কাজ।

কৃষ্ণকলির মত সেই স্ফুরিত অধরের আহ্বানকে আমি উপেক্ষা করতে পারি নি। আমার প্রমত্ততায় ও বোধ হয় বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল প্রথমে, তারপরে শিথিল হয়ে গেল ওর বাহুলতা, আমার বুকের ওপরে মুখখানা রেখে সেইভাবেই পড়ে রইলো বহুক্ষণ। কৌতুকের স্বরেই বলে উঠলাম,—কী? বলছিলে না চম্পা, ভ্রমর না আওয়ে পাস? ভ্রমর তো এলো।

আবেগজড়িত কণ্ঠস্বরে বলে উঠলো,—আমি তো আর সত্যিকারের চম্পা নই, ওরা রেখেছে এই নাম, তার আমি কী করবো?

—কী নাম তোমার সত্যিকারের?

মুখ তুলে তাকালো, বললে,—বলা বারণ।

—তবে থাক্। আমারও অতো শিরঃপীড়া নেই নাম নিয়ে।

আবার দু হাতে আমার কণ্ঠদেশ সেইভাবে আকর্ষণ করে বললে,—নেই বুঝি?

—না, নেই। তুমি—তুমি। এই-ই যথেষ্ট।

এবার বুঝি প্রমত্ততা জাগলো ওর নিজের মধ্যে, প্রথমে মৃদু, তারপরে প্রতিদানের লীলা গভীরভাবেই মুদ্রিত করে দিলো আমার অধরপ্রান্তে। অস্ফুট কণ্ঠে বার বার বলতে লাগলো,—তুমি—তুমি—তুমি।

বাইরে তখন মেঘের গুরুগর্জন শোনা যাচ্ছে, বিদ্যুৎ চমকে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। কোনো এক ঘর থেকে উদাত্ত পুরুষকণ্ঠের সঙ্গীত আসছে ভেসে, দক্ষিণী গীত নয়, প্রমত্ত মল্লার-রাগের বিস্তার হিন্দী বর্ণ বিন্যাসকে কেন্দ্র করে—পাবস-ঋতু আঈ দুলহন মনভায়ে।

একবার চকিত হয়ে সেই উদাত্ত উদার কণ্ঠস্বর যেন কান পেতে শুনলো চম্পা, তারপরে আবার এলিয়ে দিলো নিজেকে আমার বাহু-উপাধানে।

ক্রমে ক্রমে সত্যই নামলো একসময় বৃষ্টি, পাহাড়-থেকে-নেমে-আসা নিবিড় মেঘপুঞ্জ আর ঝরোঝরো বর্ষণ। বললাম,—বৃষ্টির ছাট আসছে। ওঠো। জানালা বন্ধ করে দাও।

আবেশজড়িত কণ্ঠে বললে,—না।

—না কী! দেখছো না মুখে চোখে লাগছে বৃষ্টির ছাট!

মুখখানা আরও এগিয়ে দিলো জানলার দিকে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির কণা জমতে লাগলো ওর মুখমণ্ডলে। ওরই শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলাম ওর মুখ। তারপরে নিজেই উঠে হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিলাম আমাদের শিয়রের জানালাটা।

বললাম,—ওঠো। ওদিককার জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো। বৃষ্টির জল এসে তোমার ঘরের মেঝে ভাসিয়ে দিল যে!

—দিক।

—দমকা হাওয়ায় দেবমূর্তির সামনেকার দীপটা যে নিবে গেছে তা জানো?

—যাক।

—এবার দেওয়ালের আলোটাও বাতাস লেগে নিবু নিবু করছে যে!

—করুক।

একমুহূর্ত থেমে তারপরে বললাম,—তা হলে আমাকেই উঠতে হলো দেখছি।

—না না—চম্পা তাড়াতাড়ি বললে,—আচ্ছা আচ্ছা, আমিই বন্ধ করছি।

বলে উঠতে গিয়েও সম্পূর্ণ উঠে দাঁড়ালো না, হাত বাড়িয়ে আমার চোখ দুটো চাপা দিলো করপল্লবে। তিরস্কারের স্বরে বলে উঠলো,—দুষ্টু!

তারপরেই জোর করে আমাকে পাশ ফিরিয়ে দিয়ে বললে,—দেওয়ালের দিকে মুখ করে পড়ে থাকো, খবরদার এদিকে ফেরাবে না মুখ।

বলে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সবার আগে নিবিয়ে দিলো দেওয়ালের আলোটা। অন্ধকারের অবগাহনে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেও জানালার কাছে গিয়ে যখন বন্ধ করছিল ও জানালার পাল্লা দুটো, তখন সেই জানালা-দিয়ে-ঠিকরে-আসা আবছা আলোর মায়াকে ও অস্বীকার করবে কী করে?

তারপর? বাইরে চলতে লাগলো উন্মত্ত ঝঞ্ঝা আর প্রবল বারি-বর্ষণ। তারই শব্দে ডুবে গেল সেই পুরুষকণ্ঠের উদার স্বর, হারিয়ে গেল কোনো নৃত্যরতা রূপসীর নূপুরনিক্কণ? আর হারিয়ে গেলাম আমরা—অন্ধকারের অবগুণ্ঠনতলে দুটি ভীরু প্রাণী।

অনেক—অনেক পরে যখন বৃষ্টির ধারা বাইরে হয়ে গেছে সরল, সেই প্রবল বারিপাতের শব্দও গেছে কমে, ও ধীরে ধীরে উঠে বসলো, লক্ষ্য করলাম, বেশ-বাস বিন্যস্ত করে সেই অন্ধকারেই দরজা খুলে বাইরে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই কয়েকটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম বারান্দায়, কয়েকটি মেয়েকণ্ঠের সঙ্গে মিলিয়ে দুটো একটা পুরুষকণ্ঠও। কয়েকটা নামও যেন কানে এলো,—একজন যখন আরেকজনকে ডেকে কথা বলছিলো, সেই অবকাশে। চাপা ঈষৎ একটা উত্তেজনার আভাস প্রত্যেকেরই কণ্ঠে।

একটা নাম পেলাম জয়ালক্ষী, আর-একটা নাম ভামতী, অন্য নাম ভারাহালু। সবই মেয়েলী নাম, এটুকু জানতাম। কিন্তু এ সব নাম থাকতে ফুলের নামে নাম রেখেছে কেন এভাবে ?

একটু পরেই ও এলো ঘরে ফিরে। আস্তে আস্তে বন্ধ করলো দরজা। তারপরে কুলুঙ্গির কাছে গিয়ে আবার জ্বেলে দিলো প্রদীপটা, তারপরে ফিরে এলো আমার কাছে। বললে,—ঘুম পাচ্ছে না ?

—না।

বললে,—আমারও না। জানো, আমাদের বাগানের বড়ো একটা গাছ ঝড়ে পড়ে গেছে। নারায়ণ ছাতামাথায় লোক নিয়ে দেখতে গেল।

—নারায়ণ ! নারায়ণ কে ?

ও একটু অবাক হলো, বললে,—বারে, আলাপ হলো না ? কার হাতে টাকা দিলে তবে ? ও ই-ত আমাদের সবার দেখাশোনা করে। আমাদের ভালোমন্দ সবই ওর হাতে।

বললাম,—বুঝেছি। ঐ মোটামতন কালো লোকটি ত ?

বললে,—হ্যাঁ। এ-বাড়ি আর বাগানের প্রতিটি তুচ্ছ জিনিসের ওপরেই ওর সমান মায়া। সবই যে ওর নিজের হাতের। অন্য বাড়িগুলির অনেক-কিছু ও সহ্য করে, কিন্তু এ-বাড়ির একটু এদিক-ওদিক কিছু হলে ও সইবে না।

—আরও বাড়ি আছে নাকি ?

—আছে বই কি ! তবে সেগুলো অন্য রকম।

—কী রকম ?

দুটি চোখ তিরস্কারে হয়ে উঠলো গভীর, বললে,—হ্যাঁ এখন আমি ওঁকে সব ব্যাখ্যা করতে বসি আর কী !

—করলেই বা !

দৃষ্টি আরও কঠোর করতে গিয়েও হেসে ফেললো, বললে,—অতশত বুঝি না, তবে অন্য বাড়িতে এই ফুলের নামে নাম রাখার ব্যাপার-ট্যাপার নেই।

বললাম,—যাকগে। তুমি ঘুমোবে না ?

—না,—একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে,—এমন বর্ষা নামলে আমার চোখে কিছুতেই ঘুম নামতে চায় না।

তারপরেই মুখখানা আমার মুখের কাছে এনে বললে,—আরজন্মে বোধ হয় ময়ূরী ছিলাম।

চুপ করে রইলাম। ঘুম আমারও আসছে না বটে, কিন্তু সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী জুড়ে একটা তন্দ্রার ঘোর যেন অবশ করে রেখেছে আমাকে।

হঠাৎই অদ্ভুত এক দৃষ্টি দেখতে পেলাম ওর চোখে, ভারি স্নিগ্ধ আর কোমল সেই দৃষ্টিভঙ্গি।

বলে উঠলাম,—কী দেখছো ?

সরাসরি উত্তর না দিয়ে ও হঠাৎ বলে উঠলো,—এসব শখ তোমার দুদিনের ! আসলে কৌতূহলটাই তোমার কাছে বড়ো,—কী আছে রহস্য, সব ভেদ করবো, সব জানবো, সব দেখবো, তাই না ?

একটু হেসেই উঠলাম এবারে, বললাম,—আমাকে এরই মধ্যে খুব চিনে ফেলেছো বুঝি ?

—যদি বলি, হ্যাঁ ?

—বাজে কথা।

—না,—দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলো,—সাত্ত্বিকতা তোমার মজ্জায় মজ্জায়। রাজসিক আর তামসিক ভাব যেটা তোমার মধ্যে মাঝে মাঝে আসে, সেটা সাময়িক।

ঈষৎ শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলাম,—এ কথা কজনকে বলেছো এভাবে ?

যেন মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল ওর মুখ, কিছুক্ষণ একটি কথাও বলতে পারলো না।

বাঁকা একটু হেসে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম।

মনের মতন কথা কইতে শেখাটাকে ওরা বোধ হয় আর্টের মতো রপ্ত করে নিয়েছে।

বৃষ্টি যদি না নামতো, তা হলে যত রাত্রিই হয়ে থাকুক, ঠিক বাড়ি ফিরে যেতাম।

কিছুক্ষণ পরে আবার ওর করস্পর্শ অনুভব করলাম আমার কপোলদেশে।

বললে,—শোন !

—কী ?

—এ দিকে ফেরো।

ফিরলাম। বললে,—তুমি ঠিকই বলেছো, অনেক কিছুই শিখে রাখতে হয় আমাদের। মনোরঞ্জনের সব রকম উপায়ই আমাদের করায়ত্ত থাকা চাই। মনোরঞ্জন তোমার করতে পেরেছি নিশ্চয় ?

ওর হাতখানা হাতের মুঠোয় নিয়ে বললাম,-তা পেরেছো। ঘুমোও দেখি।

—না।

বলে হঠাৎই দু হাতের মধ্যে টেনে নিলো আমার মুখ, বললে,—আশ্চর্য দুটি চোখের দৃষ্টি তোমার। পুরুষের দৃষ্টি এ নয়।

হেসে উঠলাম,—তবে কী মেয়ের।

—হেসো না। সত্যি বলছি, এক এক সময় অদ্ভুত এক ধরণের দৃষ্টি ফুটে ওঠে তোমার চোখে, যা মেয়ের তো নয়ই, পুরুষের স্বাভাবিক দৃষ্টি, যা সচরাচর আমরা দেখি, এ তাও নয়।

আশ্চর্য হয়েই মুখের দিকে তাকালাম ওর, বললাম,—কী বলতে চাও কী, তুমি?

স্বপ্নভরা মোহময় যেন ওর কণ্ঠস্বর, যেন নিজেকেই নিজে শোনাচ্ছে ও, বললে, —সাত্ত্বিক ধরণের পুরুষ জীবনে আমার এই প্রথম।

বিরক্ত হয়ে গেলাম, এবারে, বললাম,—আচ্ছা পাগল তো তুমি? আমি এবার কিন্তু ঘুমোবো।

হঠাৎই আবার মুখ নীচু করে কী যেন গভীরভাবে দেখতে লাগলো আমার মুখে।

বললাম,—আরে, দেখছো কী, অমন করে?

কী অদ্ভুত, হঠাৎই ওর দু চোখের কোণে টলমল করে উঠলো দুটি মুক্তাবিন্দুর মত দু ফোঁটা অশ্রু। আঙুল দিয়ে মুছিয়ে দিতে গিয়েও পারলাম না, আয়ত-চোখের কোণের অশ্রুবিন্দুও যে কতো সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতে পারে, এর আগে কখনও তা জানতাম না, অস্ফুট স্বরে বলে উঠলাম,—বাঃ!

মুক্তা দুটি ভেঙে দুটি ধারা নেমে এলো কজ্জলরেখা ভেদ করে দুটি কোমল কপোলতলে।

ওর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে, আমার দিকে চাইতে চাইতে কী এক আশ্চর্য অব্যক্ত আনন্দে ভরে গেল মুখ। দেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের মতই হঠাৎ ওর স্ফুরিত উত্তপ্ত অধরেখা স্পর্শ করলো আমার ওষ্ঠদেশ।

বললে,—আর লুকোতে পারবে না নিজেকে আমার কাছ থেকে।

আশ্চর্য হয়ে বললাম,—এ আবার কী কথা!

তেমনি উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত কণ্ঠেই বলে উঠলো,—তুমি কবি—কবি তুমি।

ততক্ষণে উঠে বসেছি বিছানায়। মনে মনে ভাবছি, মেয়েটার মাথারও গোলমাল আছে নাকি একটু?

ও আমার দুটি হাত ধরে বলে উঠলো,—বলো, ঠিক বলেছি কিনা ?

অসীম বিরক্তিতে প্রায় চীৎকারই করে উঠলাম,—তা আর বলবে না ! অপূর্ব তোমার আবিষ্কার ! সারাজীবন ল্যাবরেটারি, ফেরিক অক্সাইড আর কার্বন ডায়ক্সাইড,—এ সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরলাম ! আর···

আমি একটু থেমে যেতেই ও বলে উঠলো,—ওসব কী ইংরেজী কথা বলে গেলে তুমি !

এবার বিরক্তি পরিণত হয়েছে প্রায় দুর্দান্ত ক্রোধে. সব ভুলে একেবারে খাঁটি মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলায় বলে উঠলাম,—তোমার গুষ্টির মাথা ! একজন কাটখোট্টা লোক, তামা পিতল লোহা এই সব নিয়ে যার কারবার, তার মধ্যে উনি আবিষ্কার করে ফেললেন একেবারে কবিকে ! আমার চোদ্দপুরুষের মধ্যে কেউ কবি নেই, তা জানো ?

ও অবাক হয়ে শুনছিল এ অপরূপ ভাষাবিন্যাস, এক সময় বলে উঠলো,—তুমি বাঙালী না ?

সর্বনাশ ! থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি ওর ভাষাতেই বলে উঠলাম, দূর ! কে বললে তোমাকে ?

বললে,—একবার মাসখানেক সীমাচলমের মন্দিরে গিয়ে থেকেছিলাম। সেখানে এক বাঙালী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। তাঁরা তিন দিন ছিলেন, আমাদেরই বাসার এক দিকের অংশে থাকতেন, বৈষ্ণব। ঠিক তাদেরই মত ভাষা বললে কি না তুমি।

বললাম,—তুমি বুঝতে পারনি। আসলে আমি উৎকল দেশের লোক।

—যাঃ !—অবিশ্বাসীর স্বরে বললে,—তাদের ভাষা কিছু কিছু জানি। বাজে কথা ব'লো না, তুমি নিশ্চয়ই বাঙালী।

কণ্ঠ একটু উচ্চে তুলে বললাম,—বাঙালী তো বাঙালী, তাতে হয়েছে কী ?

—কিছুই হয় নি,—কিন্তু তুমি কবি নও ?

—না।

কী ভেবে যেন আর-কিছু বলল না, ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল বিছানার এক ধারে।

রাত-বোধ হয় তখন শেষ প্রান্তে, ঘুমটা হঠাৎ গেল ভেঙে। শিয়রের কাছে জানালাটা বুঝি এক সময় খুলে দিয়েছিল। তাকিয়ে দেখি, বৃষ্টি কখন থেমে গেছে, মেঘ গেছে কখন কেটে, আকাশ পরিষ্কার, দিগন্তের তীরে শুকতারাটা

জলজল করে জলছে একমনে। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস এসে খেলা করছে ওর আঁচলপ্রান্ত নিয়ে।

ঘুমিয়ে পড়েছে বটে খাটের একটা ধার ঘেঁষে, কিন্তু ভাল করে তাকিয়ে দেখি ছুটি চোখের কোণ বেয়ে ছুটি অশ্রুধারা শুকিয়ে আছে। বড় মায়া লাগল দেখতে দেখতে।

উঠে বসলাম। জানালার কাছে বসে তাকিয়ে রইলাম আকাশের দিকে। শুকতারা ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসতে লাগল, একটা অস্ফুট আলোর ছটা বিস্ফুরিত হয়ে গেল পূর্ব দিগন্ত জুড়ে। সেই আলো ক্রমশ ফুটে উঠতে লাগল, থমথমে বৃক্ষশাখায় পাখিদের ঘুম ভাঙল—উড়ে-যাওয়া টিয়া-চন্দনার ঝাঁকই বেশী। কে আমি, কেথায় বসে আছি, সব ভুলে গিয়ে মনটা অদ্ভুত এক আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল। এই দেহযন্ত্রটা যেন বীণাযন্ত্র, কোন অদৃশ্য বীণকার এসে মুহূর্তে আমাকে বাজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ও-ও কখন জেগে উঠেছিল কে জানে! এক সময় কী মনে হতেই চমকে তাকিয়ে দেখি, আমার পাশটিতে বসে বিস্ময়-বিস্ফারিত বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার দিকে।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। প্রস্তুত হতে কতক্ষণই বা লাগল! ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে চারিদিকে। মুখচোখ ধুতে বাইরে যখন এসেছিলাম দেখেছিলাম সব দরজাই বন্ধ; শুধু বাইরে যাবার সেই পদ্মফুল-আঁকা দরজাটা খোলা। দূর থেকেই সেই স্থূলকায় মানুষটিকে দেখা যায়। ধূপ জ্বালিয়ে নটি মূর্তির পায়ে রাখছে নটি ধূপ। টাইটা গলায় লাগিয়ে ওর কাছে এলাম, বললাম,—যাই।

তেমনি প্রস্তরমূর্তির মতই বসে আছে। একবারও ওঠে নি বা আলনা থেকে নিয়ে আমার শার্ট-টাইটাও এগিয়ে দেয় নি। বললাম,—এই পাঁচটা টাকা রাখ। তোমাকেই দিলাম।

শুধু অবাক হওয়াই নয়, বড় ব্যথাতুর মনে হল সেই দৃষ্টি। বললে,— এ কেন?

—রাখ।

—কেন?

—এমনি। কিছু কিনে নিও আমার নাম করে।

বললে,—আর আসবে না, না?

একটু হাসলাম শুধু উত্তরে, কিছু বললাম না, তাড়াতাড়ি চলে এলাম বাইরে।

স্থূলকায় মানুষটির পরনে সেই পট্টবস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। এরই মধ্যে তার স্নান সারা হয়ে গেছে মনে হল। সূর্যমূর্তির পায়ে একটি রক্তকরবী ফুল রাখতে রাখতে বলে উঠল,—চললেন বাবুজী ?

—হ্যাঁ।

—আজ আসছেন তো রাত্রে ?

—না।

দ্রুত সরে এলাম, সদর দরজা খুলে পড়লাম গিয়ে একেবারে পথে। একটি জানালা যে খোলা থাকবেই তা আমার জানা। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করাও কর্তব্য মনে করলাম না। করেই বা লাভ হত কী ? ম্যাঙ্গানিজ 'ওর' খোঁড়া হয়েছে যেখানে, সেখানে যেতে হবে আমাকে একটু পরেই। প্রচুর কাজ আজ হাতে।

বোধহয় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলাম দুটো দিন কাজ নিয়ে। হেড অফিসে চিঠি লেখা, ম্যঙ্গানিজের নতুন স্যাম্পল নিয়ে পার্সেল করে পাঠানো, ম্যাঙ্গানিজের খনির মধ্যে নেমে নিজের চোখে স্তর পরীক্ষা করা।

পাম্বলু বললে,—কী ব্যাপার বাবু, আপনি কি এক মাসের কাজ এক দিনে শেষ করতে চান ?

—তা করতে পারলে খুবই খুশী হতাম পাম্বলু, কিন্তু পারছি কই ?

ঘনশ্যামদাসবাবু হেসে হেসে বললেন,—এখানে কি আর মন টিকছে না বাবুজীর ?

—তা নয়, তবে কাজটাও তো করতে হবে।

—জরুর জরুর—ঘনশ্যামদাসজী বললেন,—আমি বলছি কী, আপনাকে আরও কিছুদিন আমার কাছে আটকে রাখব। ম্যাঙ্গানিজের দুটো 'কোয়ারি' তো আপনি দেখেছেন আমার। আমি বলি কী, আপনি আরও থোড়া বহুৎ 'প্রস্‌পেক্টিং' করুন। ভাল পারসেণ্টের ম্যাঙ্গানিজ যদি পাওয়া যায় তো, বাস্‌, আপনার ওই 'ভাইজাগ' পোর্ট আমাদের।

হেসে বললাম,—এ তো মহৎ প্রস্তাব। আপনি আমাদের এজেন্ট, আমাদের

হেড অফিসে এই মর্মে একখানা চিঠি দিন, তার কপিটা দিন আমাকে, বাস্, 'প্রস্পেক্টিং' শুরু করি।

—বহুৎ আচ্ছা,—ঘনশ্যামদাসজী বললেন, অনেক খাটতে হবে আপনাকে বাবুজী, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে হবে, পাহাড়ে পাহাড়ে ফিরতে হবে।

—তাতে আমার খুবই উৎসাহ। বলুন না, আজই বেরিয়ে পড়ি।

খুশী হয়ে হাসতে লাগলেন ঘনশ্যামদাসজী, বললেন,—আপনাকে যতদিন আটকে রাখতে পারি, ততই আমার লাভ বাবুজী। আপনাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেব।

—তা নিন।

হাসলেন ঘনশ্যামজী, তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে উঠলেন,—বাবুজী, দেবীপল্লী কেমন লাগল?

—দেবীপল্লী! মানে?

—সে-সন্ধ্যায় যেখানে গিয়েছিলেন ওটাকে আমরা দেবীপল্লী বলি।

হঠাৎই এই বিষয়ের কথা ওঠায় একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম, বলাই বাহুল্য। ঘনশ্যামদাসজী কিন্তু রসিক লোক, বললেন,—নওজোয়ান আপনারা, তার ওপর বিয়েসাদী করেন নি, একটু ফুর্তিটুর্তি না করলে চলে! তা ছাড়া, এই বন জঙ্গল, পাহাড় পর্বতে ওটাই হচ্ছে এখানকার একমাত্র রোশনাই।

বললাম,—কিন্তু 'দেবীপল্লী' নাম কেন?

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেলেন ঘনশ্যামদাসজী, তারপরে গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন,—যে বাড়িতে গিয়েছিলেন, ওটাই সেরা বাড়ি। ওখানেই 'দেবী'রা থাকেন।

—দেবী কেন?

বললেন, সেই ছেলেবেলায় ওদের দেবতার সঙ্গে বিয়ে হয় কিনা, সেইজন্য দেবী বলে ওদের।

কোনক্রমে উচ্ছ্বসিত হাসিকে রোধ করে সংক্ষেপে বললাম,—ও।

তারপরে কয়েকটা দিন ধরে সত্যি-সত্যিই চলল প্রসপেক্টিং। সারাটা দিন, সকাল থেকে সন্ধ্যা, ক্রমাগত ঘুরে বেড়িয়ে খেটে-খুটে এসে শুয়ে পড়তাম একেবারে মৃতের মতো। ঘুম আর ঘুম।

এক-একদিন মনটা যেন হঠাৎ বিবশ হয়ে যেত। আয়নায় নিজেই নিজের চোখ দেখতাম ভাল করে। আমার চোখে কবির দৃষ্টি? হো-হো করে হেসে

উঠতাম আপন মনে। কবি কাকে বলে? দুটি চরণ মিলিয়ে ছন্দ কস্মিনকালেও রচনা করেছি বলে মনে পড়ে না।

'প্রসপেক্টিং' করতে যেতাম সেই বিরাট হুমড়ি-খাওয়া পাহাড়টা পেরিয়ে। পাহাড়টির সানুদেশে, যেখান থেকে উঠেছে বিশাল অরণ্যানী বুকে করে আর-একটি পাহাড়। এই সানুদেশের শোভা জীবনে কখনও ভুলব না। দু দিকের দুই পর্বত-শীর্ষ বেয়ে শুভ্র মেঘপুঞ্জ আসে নেমে, কোথা থেকে যেন স্ফটিকের মতো ধারায় ধারায় নেমে আসে উপলমুখরা ছোট একটি ঝরনা। বিরাটকায় খয়েরী একটা পাথরের ওপরে এক ঝাঁক পরীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে উচ্ছ্বসিত কল্লোলে সেই ঝরনার একটি ধারা, দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

কুলিরা এসে ডাকে,—বাবু!

পাম্বলু আপন উৎসাহেই আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, সে বলে,—বাবুজী, যাবেন না? এগুবেন না আর?

—না। আর-একটু বিশ্রাম করতে দাও ওদের।

ওরা সবাই মিলে জটলা করে একটা ঝাঁকড়া-মাথা গাছের তলায়, আর আমি বসে থাকি চুপচাপ একটা পাথরের ওপরে ওই অপরূপ ঝরনাটির দিকে তাকিয়ে। এ কী অপূর্ব প্রাণ-কলরোল! বিপুল এক আনন্দের উচ্ছ্বাসে বুকের ভিতরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে, চোখের কোণ ওঠে ভিজে।

কাজের ক্ষতি হয় বইকি। যা আমার জীবনে কখনও হয় নি, তাই হতে থাকে। এক-একদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় ওই ঝরনার ধারে বসে।

পাম্বলু এসে হয়তো পিছন থেকে ডাকে,—বাবুজী, যেখানে শাবল চালাতে বলেছিলেন সেখানকার কাজ শেষ হয়েছে, এসে দেখবেন কি একটু?

—আঃ! বলে উঠি বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে, তুমিই দেখে নাও না। আর উঠতে পারি না আমি।

আমার এ অভাবিত বিরক্তিতে অবাক হয়েই পাম্বলু চলে যেতে থাকে।

হঠাৎ মনে হয়, আরে, তাই তো! হয়েছে কী আমার!

সঙ্গে সঙ্গেই উঠে হাঁকডাক শুরু করে বলি,—পাম্বলু, দাঁড়াও। আমি নিজে না দেখলে হবে না।

হয়তো কুলিদের হাত থেকে প্রচণ্ড উৎসাহে নিজেই টেনে নিই শাবলটা, একদমে বেশ খানিকটা খুঁড়ে ফেলে তারপরে শ্রান্তিতে হাঁপাতে থাকি।

ঘনশ্যামবাবুর দুটো 'কোয়ারি'র 'ওর' থেকে পাঠানো স্যাম্পলের বিবরণ এসেছে। খুবই আশাপ্রদ। অতএব তাঁর খুশির আর সীমা নেই।

রাত্রে হোটেলে আহার্য-গ্রহণের সময় পাম্বলু বলে ওঠে,—আপনার কী হয়েছে বাবুজী ?

—কী ?

—আমাদের মত নিরামিষাশী হয়ে উঠলেন যে !

—মানে ?

হাসল পাম্বলু, বললে,—এই যে হোটেলে খাচ্ছেন, কদিন ধরেই তো দেখছি, মাছ-মাংস একেবারেই অর্ডার দিচ্ছেন না !

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম,—আরে, দূর। দাঁড়াও, আজ একটু মাছ খাব। এই বয় !

কিন্তু বয় এসে জানাল, অর্ডার নেই বলে মাছ তো সে বাবুজীর জন্য রাখে নি, মাংসও না।

মনের মধ্যে কিন্তু একটা খুশির অন্তঃস্রোতই বয়ে গেল, অথচ বাইরে কপট বিরক্তি প্রকাশ করেই চেঁচিয়ে উঠলাম,—রাবিশ! কালই ছেড়ে দেব এ হোটেলে খাওয়া।

অথচ রাত্রে একাকী বিছানায় শুয়ে কী এক অব্যক্ত বেদনার আবেগে যেন ছটফট করতে থাকি। নিশুতি রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন চুপিচুপি চোরের মতন উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে আয়নাটা টেনে নিই,—আশ্চর্য, কী দৃষ্টি আমার মধ্যে দেখেছিল ওই মেয়েটি ?

চিন্তাটা যেন তীরের মতন গেঁথে গেল আমার মনের মধ্যে। টেনেও ফেলতে পারছি না, থেকেও যন্ত্রণার অবধি নেই! আমি কবি! অর্থ কী 'কবি' শব্দের ?

হঠাৎ দপ করে আলোর মতো জ্বলে উঠল মনে একটা কথা। যারা চরণ মিলিয়ে ছন্দ রচনা করে, তারাই কি মাত্র কবি ? না, অন্য কোনও অর্থ করেছে ওই মেয়েটি 'কবি' শব্দটির।

পরদিন সকালে পাম্বলুকে পাঠালাম ডেকে, নীচের ঘর থেকে উপরে। বললাম, —আজ ছুটি নিচ্ছি।

—বেশ তো। আমি কুলিদের বলে দিই অন্য কাজে যাক ওরা।

—যাক।

আবার পাম্বলু ফিরে এসে কাছে দাঁড়াতেই বললাম তাকে মনের ইচ্ছাটা খুলে। রীতিমত খুশী দেখাল পাম্বলুকে, বললে,—এতে এত 'কিন্তু' কেন বাবুজী ? আপনি সেই একদিন গিয়ে আর তো—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম,—ছেড়ে দাও সেসব কথা। আজ হঠাৎ ইচ্ছা হল।

পাম্বলু বললে,—বেশ তো। আপনাকে যেতে হবে না, আমিই ওখানে গিয়ে সব বলে আসছি।

—টাকাটা ?

—দিন।

ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ফিরে এল পাম্বলু। বললে,—সব বন্দোবস্ত করে এলাম বাবুজী।

—আচ্ছা।

সন্ধ্যার পরই গিয়েছিলাম। দরজাটা বন্ধ ছিল, কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই গেল খুলে। নারায়ণ হাসিমুখে সম্বর্ধনা জানিয়ে বললে,—আসুন বাবুজী, অনেক দিন আসেন নি, আমি ভাবলাম, চলেই বা গেলেন বুঝি।

—না। কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তারপর ?

হেসে বললে,—ভালই আছি বাবুজী। খবর সব ভাল।

তেমনি নটি মূর্তির পায়ের কাছে নটি ধূপ জ্বলছে, চারিদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে হাসিমুখেই বললাম,—আজও কি ফুলের নাম বলতে হবে ?

বিনীত ভঙ্গিতে বললে,—সেটাই তো নিয়ম।

বললাম,—ফুলের নাম যা বলব তা তো আপনার জানাই। চাঁপা ফুল।

—ও, আচ্ছা! বলে আমাকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে উঠোনে দাঁড়িয়ে ডেকে উঠলেন,—চম্পা!

দেখা গেল মেয়েটিকে। বারান্দার একটা থামের কাছে এসে সে দাঁড়িয়েছে, আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে না তাকে ভাল করে। নারায়ণ সেই দিকে নির্দেশ করে বললেন,—যান বাবুজী। আপনি তো আর নতুন নন।

ঘরটা কি ও বদল করেছে ? ঘরে ঢুকে একটু অবাকই হয়ে গেলাম। সেই খাট, সেই রকমই আসন একখানা পাতা। সেই রকমই বিষ্ণুমূর্তি একটি কুলুঙ্গিতে। কিন্তু সব সেই রকম হয়েও যেন ঠিক সেই রকমটি নয়।

আমার দিকে একবারও তাকায় নি চম্পা, আমিও দেখতে পাই নি ওর মুখ,

আমার দিকে পিছন ফিরে ঘরখানা দেখিয়ে দিয়েই ও চলে গিয়েছিল। আবার সেই রকম জানালার বাইরে দুটি একটি মুখ, একটু চুড়ির রিনিঝিনি। আবার সেই রকম দুটি মেয়ের ওকে নববধূর মতন দু দিকে ধরে আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে যাওয়া।

মুখ নিচু করে একটি মোড়ার উপর বসে ছিলাম। সঙ্গের মেয়ে দুটি অপসৃত হতেই মনে হল, এইবার বুঝি হবে সেই রকম বরণের পালা!

কিন্তু, তা কিছু হল না, বরণের ডালাও নামিয়ে রাখল না আমার পায়ের কাছে। মুখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকাতে গিয়েই হতবাক্ হয়ে গেলাম সুকঠিন বিস্ময়ে।

কোনও ডালা নেই ওর হাতে! কিন্তু আশ্চর্যের কথা, আমার সামনে নীলাম্বরী একটি শাড়ি পরে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে চম্পা নয়, অন্য একটি মেয়ে।

উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে। মেয়েটির গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সুঠাম দেহভঙ্গি, সুশ্রী মুখ,—সম্ভবত সুন্দরীর পর্যায়েই ফেলা চলে।

বললাম,—তুমি কে? চম্পা কোথায়?

মেয়েটি ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে,—আমিই চম্পা।

—না না, তুমি কেন হবে? চম্পা, মানে, সে—মানে—

একটু থেমে আবার প্রশ্ন করলাম,—কজন চম্পা আছে এখানে?

—কেন! একজন। আমিই তো।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলাম,—না না, তোমাকে আমি চাই না। আমি চাই—

কথা শেষ না করেই বলে উঠলাম,—যাচ্ছি আমি নারায়ণের কাছে।

মেয়েটিকে অবাক করে দিয়ে তাড়াতাড়ি আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। কোনদিকে না তাকিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেলাম নারায়ণের ঘরের দিকে।

আর-কেউ ছিল না অবশ্য ঘরে সৌভাগ্যবশত। সোজা হয়ে সে বসে ছিল চুপচাপ দুটি চোখ বন্ধ করে। ডাকলাম,—নারায়ণজী!

—উঁ? কে?

—আমি।

—ও বাবুজী! আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল,—কী ব্যাপার?

রুদ্ধনিশ্বাসে বললাম,—যাকে খুঁজছিলাম ও তো সে নয়।

আশ্চর্য হয়ে বললে,—কাকে খুঁজছিলেন?

বললাম,—সেদিনকার সেই মেয়েটি—চম্পা।

একটু যেন ভেবে কী মনে করতে চেষ্টা করল, বললে,—আপনি যেন সেই কবে এসেছিলেন? তারিখটা মনে আছে বাবুজী?

—আছে।

বললাম তারিখটা। সেই খেরো-বাঁধানো খাতাখানা খুলে কী যেন দেখতে লাগল সে। একটা পৃষ্ঠা দেখে পাতা উল্‌টে অপর এক পৃষ্ঠায় এল সে, কী দেখে বলে উঠল,—বাবুজী, তাকে তো আজ পাওয়া যাবে না।

—কিন্তু আমি এসে তো তাকেই খুঁজেছিলাম প্রথমে।

আমার দিকে তাকিয়ে ভারি স্নিগ্ধ ভঙ্গিমায় হাসল লোকটি, বললে,—আপনি বসুন বাবুজী।

বসলাম।

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললে,—তার নাম তো চম্পা নয়।

—সে কী! তবে যে সেদিন—

বাধা দিয়ে বলে উঠল,—আপনি এখানকার কিছু শোনেন নি দেখছি। ওর নাম আজ হচ্ছে রজনীগন্ধা।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল ওর বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝতে, তারপরে বলে উঠলাম,—ফুলের নামে বুঝি নাম রাখা হয় মেয়েদের?

—হ্যাঁ বাবুজী, দেবতা সাক্ষী করে এই নামকরণ।

—রোজই রাখা হয়?

—হ্যাঁ, রোজই। সে আমাদের একটা প্রক্রিয়া আছে। যে যে ফুল পাওয়া যায় বাগান থেকে, সেই সেই ফুলে নাম রাখা হয় মেয়েদের এবং এ নিয়মটা ওরা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গেই মেনে থাকে।

একটুক্ষণ থেমে তারপর বললাম,—ধরুন, আমি এসে এমন ফুলের নাম করলাম, যে নাম সেদিন কোনও মেয়েরই রাখা হয় নি, তখন?

—হ্যাঁ সে রকমটাও ঘটে। তখন আপনাকে বলবো আর-একটা ফুলের নাম করতে।

উত্তেজিত ভঙ্গিমায় বলে উঠলাম,—কিন্তু কেন এ নিয়ম?

একটু হাসল সে ধীর গলায়, বললে,—আমাদের কথা আপনি জানতে চান বাবুজী?

—হ্যাঁ, তা চাই।

—কী লাভ?

—এমনি। কৌতূহল।

—বেশ। আপনার কৌতূহল একদিন মিটবেই বাবুজী। তবে কিছু অপেক্ষা করুন।

—কেন ?

একটু হেসে বললে তেমনি ধীর কণ্ঠে,—অধৈর্য হবেন না। ওটা কোন কাজের কথা নয়।

নিশ্চুপ বসে রইলাম কিছুক্ষণ, তারপরে বললাম,—আচ্ছা, সেই মেয়েটির দেখা কি আর পাওয়া যাবে না ?

তেমনি টুকরো হাসি ওর মুখে, বললে,—সেটা খানিকটা আপনার ভাগ্য, আমরা কিছু বলতে পারব না বা নির্দেশ দিতে পারব না, এই নবগ্রহমূর্তির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পর পর নটি মূর্তির পায়ের কাছেই পড়ে আছে ফুল, পুড়ছে ধূপ। বললাম,—আচ্ছা নারায়ণজী ?

—বলুন ?

—আমি যদি আজকের চম্পার কাছে না যাই ?

একটা কালো ছায়া খেলে গেল ওর মুখের ওপর দিয়ে ঃ—যাবেন না ?

—না।

একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে বললে,—তা হলে মেয়েটির একটু ক্ষতি হবে বাবুজী।

—ক্ষতি কেন ? না না, ও-টাকা আমি ফেরত চাই না।

সে বলে উঠল,—না বাবুজী, ধর্মত ও-টাকা তা হলে আমরা নিতে পারি না। বললাম তো আমরা ভয়ানক নিয়ম-কানুনে আবদ্ধ।

—কিন্তু কে করেছে এ নিয়ম ?

একটু হেসে বললে,—ধরুন আমরা।

—তা হলে নিয়মের ব্যতিক্রম করতেই বা দোষ কী ?

—না, গম্ভীর স্বরে সে বললে,—এখানকার সব-কিছুই এই নবগ্রহকে সাক্ষী করে, এর ব্যতিক্রম কিছু করতে কেউ পারবে না।

শুনতে শুনতে হঠাৎই আমার একটি কথা জেগে উঠল মনে। মনে হল, আমাকেই বা এত ভাবালুতায় পেয়ে বসেছে কেন ? না হয় আজকের এই চম্পার সঙ্গেই আলাপ করে আসি। কে সেই একদিনের মেয়েটি, যার জন্য এত ব্যাকুলতা ! নারায়ণই বা মনে করছে কী !

বললাম,—ঠিক আছে। এই চম্পার কাছেই যাব। সত্যি কথা বলতে কী, যে কোনও চম্পাই আমাদের কাছে সমান।

যেন একটা পাষাণের ভার নেমে গেল নারায়ণের বুক থেকে, বলে উঠল,—এইবারই ঠিক কথা বলেছেন বাবুজী। এসব জায়গায় একজনের মনের সঙ্গে মন বাঁধলে দুঃখ পেতে হয়। আপনি দেখুন গিয়ে, আমাদের সব মেয়েই সমান। সবাইকে সমান শিক্ষা দিই আমরা। লক্ষণ দেখে. অনেক বেছেই আমরা ওদের রাখি এই বাড়িতে।

উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণ। মনে হল, ঠিকই হয়েছে। একটা পরীক্ষা করতে হবে। সেদিনকার চম্পা যা যা করেছিল, এও তাই করবে, হয়তো একই কথার পুনরাবৃত্তি করবে। হয়তো এও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলবে, তুমি কবি।

সঙ্গে সঙ্গেই চেনা হয়ে যাবে এই নিপুণিকাদের।

একপা এগিয়েও ফিরে এলাম, বললাম,—আচ্ছা, সেদিন সেই মেয়েটি বরণডালা হাতে আমাকে বরণ করেছিল, এ তা করলো না কেন ?

বলল,—এ বাড়িতে সে যে ছিল আপনার প্রথম দিন। প্রথম দিনে প্রথম যে মেয়েটি আপনার কাছে আসবে, সে-ই সবার হয়ে বরণ করে নেবে আপনাকে।

—এর অর্থ কী নারায়ণজী ?

—সব-কিছুর অর্থই হচ্ছে এক। কিন্তু সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে আপনার একটু দেরী হবে বাবুজী। আপনাকে অনেক দেখতে হবে, অনেক কিছু বুঝে নিতে হবে।

আর কোনও কথা না বলে সেই পদ্মফুল-আঁকা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই লক্ষ্য করলাম অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে একটি থামের গায়ে হেলান দিয়ে সেই মেয়েটি, সেই নতুন চম্পা।

তার কাছে আসতেই চলতে আরম্ভ করল সে।

তার ঘরে এসে প্রথমে বসতে গিয়েছিলাম খাটের ওপর। কিন্তু পরক্ষণে সেই পূর্বেকার আচরণ মনে পড়তেই এগিয়ে গিয়ে বসলাম মেঝেতে, পাতা আসনটির উপরে।

সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল সব কিছু। বললে,—আসনে গিয়ে বসলেন কেন ?

—বাঃ রে ! তোমাদের সেই নিয়ম। আজ অবশ্য মোজা জুতো নেই, তবে সেই হলুদ-বাটা দিয়ে—

কথা শেষ হতে না হতেই খিল খিল করে হেসে উঠল সে, মুখে আঁচল দিয়ে বলে উঠল,—পেল্লী ?

'পেল্লী' মানে, বিয়ে। বললাম,—বিয়ে! বিয়ে কেন ?

বললে,—নারায়ণ যে বললে, আপনি নতুন নন। আমাদের হয়ে একজন তো আপনাকে বরণ করে নিয়েছে। তবে আবার কেন ? আসুন, খাটের ওপর ওঠে আসুন।

বলে উঠলাম,—সর্বনাশ! সেদিন ছিল তবে আমার বিয়ে! খাবার দাবারও আজ হবে না বুঝি ?

এবার আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে এল কাছে, বললে,—ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি ? খাবেন ? রান্নাঘরে গিয়ে বলে আসব ?

বুঝলাম ব্যাপারটা। উঠে দাঁড়িয়ে খাটের দিকে যেতে যেতে বললাম,—না। হোটেলে গিয়েই খাবো। সেদিন সে মেয়েটি খাইয়েছিল কিনা, তাই ভেবেছিলাম, ওটাও নিয়ম বুঝি।

একটু হেসে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কাছে এসে বসল মেয়েটি, ছুটি চোখ আমার চোখে স্থাপিত করে বললে,—গান শুনবে ?

—গান ? জান তুমি ?

—জানি। হিন্দী গানও শিখছি, ছুটি-একটি গাইতে পারি। শুনবে ?

—না। আচ্ছা, নাচতে পার ?

—হ্যাঁ। বলতে বলতে সোৎসাহে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, বললে,—শুধু একবার নারায়ণকে বলতে হবে। বাজনা চাইত ?

—না।

—তবে ?

বললাম,—তুমি বসো। তোমার সঙ্গে শুধু গল্প করবো।

মেয়েটি বুঝি একটু ক্ষুণ্ণ হল, ধীরে ধীরে বসল এসে কাছে। তেমনি হাঁটু মুড়ে, আমার কোলের কাছটিতে।

বললাম,—আচ্ছা, তোমরা কি সবাই নাচ গান জান ?

—হ্যাঁ।

—সেই মেয়েটিও জানত কি ?

—কোন্ মেয়েটি ?

—সেই যে আমার প্রথম রাত্রির মেয়েটি ?

একটু থেমে তাকিয়ে রইল আমার দিকে, বললে,—কে সে জানি না। তবে জানে সে নিশ্চয়ই।

বললাম,—কেমন লাগছে আমাকে ?

একটু থেমে মুখ টিপে একটু হেসে বললে,—ভালো।

আমি বালিশে ভর দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছি তখন। খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল মিটিমিটি, তারপর এক সময়ে বললে,—জামাটা খুলে রাখবেন না ?

—রাখছি।

জামাটা খুলে ওর হাতে দিতেই সে আগের চম্পার মতই জামাটা রেখে এল আলনায়। তারপর আবার আমার কাছে এসে হাতের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাতে বুলাতে বলতে লাগলো,—আমাকে কেমন লাগল বললে না তো ?

—ভাল, খুব ভাল।

বলতে বলতে হাত দুটি ধরে তাকে টেনে নিলাম আরও কাছে, সে কী ভেবে আমার মুখের দিকে তাকাল, বলল,—ছাড়ো। আমি এখুনি আসছি।

চলে গেল। মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরে এলো শাড়িটা বদলে অন্য একটা সাধারণ শাড়ি পরে। ঠিক সেই আগের চম্পার মতই। তবে এর মুখে বোধ হয় পান। আমার হাতেও একটি পান দিল এনে। বললে,—খাও।

তারপরে আবার তেমনি করেই কাছ ঘেঁসে এসে বসলো। আমার একখানি হাত কোলের উপর টেনে নিয়ে বললে,—কোন্ দেশের লোক গো তুমি ?

—নাই বা শুনলে ?

মুখ টিপে একটু হাসল, বললে,—আচ্ছা।

যতই লাস্যভাব থাক্ এর মধ্যে, যতই নিপুণা হোক ও কথাবার্তায়, আমার কিন্তু সব মিলিয়ে একটা বিতৃষ্ণাই জাগছে ওর প্রতি। অথচ স্বাস্থ্যসম্পদের দিক থেকে আগেরটির থেকে এ চম্পাই হয়তো আকর্ষণীয়া বেশী। বলছি বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অদ্ভূত একটা বেদনার রাগিণী রিন রিন করে বেজে চলেছে অনুক্ষণ।

বললাম,—কী দেখছ অমন করে ?

ঠোঁটের কোণে চটুল হাসি টেনে এনে বললে,—তোমাকে।

বুকের ভিতরটা অকস্মাৎ ঢিপ ঢিপ করে উঠল এই সময়, বললাম,—আচ্ছা চম্পা, বল তো আমার চোখ দুটো কেমন ?

—ভালো।

—কী রকম ভালো?

—কী রকম আবার? ভালো?

—আমি কী, বল তো? আমি কী রকম লোক? কী প্রকৃতির?

আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল, তারপরে একটু ভেবে বললে,—ভালো লোক।

—আর কিছু বলতে পারলে না তো?

—আর কী বলব? আর কী শুনতে চাও?

বলে উঠলাম,—আচ্ছা, আমার চোখ দেখে কী মনে হয়? আমি কি কবি?

মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর চোখ-মুখ, বললে,—তাই নাকি! তুমি কবি?

—তুমি বলতে পারলে না তো?

—বাঃ রে, আমি কী করে বলবো?

উঠে বসেছি ততক্ষণে। বললাম,—আমি সত্যিই কবি। ছন্দ মিলিয়ে কাব্য লিখি।

ও-সব অঞ্চলে কবির সম্মান বোধ হয় বেশী, নইলে 'কবি' কথাটা শোনামাত্রই আনন্দে এ-রকম হাততালি দিয়ে উঠত না অন্য কেউ। বললাম,—জামাটা দাও তো?

—ও মা, কেন?

—কবিদের অত কথা জিজ্ঞাসা করতে নেই।

উঠে গিয়ে জামাটা এনে দিলো, ওটা পরে নিয়ে বললাম,—লক্ষ্মী মেয়েটি, কবির কোনও কাজে বাধা দিও না, এখন যদি তুমি বাধা দাও, আমি একটি লাইনও লিখতে পারবো না।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালাম।

ও বললে,—এ কী চললে নাকি?

ওর হাত দুটি ধরে বলে উঠলাম,—মাথায় কবিতা এসে গেছে একটা, না লিখলে হারিয়ে যাবে।

বললে,—আমি কাগজ কলম এনে দিচ্ছি, এখানে বসে লেখ না?

—তা কী হয়?—বলে উঠলাম,—বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার নিজের সেই খাতাটায় লিখতে হবে। নইলে—। সে তুমি বুঝবে না। কবিদের ব্যাপারই আলাদা।

বিস্মিত বিমূঢ় মেয়েটিকে পিছনে ফেলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

সেদিনও হিন্দী গানের তান তুলেছে কোনও এক পুরুষকণ্ঠ—পিয়া গয়ো পরদেশ।

আর অন্য ঘরে ধ্বনিত হচ্ছে নূপুরের ঝঙ্কার, ঠিক সেই সেদিনকার মতো।

নারায়ণ বলে উঠলো আমাকে দেখে,—এরই মধ্যে চললেন বাবুজী ?

সেই বিশ্বনাথম্ ছেলেটি বসে আছে ওর কাছে. দুটি-একটি বই এদিক ওদিক ছড়ানো। একবার তার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়েই বলে উঠলাম,—হ্যাঁ আপনি কালকের টাকাটা রাখুন। কালও আসবো।

বিনীত ভঙ্গিমাতেই বলে উঠলো,—আসছেন যখন, কাল রাত্রে ওটা দিলেই হতো।

—না, নিন। আছে যখন কাছে।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম বাইরে। বাড়িটা পার হয়ে যেতে যেতে আপনিই আজ চোখ পড়লো সেই জানলাটির দিকে। সেই প্রথম দিনকার ঘর। জানলাটি কিন্তু খোলা ছিল না, ছিল বন্ধ করা।

পরদিন ভোরে হেঁটে-হেঁটে একাই গিয়েছিলাম পর্বতের ওপরে। ওদের শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের পাশ দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ ধরে ধরে পার হলাম পর্বত, ধীরে ধীরে নেমে গেলাম সেই অপরূপ ঝরণাটির কাছে। বসলাম গিয়ে আমার সেই প্রিয় পাথরটির ওপরে।

বহুক্ষণ কেটে গেল। কত কী এলোমেলো চিন্তার ঝড় উঠতে লাগল মনে। একসময় উঠে বসলাম, হাঁটতে হাঁটতে গেলাম ঘনশ্যামদাসবাবুর ‘কোয়ারিতে’। কিছুক্ষণ কাজকর্ম করে ফিরে এলাম বাড়ি।

হায় রে মিথ্যার তোরণ, আমার জীবনের একটা কোণেও কাব্য-রচনার ইতিকথা লুকিয়ে নেই।

রাত্রে সকাল-সকাল খাওয়া শেষ করেই গেলাম নারায়ণদের ওখানে। দেখি, সেই বিশ্বনাথম্ ছেলেটি এসে বসেছে সবে, হাতে তার ইকনমিক্সের বই ; বললাম, —পড়ো নাকি ?

একটু অপ্রতিভ হয়ে হেসে বললে,—হ্যাঁ, প্রাইভেটে।

তারপরেই আমাদের কথা বলবার অবকাশ দিয়ে চলে গেল বাইরে। বললাম, —বলবো ফুলের নাম ?

—বলুন।

—জুঁইফুল।

একটু হেসে বললে,—আজ ও-নাম কারুরই রাখা হয় নি।

—তা হলে গোলাপ।

তেমনি হেসেই বললেন,—অন্য নাম করুন বাবুজী।

বললাম,—পদ্ম।

—এবারও অন্য নাম করতে হলো।

—বেলকুঁড়ি।

—হয়েছে। আসুন।

গেলাম।

না, সে নয়। এও অন্য এক মেয়ে। যে-দুটি মেয়ে একে ঘরে এসে পৌঁছে দিয়ে গেল, তাদের মধ্যে একজন কি,—সে? একবার যেন মনে হল তার মুখের হাসি দেখে। কিন্তু মুহূর্তের দেখাতেই সে বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হওয়া গেল না।

মেয়েটিকে যখন এটা-ওটা কথা বলতে দিয়ে ওর হাতটা টেনে আকর্ষণ করলাম নিজের দিকে, তখন সেই আগের দুটির মতই উঠে দাঁড়াল, বললে, —আসছি।

এলো আগের মেয়েদের মত শাড়ি বদলে। তেমনি খাটের ওপর এসে বসা, তেমনি জামা খুলে আলনায় রাখবার অনুরোধ, তেমনি হাতের ওপর হাত রাখা, তেমনি পান খাওয়ানো। দেখলাম মেয়েটিকে ভাল করে। এর কেশরাশি বেণীবদ্ধ নয়, খোলা কোঁকড়ানো চুলের রাশি মেঘের মত পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে। একটু ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি, কিন্তু ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ, বয়স অপেক্ষাকৃত কম, মুখ চোখ বুদ্ধি-দীপ্ত, রীতিমত সুন্দরী বলা চলে মেয়েটিকে। এরও দুটি হাত ধরে প্রশ্ন করলাম,—আমার চোখ দুটো দেখতে কেমন?

—কেন? ভালো।

—আমাকে কি দেখে মনে হয়, আমি কবি?

শোনামাত্র হেসে উঠলো খিলখিল করে, বললে,—ও বুঝেছি।

—কী?

—কাল একটি মেয়ের ঘরে আপনি কবিতা লিখতে চেয়েছিলেন না?

—কে বললে তোমাকে?

—আমি শুনেছি।

—তোমাদের মধ্যে এসব আলোচনা হয়, না ?

—ও মা, হবে না ?

—বেশ, এবারে বল তো, আমাকে কবি বলে মনে হয় ?

একটু অবাক হয়েই আমার দিকে তাকালো, তারপরে বললে,—বাঃ রে ! দেখে কি তা বলা যায় না কি ? আর তা ছাড়া, এর মধ্যে মনে হওয়া-হওয়ির কী আছে ? আপনি কবি নিজেই তো বলেছেন।

না।—তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলাম,—মিথ্যে কথা বলেছি মেয়েটিকে।

অবাক হয়ে বললে,—কেন ?

—সে তুমি বুঝবে না।

—বুঝবো না কেন ?

—সবাই সব কথা বুঝতে পারে না।

বলতে না-বলতেই উঠে দাঁড়ালাম, বললাম,—চলি।

—সে কী ! চললেন কেন ?

একটু হেসে বললাম,—রাত হয়ে গেল না ?

—ওমা তাতে কী ? না হয় ভোরেই যাবেন।

—না। এই তো অনেকক্ষণ গল্প করলাম।

বললে,—শুধু কি গল্প করতেই এছেছিলেন ? না হয় গানই শুনে যান।

—না।

আমি তখনও দরজার দিকে চলেছি দেখে বলে উঠলো,—শুনুন।

ফিরে দাঁড়ালাম,—কী ?

—নাচ দেখবেন ? নাচতেও পারি।

অল্প একটু হেসে বললাম,—না।

মেয়েটি অবাক হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। নারায়ণের ঘরে আসতেই ও যথারীতি বললে,—চললেন বাবুজী ?

—হ্যাঁ। এই নিন টাকা, কালকের।

পিছনের দরজা বন্ধ করে বাইরের পথে নেমে দেখি, আবার বর্ষণের আয়োজন চলেছে দিগন্তে। আবার সেই ঘনকৃষ্ণ মেঘের আনাগোনা। যেতে যেতে আজও ফিরে তাকালাম সেই জানালার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রক্ত যেন সঞ্চালিত হল হৃদ্‌পিণ্ডে। ভালকরে লক্ষ্য করে দেখি, জানালায় দাঁড়িয়ে একটি ছায়ামূর্তি। ভাল করে দেখা যায় না মুখ অন্ধকারে। কিন্তু আমি কাছাকাছি আসতেই তার একটি

বাহু আন্দোলিত হয়ে উঠল। প্রথমে মনে হয়েছিল, বুঝি ডাকছে আমাকে।

কিন্তু না। কী একটা যেন ছুঁড়ে দিল আমার পায়ের কাছে। পরক্ষণেই জানালা থেকে অদৃশ্য হল ছায়ামূর্তি।

মুখ নিচু করে পায়ের কাছে তাকিয়ে দেখলাম, একটা দোমড়ানো কাগজ। তাড়াতাড়ি সেটা হাতে তুলে নিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে এলাম বাড়ি।

আলোর সামনে কাগজটা ভাল করে মেলে পড়ে দেখলাম, খুব তাড়াতাড়িতে জড়ানো অক্ষরে লিখেছে। নিজেদের ভাষায় নয়; হিন্দীতে। তা-ও দেবনাগরী অক্ষরে নয়, রোমান অক্ষরে; জড়ানো জড়ানো আঁকাবাঁকা—ছোট ছেলে-মেয়েদের মতো কাঁচা হাতের লেখায়। সবটা ঠিক না বুঝলেও, বার কতক পড়বার পর ভাবটা বুঝলাম। 'শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে ভোগের ঘণ্টা বেজে উঠবে, সেই ঘণ্টার শব্দ শোনবার পর মন্দিরের পাশে যে ঝিলটা আছে, সেখানে যেও। আমার সঙ্গে দেখা হবে না, হওয়া উচিত নয়, দেখবে ঝিলের সংলগ্ন যে বাগানটা আছে, তার কোণে আছে বুড়ো একটা বেলগাছ। সেই বেলগাছের পায়ের কাছে থাকবে একরাশ ফুল। সেই ফুল চিনে নিও। তার এদেশী নাম না জানলে কারুর কাছ থেকে জেনে নিও সেই নাম। সন্ধ্যায় সেই নামই হবে আমার। কাগজটা ছিঁড়ে ফেলো।'

যেন সেতারের তারের মত বেজে উঠলো বুকের ভিতরটা। চিঠিটা পাগলের মত চেপে ধরলাম ঠোঁটের উপরে। তারপর, অনেক রাত্রে টুকরো টুকরো করে ফেললাম সেই লিপি। মনে মনে ভাবলাম, এ আবার কী প্রমত্ততায় পেয়ে বসল আমাকে!

সকালে আবার হাঁকডাক করে শুরু করলাম কাজ।

মন্দিরে ভোগের ঘণ্টা হয় এগারোটায়। আর কী হবে ওই ঘণ্টার শব্দ শুনেই বা! আজ তো যাবই নারায়ণদের ওখানে। নাম করব যে-কোনও একটা ফুলের। যে কোনও মেয়েই হোক না বক্ষলগ্ন, আসে-যাবে না তাতে কিছুই। নিজের মনে মনেই বলতে লাগলাম,

'হাত পেতে নাও সামনে যা পাও
বাকির খাতা থাক্ বাকি,
লাভ কী শুনে দূরের বীণা
মাঝখানে তার সব ফাঁকি।'

নিজের কানে কথাগুলি যেতেই চমকে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে। লোহা-তামার যে ব্যাপারী, তার মুখে আবার কাব্য কেন? আর কারই বা রচনা এই ছন্দোবদ্ধ বাক্যের? নিজের মনকেই যেন উত্তর দিল আমার আর-একটি মন, 'ওমর খৈয়াম'। বুকের পাষাণ ভার যেন নেমে গেল। নিজে যদি কোনক্রমে কিছু রচনা করে ফেলি, তা হলে সত্যি হবে সেই মেয়েটির কথা, কিন্তু মিথ্যা হবে আমার নিজের সম্বন্ধে নিজের ধ্যানধারণা সব-কিছু। তা হলে নিজেকেই আমি আর ক্ষমা করতে পারব না।

পর্বতের সানুদেশে 'প্রসপেক্টিং' করতে করতে হঠাৎ এক সময় কানে এল দূরাগত মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। শোনামাত্র কী হলো আমার মধ্যে কে জানে? পাম্বলুকে বললাম,—ব্যস্‌, আজ আর নয়, ছুটি।

বলে দ্রুত পায়ে প্রায় ছুটতেই শুরু করলাম মন্দিরের চূড়া লক্ষ্য করে। ঢং—ঢং—ঢং। বেজে চলেছে ঘণ্টা, আর মনের মধ্যে যেন অশ্রুত এক সঙ্গীত বাজতে লাগল, 'আসি—আসি—আসি'। পথ-বিপথ কিছুই ছিল না লক্ষ্যে, শুধু মনে একটিমাত্র কথা, আমাকে পৌঁছতেই হবে গিয়ে।

ঝিলের কাছে পৌঁছলাম যখন, মনে হল পড়েই বুঝি যাবো মাথা ঘুরে। কিন্তু না, দম হারালে চলবে না, কোথায় সেই বুড়ো বেলগাছটি?

বেশী খুঁজতে হলো না, মন্দিরের চতুঃসীমা-নির্দেশক ভাঙা প্রাচীরের প্রায় গা ঘেঁষেই একটি কোণে দাঁড়িয়ে আছে সুপ্রাচীন বেলগাছটি। ধারে-কাছে কেউ কোথাও নেই তখন, শুধু দূরে ঝিলের বাঁধানো ঘাটে দু-তিনটি মেয়ে স্নান করছে।

সত্যিই পড়ে আছে বৃক্ষমূলে একমুঠো ফুল, ডালশুদ্ধ কয়েকগুচ্ছ রক্তকরবী। তুলে নিলাম হাতে কিছু ফুল। বাসায় ফিরে আসছি, আর পথ হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছে এগুলো মাত্র ফুল নয়, যেন কার বুক-নিংড়ানো কয়েক ফোঁটা রক্ত।

ঘনশ্যামদাসজী গদিতেই ছিলেন, আমার সাড়া পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বললেন,—কী বাবুজী, কাম হয়ে গেল?

—হ্যাঁ, আজকের মত শেষ।

—বাস্‌, বাস্‌। এবার দুপুরটা লম্বা বিশ্রাম নিন।

—দেখা যাক।

ঘনশ্যামদাসজী ততক্ষণে আমার পিছনে পিছনে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির কাছে উপস্থিত হয়েছেন, নিম্নকণ্ঠে বললেন,—বাবুজী, বড় বিপদ হয়েছে।

—বিপদ!

—হ্যাঁ, আমার ছেলে, মানে সেই কালেজে-পড়া নওজোয়ান আর কী, একখানা খত লিখেছে কী, ও এখানে আসবে। কিন্তু কী করে আসবে বলুন তো বাবুজী ?

—কেন ?

বললেন,—আমার এখানে যে বউ আছে, ওরা তো তা জানে না।

—বেশ তো, না হয় জেনেই গেল, তাতে হয়েছে কী ?

—না, তাতে কিছু হয় নি। কিন্তু এখানকার কথা তো ওকে জানানো চলবে না বাবুজী।

—কেন চলবে না ? .

ঘনশ্যামদাসবাবু প্রায় ফিসফিস করেই বললেন,—আমার এখানকার বউ এদেশী আছে জানেন তো ? জওয়ানী ভী আছে। 'পঢ়িলিখি' নওজোয়ান ছেলের সামনে তাকে কী করে বার করি বলুন তো ? লজ্জাটা হচ্ছে সেইখানেই।

হেসে বললাম,—সত্যি করে বলুন তো, আপনার ভয় হচ্ছে কী নিয়ে ?

—আরে রাম রাম ! ঘনশ্যামদাসবাবু বললেন,—ভয়ের কথা হচ্ছে না। কথাটা হচ্ছে মনের শরম নিয়ে। এই কথাই ভাবছি। আচ্ছা, আপনি যান, একটু বিশ্রাম-টিশ্রাম করুন, আমি ভেবে দেখি, কী করা যায় !

উপরে উঠে এলাম তাড়াতাড়ি। কতক্ষণে ঘড়ির কাঁটাটা সরে যাবে, কতক্ষণে বিকাল হয়ে আসবে ?

পরনে আজ ধুতি-পাঞ্জাবি, সন্ধ্যা হতে না হতেই বেরিয়ে পড়লাম নারায়ণজীর উদ্দেশে। মনে একটা প্রচ্ছন্ন ভয়ও আছে, যদি আমার আগে কেউ নিয়ে ভিক্ষা চেয়ে বসে রক্তকরবী ফুল !

নারায়ণজী ফুলের নাম শুনে, খেরো-বাঁধানো খাতাটির সঙ্গে কী যেন মিলিয়ে নিলেন। তারপরে ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে বললেন,—যান বাবুজী ভিতরে।

গেলাম। ওর দরজার সামনে বারান্দার যে থামটা, সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিল ও। সিল্কের গোলাপী শাড়ি পরেছে, বেণীমূলে রক্তকরবী গাঁথা একটা মালা জড়ানো। আমাকে যেন পথ দেখিয়েই নিয়ে গেল ওর ঘরে। ভিতরে যেতেই কপাট দিল বন্ধ করে, তারপর দুটি চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমার দৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে কয়েকটি মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল হয়ে, তারপরে সেই অস্ফুট বীণা-ঝঙ্কারের মতই বলে উঠল,—সাম্প্রত্যয়াত্মিকা প্রীতি কাকে বলে জানো ?

মাথা নেড়ে জানালাম,—না।

বললে,—এই হচ্ছে সেই লোক যাকে আমি চাই—দেখামাত্রই যখন এই কথা মনে হয়, তখনই তা হয়ে দাঁড়ায় সাম্প্রত্যয়াত্মিকা প্রীতি।

এগিয়ে এসে দুটি হাতে লতার মত বেষ্টন করে ধরলো আমাকে। বললে,—ওদের কথা শুনেই বুঝেছিলাম, এ তুমি ছাড়া আর-কেউ নয়। হ্যাঁ গো, ওদের বুঝি তোমার ভাল লাগে নি?

কণ্ঠে জোর এনে বললাম,—দূর! কে বললে ভা'ল লাগে নি?

—তবে, পালিয়ে যেতে কেন?

—কী মুশকিল, পালালাম কোথায়?

—পালাও নি? ওদের কাছে সব শুনেছি।

বললাম,—তোমাদের জীবনকে জানবার জন্য একটা কৌতূহল। যতটা জেনেছি, তাতেই তৃপ্ত হয়ে চলে গেছি।

মুখ টিপে একটু হেসে বললে,—আমাকে খুঁজে বেড়াও নি?

—না। কে বললে তোমাকে?

—কে আবার বলবে? আমি বলছি। যেভাবে আগ্রহভরে আমার চিঠি কুড়িয়ে নিলে পথ থেকে, তা যে দেখেছে, তার কী বুঝতে কিছু বাকী থাকে! আর ব্যাকুল হয়ে আমার এই জানালাটার দিকে তাকানো?

—কে দেখেছে তা?

বললে,—এই পোড়া চোখ।

বললাম,—এক হিসেবে কথাটা সত্যি, তোমাকে খুঁজছিলাম বটে।

কথাটা শুনে আনন্দের শিহরণ লেগে যেন কেঁপে উঠলো ওর সর্বশরীর, বললে,—এসো, বসবে এসো স্থির হয়ে।

সেদিনের মতই জামাটা খুলিয়ে নিয়ে রেখে এলো আলনায়। সেদিনের মতই আমাকে বিছানায় এলিয়ে পড়তে দেখে খুব কাছ ঘেঁষে এসে বসল হাঁটু মুড়ে, বুকে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে,—আমার জন্য কষ্ট হতো?

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিমায় বললাম,—দূর। কষ্ট আবার কী? তবে, তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার দরকার ছিল।

—কী রকম?

একটুক্ষণ থেমে থেকে, তারপরে গম্ভীরকণ্ঠে বলে উঠলাম,—আমি কবি নাকি?

দুটি করপল্লবের মধ্যে টেনে নিলো আমার মুখখানা, বললে,—সন্দেহ আছে নাকি ?

বললাম,—একটা প্রশ্ন করবো। 'কবি' বলতে তুমি কী বোঝো ? যিনি ছন্দ মিলিয়ে কাব্য রচনা করেন ?

—যিনি কাব্য রচনা করেন না, তিনিও কবি হতে পারেন।

—যথা ?

বললে,—অপরূপ এই বিশ্বজগতের ভিতরকার সৌন্দর্য দেখবার মতো যাঁর চোখ আছে,—আমার মতে, তিনিই কবি। রচনা করুন আর নাই করুন, মনটা তাঁর কবি-মন।

অত্যন্ত অবাক হয়েই উঠে বসেছি ততক্ষণে, বললাম,—অবাক কাণ্ড! এমন করে বুঝবার মত চোখই বা তুমি কোথায় পেলে, মনই বা তুমি কোথায় পেলে ?

সঙ্গে সঙ্গে ওর দুটি চোখ ভরে উঠলো জলে, বললে,—ওসব জানি না, তুমি শুধু বলো আমার অনুমান মিথ্যা নয় ?

কিন্তু এর উত্তর দেওয়া যে আমার পক্ষে কত কঠিন, তা কি ও জানতো ? ছোট থেকেই প্রকৃতি আমায় টানে, পশু-পক্ষীর জীবনলীলার বৈচিত্র্য আমার কৌতূহল উদ্রেক করে, ভাব-পাগল বিচিত্র এক ব্যক্তি ছিলাম আমি শৈশবে। এই সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হওয়া, অনুভূতি ও ভাবের ঘোরে বিহ্বল হয়ে যাওয়া—এর জন্য যে কত নির্যাতন সহ্য করেছি অভিভাবকমণ্ডলীর কাছ থেকে, তা বলবার নয়। তাই সে মনকে একদিন টুঁটি টিপে মেরে ফেলে কর্মক্ষেত্রের দৈনন্দিনতার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি নিজেকে।

বললাম,—আজকের দিনে ভাবুক মন নিয়ে জন্মালে অশেষ দুঃখ আর অবিচার যে শিরোভূষণ হয়ে দাঁড়ায়, তা জানো ?

বললে,—শুধু আজকের দিনে কেন, চিরদিনই এটা হয়। কোন্ ভাবুক না অত্যাচারিত হয়েছেন, তুমি তা বলো।

বালিশে মাথা হেলিয়ে দিয়ে কাছে টেনে নিলাম ওকে, বললাম,—আচ্ছা, এত সব তুমি জানলে কেমন করে ?

ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে বললে,—শিখে রেখেছি তোমাদের মনোরঞ্জন করবার জন্য, বুঝলে ?

বলতে না-বলতেই উঠে দাঁড়ালো, বললে,—আসছি।

সেই ওদের নিয়মবাঁধা রীতি। প্রায় মিনিট পনেরো পরে ফিরে এলো।

তেমনি খাবারের থালা আর গেলাস হাতে। বললাম,—যতদূর জেনেছি, তাতে বুঝেছি, খাওয়ানোর ব্যাপারটা শুধু প্রথম দিনটির জন্য। তবে আবার এ ব্যবস্থা হলো কেন?

বললে,—খেয়ে যে আসো নি, এটা বোঝা কি খুবই কঠিন?

—না, তা হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু হোটেলে গিয়েও খেতে পারতাম তো।

—না। এখানে যে একটি শত্রু আছে, সেটি সে হতে দেবে না। নাও, এসো।

আসনে গিয়ে বসতে বসতে বললাম,—শত্রুপক্ষীয় এ অত্যাচার অমানুষিকতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না কি?

—তা অত্যাচারই যদি বলো, সীমা একটু ছাড়াবে বই কি। এই, দাঁড়াও—

—কী?

কাছে এসে বসলো মেঝের ওপরে,—বললে,—একটা সাধ আমার মেটাবে?

—কী সাধ?

অদ্ভুত স্নেহমণ্ডিত দুটি চোখের দৃষ্টি। বললে,—রাগ করবে না?

—না। বলোই না তুমি।

মৃদুকণ্ঠে বললে,—আমি খাইয়ে দেবো?

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে! এ কী অদ্ভুত ওর প্রস্তাব!

ও কিন্তু এগিয়ে এলো আরও কাছে, খাবারের থালায় হাত রেখে কেমন যেন এক আবদার ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো,—কোনও বারণ শুনবো না কিন্তু।

বললাম,—বারণ করবো না একটি শর্তে।

—কী?

বললাম,—তোমাকেও সঙ্গে খেতে হবে কিন্তু।

ঈষৎ লজ্জিত হয়ে মুখ নামালো, বললে,—যাঃ!

—যাঃ কী।

বললে,—বিশ্বাস করো, আমি খেয়ে এসেছি।

বলে, আর আমায় কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে, তাড়াতাড়ি খাবারের গ্রাস হাতে তুলে নিয়ে বলে উঠলো,—নাও এসো। আর দেরী করো না।

অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে ভরে গেল মন।

খাওয়ার পর্ব চলতে চলতে মনে হলো, এ মাধুর্যের আস্বাদ এ জীবনে কখনও

পেয়েছি কি? আর এত মধুরই বা মনে হচ্ছে কেন এই সামান্য ব্যাপারটা! আমাকে এমনভাবে খাইয়ে ও-ই বা কীসের তৃপ্তি পাচ্ছে?

তৃপ্তি যে পাচ্ছে, সে তো মুখখানা দেখেই বোঝা যায়। যেন ছোট ছেলেকে হাতে করে খাওয়াচ্ছে স্নেহময়ী কেউ।

কিন্তু আমি কি ছোট ছেলে?

নই। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য মনে হল যেন ছোটই হয়ে গেছি, ফিরে গেছি শৈশবে। মাকে হারিয়েছি ছেলেবেলায়, আবছা মনে পড়ে মায়ের মুখ। মা সেই ছেলেবেলায় ডেকে কাছে বসিয়ে নিজের হাতে করে খাইয়ে দিত। ঠিক এমনটিই ছিল না কি সেই খাওয়ানোর ভঙ্গি?

বললে,—ভাবছো কী অত?

—না, কিছু না।

তারপরের অধ্যায়ে এসে শুয়ে শুয়ে বলতে লাগলাম,—এত সব খুশি করার মন্ত্র তুমি শিখলে কেমন করে?

কপট গাম্ভীর্যে বললে,—ঐ বললাম, তোমাদের মনোরঞ্জন করবার জন্য।

বললাম,—কই, অন্য মেয়েদের মধ্যে তো ঠিক এমনটি দেখলাম না।

বললে,—তা আমার হয়তো শিখে নেবার ক্ষমতাটা বেশি।

—তাই কি?

হেসে ফেললো, বললে,—এসব জিনিস মেয়েরা আপনা-আপনি শেখে। তবে শেখাই তো সব কিছু নয়, চর্চা করতে হয়। আমার মা কী বলে জানো? মা বলে, স্ত্রী-ভাবের আরাধনা করতে হয়। 'স্ত্রী' হয়ে জন্মালেই হয় না, স্ত্রী-ভাবের পরিস্ফুটনও হওয়া চাই।

—কী বোঝো তোমরা স্ত্রী-ভাব বলতে?

—এই যাকে বলে—সেবা, স্নেহ, প্রীতি, ক্ষমা, দয়া, উদারতা আর ভালবাসা। মা বলে—এসব গুণের আবার চর্চা করতেও হয়। কিন্তু কাকে আমরা করবো সেবা? কে চাইছে আমাদের কাছে সেবা, স্নেহ, প্রীতি, ক্ষমা, দয়া আর উদারতা? অথচ এইসব বৃত্তিকে আশ্রয় করেই গ'ড়ে ওঠে স্ত্রী-ভাব। মা বলেন, এই স্ত্রী-ভাবের আবার পরিণতি হচ্ছে আত্ম-বিলোপে।

—সে আবার কী?

—যা হয়েছিল কৃষ্ণের জন্য গোপিকাদের। পুরুষোত্তম ছাড়া তারা আর

কিছু জানতো না। তাঁর মধ্যেই বিলীন ক'রে দিয়েছিল তারা আপন গুণ, আপন প্রীতি, আপন লজ্জাও। মনের সে এক অতি উন্নত অবস্থা অবশ্য। কিন্তু যাক এসব কথা।

আমার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বললে,—ভাল ছিলে এ কয়দিন ?

—ছিলাম।

—মনে তো হচ্ছে না ?

—কেন ?

—চোখের ভাবে অদ্ভুত একটা চাঞ্চল্য ! কোথায় গেল সেই প্রশান্তি ?

প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপে কেটে যাবার পর বললাম,—আমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি কেমন ছিলে বলো ?

—আমাদের আবার থাকাথাকি কী ?

আমার বাহু-উপাধানে সেদিনের মতো মাথা রেখে শুয়ে পড়লো, বললে,—দেশে ফিরে গিয়ে বিয়ে-থা করো, বুঝলে ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে অন্য প্রশ্ন তুললাম,—আচ্ছা, তোমরা কী বিবাহিত ?

—হ্যাঁ। গলায় এই যে মঙ্গলসূত্রম্ রয়েছে !

—আচ্ছা, তোমরা কি দেবদাসী ? মানে, দেবতার সঙ্গে কি তোমাদের বিয়ে হয়েছে ?

উত্তরে ধীরে ধীরে বলতে লাগলো,—দেবদাসী-প্রথা আইন ক'রে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবু আমরা আছি। সংস্কার কি মানুষের মন থেকে সহজে যায় ? শ্রীকৃষ্ণের ওই বড় মন্দিরের ঘনিষ্ঠ সংস্রব আমরা ছেড়েছি, তবে নিজেদের মন্দির গড়ে নিয়েছি আমরা, যা শুধু মাত্র আমাদেরই।

—কোথায় সেটা ?

—আমাদের বাগানে। পুরুষোত্তমের মন্দির। তিনিই আমাদের স্বামী। নানান লক্ষণ দেখে আমাদের নিয়ে আসা হয় নানান গাঁ থেকে বেছে বেছে। অর্থের বিনিময়ে গরীব বাবা-মা রাজীও হয়। অনেক সময় মানত করেও দেবতার সঙ্গে দেওয়া হয় বিয়ে। অবশ্য এসব আজকাল হয় খুব গোপনে, লুকিয়ে-চুরিয়ে। তা হলে দেখতে পাচ্ছো, আমরা দেবদাসী বটে, আবার না-ও বটে। আমরা 'দেববধূ' বলতে পারো।

—কিন্তু এ তোমাদের কী জীবন ?

—সেটা ভাগ্য।

বললাম,—আচ্ছা, বিয়ে করে সংসারী হতে সাধ যায় না ?

একটু হেসে বললে,—কবার বিয়ে করবো ? এই যা নিয়ে আছি, এ-ও কি বিরাট সংসার নয় ?

—আর একটা কথা বলবো ?

—বলো ?

—কেমন করে সহ্য করো এত লোককে ?

—মানে ?—আমার প্রশ্নের তাৎপর্য ভাল ক'রে বুঝবার চেষ্টা করলো, কিছুক্ষণ থেমে থেকে কী যেন ভাবলো, তারপর মৃদু গলায় প্রায় ফিসফিস ক'রে বললে,—যদি বলি ভুল কথা বলছো।

—ভুল ?

—হ্যাঁ, এত লোক কোথায় দেখছো ? যদি বলি, একই লোক এক এক রাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধ'রে আমাদের কাছে আসে ?

একটু অবাক হয়েই বললাম,—এই তোমাদের বিশ্বাস নাকি ?

—হ্যাঁ। বিশ্বাসও বটে, শিক্ষাও বটে।

—মানো ?

—মানতে পারলে জীবনের পথে সহজ হওয়া যায়। না মানলেই দুঃখ। তা অনর্থক দুঃখ সইতে যাই কেন ?

চুপ করে রইলাম অনেকক্ষণ। ও ধীরে ধীরে 'লতাবেষ্টিতক' ভঙ্গিতে আমাকে এক সময়ে টেনে নিলো নিজের কাছে, মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ, তারপর ফিসফিস করে অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল,—যতদিন যাবে, জগৎ এক নূতন দৃষ্টিতে ধরা দেবে তোমার কাছে।

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ও এক আশ্চর্য কণ্ঠে বলে চলেছে,—তোমার তখন কী মনে হবে জানো ? মনে হবে, এ জগতের সব মানুষই ভালো, সব মানুষই পবিত্র। স্ত্রী-পুরুষে কোন ভেদাভেদ নেই, একই আত্মা পুরুষ আর স্ত্রী-শরীর ধারণ করে পুরুষ ও স্ত্রীভাবে বিভোর হয়ে আছেন। কবির দৃষ্টি বলে একেই, একেই বলে দিব্যদৃষ্টি।

বাধা দিই নি, চুপচাপ ওরই চিন্তাধারাকে মনে মনে অনুধাবন করবার চেষ্টা করছিলাম। ওদের ভাষাতেই ও কথা বলছিল, আর সে ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারই ছিল বেশি। বরাবরই দেখেছি, ও বলার ভঙ্গিতে ভাষার একটা সৌষ্ঠব প্রকাশ পেতো। এইসব 'আত্মা', 'পুরুষ', 'দিব্যদৃষ্টি' ইত্যাদি ওরই ব্যবহৃত শব্দসম্ভার।

বললে,—কী, কথা কইছো না যে ?

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম,—বলবে একটা সত্যি কথা ?

—কী ?

—তোমার আসল নামটা কী ?

বললে,—বলা পাপ। তবু তোমাকে বলবো। তোমার জন্য সমস্ত পুণ্যই জলাঞ্জলি দিয়েছি।

সেদিন মনে হয়েছিল, এটা বুঝি কথার কথা। কিন্তু পরে জেনেছিলাম, এ-কথার গুরুত্ব ওর কাছে কতখানি হতে পারে !

বললে,—আমার আসল নাম ভামতী।

ভামতী ? নামটা যেন ইতিমধ্যে কোথায় শুনেছি শুনেছি বলে মনে হচ্ছে !

ভাবতে-ভাবতে মনে হল, প্রথম দিনেই কানে গিয়েছিল এই নাম। সেই নটরাজন লোকটি ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করেছিল,—কেমন আছে ভামতী ?

নারায়ণরা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল,—চুপ চুপ।

বলে উঠলাম,—নটরাজন বলে কাউকে চেনো ?

মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো, বললে,—বা রে, ও যে আমাদের গান শেখায়, নাচ শেখায়। মাঝখানে কিছুদিন ছিল না, আবার এসেছে।

—গুরু বুঝি নাচের ?

—তা বলতে পারো, তবে গুরু বলে মানি না ওকে।

—কেন ?

—এমনি।

কথা বলতে বলতে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসে।

একসময় বলে উঠি,—কাল কী করবো ? আসবো কী ক'রে এ-ঘরে ?

—যেমন করে আজ এসেছো।

উৎসাহিত হয়ে বলে ফেললাম,—আবার সেই বৃদ্ধ বেলগাছের পায়েবসে সাধনা ?

—ঠিক তাই।

—বেশ, তাই হবে।

পরদিন বৃদ্ধ বৃক্ষের পায়ে পেলাম একটি পদ্মফুল। সন্ধ্যাবেলা গিয়ে 'পদ্ম'র নাম করতেই ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে গেল নারায়ণের। কিন্তু মুহূর্তমাত্র, তার পরেই তেমনি স্মিতহাস্যে ভরে গেল তার মুখ, বললে,—যান বাবুজী। ভিতরে গেলেই পদ্ম খুঁজে পাবেন।

বিপুল কেশরাশি আজ বেণীর শাসন থেকে মুক্ত করে এলো খাওয়া-দাওয়ার পর। বললে,—খুব কাছে এসো, ভাল করে মুখখানা দেখে রাখি।

—কেন ?

কেমন যেন কান্নাভরা কণ্ঠস্বরে বললে,—ভয় হয়, তোমাকে হারিয়ে ফেলবো।

বলতে বলতে দু চোখ ভরে এলো জলে, বললে,—আমার শাস্তি নেমে আসছে। আমি যে পাপ করেছি !

—কী পাপ ?

বললে,—তোমাকে যে গোপনে জানিয়ে দিয়েছি ফুলের নাম।

—দিয়েছ তো হয়েছে কী তাতে ?

—না গো, নবগ্রহ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা, এর ফল ভাল হবে না।

অবিশ্বাসীর সুরে বলে উঠলাম,—হ্যাঁ, হবে না ওঁকে বলেছে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল।

বললাম,—এই দেখ, এ কী করছ, ভামতী ?

শিউরে উঠে বললে,—নামটাও বলে দিয়েছি তোমাকে।

—কেঁদো না, কাঁদে না, ছিঃ !

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ভারী গলায় ডেকে উঠল,—কবি !

ওর ডাকে বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুমরে উঠল, গাঢ়কণ্ঠে বললাম,—কবি শব্দটার অর্থ তো তুমিই বুঝিয়ে দিয়েছ, যদি পারি তো সত্যি সত্যিই তোমার 'কবি' হয়ে উঠবো।

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো চোখের জ্যোতি, বললে,—একটা জিনিস তোমায় দিতে চাই, নেবে ?

—কী ?

উঠে বাক্স খুলে কী একটা নিয়ে এলো যেন। কাছে আসতেই বুঝলাম একটা আংটি। সেটি নিজের হাতে আমার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে বললে,—পোখরাজমণি, কখনও খুলো না যেন ? সব সময়ে পরে থেকো।

—কী হয় পরলে ?

একটু হাসলো, স্নেহস্নিগ্ধ অপূর্ব সে হাসি, বললে,—কী আবার হয় ? আমায় মনে পড়বে।

ওকে দুহাতে টেনে নিলাম বুকের মধ্যে,—যাবে কোথায় তুমি ?

—কোথাও না। এখানেই।

—তবে ? হারাবই বা কেন তোমাকে ?

বললে,—পাগলামি ক'রো না। তুমি চলে যাও।

একটু থেমে, ওর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়মথিত কণ্ঠে বলে উঠলাম,—চলে যাবো !

আবার কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল ওর কণ্ঠস্বর, বললে,—না, আর তুমি এসো না এখানে।

—আসবো না ! কেন ?

জলভরা চোখ দুটি মেলে আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নিষ্পলক, তারপরে বললে,—এমন করে মায়ায় জড়িয়ো না তুমি।

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে এনে বললাম,—মায়ায় কী সত্যিই জড়িয়েছি ?

—জড়াও নি !

—কে জানে !

বললে,—আমি জানি। আমি সব বুঝতে পেরেছি তোমার। তুমি নিজেকে যতটা বুঝেছ, তার থেকেও বেশি বুঝেছি আমি তোমাকে। তুমি মুক্তপুরুষ হও।

—আর তুমি ?

—আমি ?—হু-হু করে কান্নায় ভেঙে পড়লো আবার, বললে,—তুমি তো জানো, আমি কী ! তুমি চলে যাবে, আবার অন্যদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলব, হয়তো গানও গাইবো, নাচবোও।

অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলে উঠলাম,—তুমি নাচতে পারো, না ?

—হ্যাঁ, শেখায় যে নটরাজন আমাদের।—চোখ মুছে নিজেকে সামলে নিতে নিতে বললে,—জানো, কেউ এলে নাচ দেখানোটা আমি পছন্দ করি।

বললাম,—আমাকে তো দেখালে না একদিনও।

বড় ম্লান, বড় অদ্ভুত সে হাসি। বললে,—না। তোমাকে দেখিয়ে সময় নষ্ট করবো কেন ?

—সময় নষ্ট কেন ?

কান্না আর হাসি যেন দুই-ই মিশিয়ে আছে ! বললে,—নাচের শেষে পথিক যে ফিরে যাবে, সারারাত আর বিরক্ত করবে না।

একটু অবাক হয়েই বললাম,—তাই নিয়ম বুঝি !

—হ্যাঁ। শাস্ত্রকার বলেছেন জানো না ? নৃত্যশ্রমক্লান্তা স্ত্রী-শরীরকে আর ছুঁতে নেই।

—তাই নাকি!

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে লঘুকণ্ঠে বলে উঠলাম,—কিন্তু বাক্যশ্রমক্লান্তাকে নিয়ে এখন আমি কী করি?

—ছুঁয়ো না।

ভোরের দিকে চলে যাবার সময় বললাম,—কাল কী করবো?

—এসো না। কাল আমার ছুটি। বিরাম।

—তা-ও পাও বুঝি?

একটু হেসে বললে,—তা পাই বই কি।

বললাম,—বেশ। পরশু?

—পরশু? একটু ভেবে বললে,—আবার সেই বৃদ্ধ বৃক্ষের পদসেবা ক'রো।

—সুফল মিললে তাতে আর দ্বিধা কী?

হেসে উঠলো, বললে,—সুফল মিলবে গো মিলবে।

নারায়ণ ততক্ষণে দেববিগ্রহগুলির পায়ের কাছে ধূপবর্তিকা জ্বালিয়ে দিয়ে আসনে বসেছে, সেই বিশ্বনাথম্ ছেলেটির বই ইতস্তত ছড়ানো, হয়তো বাইরে গেছে, এখুনি ফিরে আসবে।

যথারীতি বললে,—চললেন বাবুজী?

—হ্যাঁ। বইগুলি কিসের? বিশ্বনাথমের বুঝি?

আসন ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো নারায়ণ, বললে,—হ্যাঁ। ছেলেটি আমাদের এজেণ্টের কাজ করে তো। সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রাইভেটে কলেজের পড়াও তৈরি করছে।

সেই পুরু-কাচের-চশমা-চোখে পাজামার ওপরে হাতগোটানো শার্ট পরা রোগা কালো ছেলেটির মুখ মনে পড়লো একবার। নারায়ণ বললে,—বাবুজী কেমন লাগলো আমাদের?

—খুব ভালো।

—না বাবুজী,—সে বললে,—ভালো থাকা আর গেল না। সব বুঝি ভেঙে-চুরে যাবে।

—কেন?

—বসুন না বাবুজী, সব বলছি আপনাকে। চা খাবেন? দাঁড়ান চা আনিয়ে দিচ্ছি।

বসে পড়ে বললাম,—ব্যস্ত হবেন না।

বললে,—ঘনশ্যামদাসজীর ছেলে আসছে, তাই তাঁর স্ত্রীকে তিনি কিছুদিন এখানে রাখতে চান। কিন্তু আমরা কী করে রাখি বলুন তো?

—তা তো বটেই। আর তা ছাড়া, আপনাদের এখানে রাখার উদ্দেশ্য কী?

নারায়ণ বললে,—উদ্দেশ্য একটা আছে। স্ত্রীকে উনি বোধ হয় ত্যাগই করতে চান।

—সে কী!

—হ্যাঁ বাবুজী। ওঁর এই স্ত্রী ছিল যে এখানকারই মেয়ে।

—বলেন কী?

ম্লান একটু হাসলো নারায়ণ, বললে,—ঘনশ্যামদাসজী ছিলেন আপনারই মতো এক আগন্তুক, আপনারই মতো রোজ আসতেন, ফুলের নাম বলতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটি মেয়ের মায়ায় এমন করে জড়িয়ে পড়লেন যে বলবার নয়। আমাদের সাবধানতা সত্ত্বেও ফুলের নাম গোপনে জানাজানি হতে লাগলো, ঘনশ্যামদাসজী ক্রমাগত বাঁধনে জড়াতে লাগলেন। আর তার পরিণতি কী জানেন? জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে কাছে রাখা। অর্থাৎ এক রকম বিবাহই বলতে পারেন।

বললাম,—এ-রকমটা হতে পারে তা হলে?

তেমনি ম্লান হাসিই ওর মুখে, বললে,—হ্যাঁ, তা হয়ে গেল। সরোজাকে ধরে রাখা গেল না?

—সরোজা?

—ঘনশ্যামদাসজীর স্ত্রীর নাম।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর বললাম,—আপনারা নিশ্চয়ই বাধা দিয়েছিলেন এতে?

—কাকে বাধা দেবো?—নারায়ণ বললে,—এই যে ঘরবাড়ি, এই যে জমি আর বাগান, এ সবই তো ঘনশ্যামদাসজীর। তাঁরই টাকায় চলছে এ প্রতিষ্ঠান।

—সে কী!

—হ্যাঁ, বাবুজী।

বললাম,—কিন্তু কেমন করে হলো এটা?

—টাকায় কী না হয় বাবুজী! নারায়ণ বললে,—কিন্তু সে অনেক কথা। সে সব শুনতে কি ভাল লাগবে আপনার?

—কেন লাগবে না! আপনি বলুন।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল নারায়ণ, তারপরে বললে,—এই ঘর বাড়ি আর বাগান, এ ছিল আমারই এক কাকার সম্পত্তি। কাকা ব্যবসায়ী লোক, আমার কাছ থেকে যথেষ্ট বাধা পাওয়া সত্ত্বেও মোটা লাভের লোভে ঘনশ্যামজীকে বিক্রি করে দিলেন। কিন্তু এ হলো গিয়ে বাইরের ঘটনা, ভিতরে-ভিতরে যা ঘটেছিল, সে অন্য কাহিনী।

আবার চুপ হয়ে গেল নারায়ণ, সুগোপন কোন এক বেদনার তারে যেন বেজে উঠেছে অশ্রুত এক রাগিণী, তার আলাপন শোনাতে গিয়েও যেন শোনাতে পারছে না সে।

পর-মুহূর্তে হঠাৎই চমক ভেঙে উঠে দাঁড়ালো নারায়ণ, বললে,—এই যা, আপনাকে চা এনে দেওয়া হলো না! দাঁড়ান, এনে দিচ্ছি।

—না না, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

—তা কি হয়! নারায়ণ ভিতরের দিকে দরজাটা খুলতে খুলতে বললে,—মেয়েদের মধ্যে কেউ চা করেছে কি না দেখছি। এক মিনিট।

দ্রুত অপসৃত হলো সে ভিতর-মহলে। মনে হলো, আসবার সময় সমস্ত দরজাই তো দেখে এসেছি বন্ধ। এত ভোরে কে উঠেছে এক ভামতী ছাড়া?

পরক্ষণেই ফিরে এলো নারায়ণ, দরজাটা ভাল করে ভেজিয়ে দিতে দিতে বললে, - আসছে চা।

মুখে কেমন যেন মিটি মিটি হাসি। যদি সত্যি সত্যি সে-ই চা নিয়ে আসে ঘরে?

কিন্তু ও-রকম হাসি কেন নারায়ণের মুখে? সে কী মনে মনে সব-কিছুই বুঝতে পেরেছে?

নিজের আসনে ধীরে-সুস্থে এসে বসলো নারায়ণ, মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে ততক্ষণে, আবার ম্লান স্তিমিত মনে হতে লাগলো ওর মুখের ভাব, বললে,—তখন আমার জোয়ান বয়স, বাবুজী। কাকা ছিলেন নিঃসন্তান, আমাকে ভালবাসতেন ছেলের মতো। কাকার তখন এক গদি ছিল এখানে, সেই গদিতেই বসতাম, পয়সার অভাব ছিল না, বন্ধুবান্ধবও জুটেছিল প্রচুর, ফলে যা হয়। তখন এসব অঞ্চলের চেহারা ছিল বীভৎস, হৈ-হল্লা-মারামারি-মাতলামি লেগেই ছিল, খুন-জখমও হতো দুটো একটা। সবান্ধবে রাত্রের অভিসারে আমিও আসতাম বাবুজী হৈ-হল্লা আমিও করেছি কতো। মারামারিও করেছি। এক কথায়, সে আমার এক অমানুষিকতার যুগ গেছে বলা যায়। ক্রমে ক্রমে কাকার কানে উঠল সব।

আমাকে শাসন করার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। কারও ওপর যে কোনও আকর্ষণ ছিল তা নয়, কেমন যেন একটা অদ্ভুত খেয়াল। প্রাচীনেরা 'বয়সের দোষ' বলে যে একটা কথা বলে থাকেন, এ বোধ হয় ছিল তা-ই।

এই পর্যন্ত বলেছে নারায়ণ, ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে গেল ভিতরের দরজাটা, হাতে দু কাপ ধূমায়িত চা, ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো, আর কেউ নয় সত্যি সত্যিই ভামতী।

জরি-পাড় সাদা একটা শাড়ি জরি-হাতা সাদা ব্লাউজের ওপর আঁট করে পরা, আঁচলটা কোমরে জড়ানো। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আমাদের কাছে চায়ের কাপ ঠক করে রেখে এক মুহূর্তের জন্য সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বোধ হয় ইচ্ছা ছিল নারায়ণের সামনে মুখের ভাব কোনক্রমেই প্রকাশ করবে না, কিংবা তাকাবে না আমার দিকে চোখ তুলে। কিন্তু পারলো না শেষ পর্যন্ত। দুটি আয়ত চোখের তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি আমার উপর মুহূর্তকালের জন্য স্থাপিত করে, তারপর দ্রুতপায়ে চলে গেল ভিতরে।

সম্ভবত সব-কিছুই লক্ষ্য করেছিল নারায়ণ, মৃদু একটু হাসি যেন খেলে গেল তার ঠোঁটের উপর দিয়ে। বললে,—'দেহপ্রীতি' বলে একটা কথা আছে। ভাষান্তরে, এক ধরনের মোহও বলা যায়, নারীর প্রতি নরের সেই আদিম মোহ। কিন্তু যখন লোকে দেহ-বিলাসীদের উপর মন অর্পণ করে ফেলে, তখনই গড়ে ওঠে সংঘাত, গড়ে ওঠে নানান সমস্যা।

কী হলো মনের মধ্যে, হঠাৎ বলে ফেললাম,—ইঙ্গিতটা কি আমাকেই লক্ষ্য করে?

একটু যেন অপ্রতিভ হলো নারায়ণ, তারপরে একটু হেসে বললে,—না বাবুজী ঠিক আপনাকে লক্ষ্য করে নয়, আমি সবাইকেই এ কথা বলতে চাই। অবশ্য, কিছু মনে করবেন না বাবুজী, আমি আপনার বিষয়টাও ভেবে দেখেছি।

—কী ভেবেছেন?

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললে,—এখানে যারা আসে, হৈ-হল্লা করতে দেওয়া হয় না তাদের, তবে অল্প-বিস্তর একটু যে সবাই নেশা করে না আসে এমন নয়, সেটা বাধ্য হয়েই আমাদের অনুমতি দিতে হয়েছে। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে সে কথা খাটে না বলেই আপনার কথা বিশেষ করে ভাবতে হয়েছে।

হেসে বললাম,—কী রকম!

বললে,—আপনাকে আমার ভাল লেগেছে বাবুজী, তাই বন্ধু ভাবেই কথাগুলি

খোলাখুলি বলছি, অপরাধ নেবেন না যেন। যে-মেয়েটি এইমাত্র এসে চা দিয়ে গেল, একে আপনার ভাল লেগেছে বুঝতে পেরেছি ; কিন্তু একে পর পর কয়েকটা দিন আপনি পেলেন কী করে, সেটাই ভেবে পাচ্ছি না।

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে এনে বললাম,—আপনিই বলুন তো কী করে ?

বললে,—ভাগ্য। ভাগ্যের জোরে পেয়েছেন। নইলে, ও মেয়েকে আমি জানি, ফুলের নাম জানাজানি হওয়া ও মেয়ের কাছ থেকে সম্ভব নয়।

সত্যি কথা বলতে কী, নারায়ণের প্রশ্নের ধরন দেখে একটা আশঙ্কা ঘনিয়ে আসছিল মনে, এতক্ষণে বুকের ভিতর থেকে যেন পাষাণ-ভার নেমে গেল।

নারায়ণ বলে যেতে লাগলো—ধর্মভীরু মায়ের মেয়ে ও। নিজেও ধর্মভীরু অত্যন্ত। এই যে নবগ্রহ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা, এ খুব সাধারণ কথা নয়, এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে আজও প্রতিটি হিন্দুর বুক কাঁপবে, এসব ভাগ্যহত মেয়েদের তো সবার আগে।

বলে উঠলাম,—আমি মশাই ওসব মানি-টানি না।

বললে,—জানি। অর্থাৎ ভাবপ্রবণতা আপনার মধ্যে একটু কম। খাঁটি কর্মী মানুষ আপনি। সেই জন্যই আপনাকে নিয়ে আমার তত ভয় নেই।

একটু অবাক হয়েই মুখের দিকে তাকালাম ওর। বহুদর্শী লোক এই নারায়ণ। আমার সম্বন্ধে এ যা ধারণা করেছে, ভামতীর ধারণা থেকে তা একেবারে বিপরীত। বস্তুত, আমার নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণাও নারায়ণের মতো। ভাবপ্রবণতা আদৌ নেই আমার মধ্যে, একটি মেয়েকে নিয়ে কল্পনার জাল বোনা বা তাকে নিয়ে মত্ত হওয়া, এ চিন্তাটাই আমার কাছে হাস্যকর। কিন্তু ভামতী বললে, আমি ভাবপ্রবণ। আমি কবি। আমি সাত্ত্বিক প্রকৃতির।

কথাটা মনে করে হো-হো করে হেসে উঠতে ইচ্ছা হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে, নিজেকে খুব স্বচ্ছন্দ আর উল্লসিত মনে হতে লাগলো। নারায়ণের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভালো লেগে গেল লোকটিকে। ওর সান্নিধ্যে বসে ওর সঙ্গে কথা বলে, যেন নিজের স্ব-ভাবটাকে ফিরে পেলাম, ফিরে পেলাম স্বাভাবিক 'আমি'কে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিন্তা কাঁটার মতো মনে বিঁধতে লাগলো। তাকে ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে, তাকে ছাড়া অবসর-মুহূর্তে অন্য কাউকেও তো ভালো লাগলো না। এটাই বা কেন ?

পর-মুহূর্তে মনে হলো, নারায়নের অনুমানই ঠিক, ওকে আমার ভালো লেগেছে

মাত্র। একটি মানুষকে কি আর একটি মানুষের ভাল লাগে না। নিজের মনের মধ্যেই দুটি মন বিপরীত স্রোতে সেদিন প্রবাহিত হচ্ছিল। তার দেওয়া হাতের আংটিটির দিকে তাকিয়ে সেদিন এক মন ভাবছিল—সে আমার মোহ, নারায়ণের ভাষায় 'দেহপ্রীতি'। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবছিল অন্য মন—সত্যিই কি তাই? অন্য কিছু নয়?

এই চিন্তায় অবতরণ করেই নারায়ণের একটা কথা ধ্বক্ ক'রে জ্বলে উঠল মনে। সে বললে,—মেয়েটি অত্যন্ত ধর্মভীরু, নবগ্রহ ছুঁয়ে ফুলের নাম নেওয়া,—এ নাম সে কখনও জানাজানি হতে দিতে পারে না।

কিন্তু অবাকই হচ্ছিলাম মনে মনে, তা হলে সে সত্যিই জানাজানি হতে দিলো কী করে তার নাম? ক্ষ্যাপার মতো তাকে আমার খুঁজে ফেরা লক্ষ্য ক'রে? না, সত্যিকার ভালবাসারই টানে?

পরক্ষণেই সচেতন হয়ে যেন জেগে উঠে বসলাম। কী এসব ভাবছি বসে বসে! একটা মেয়েকে কেন্দ্র করেই অলস চিন্তার জাল বুনে চলেছি এতক্ষণ? ভাবালুতা আর কাকে বলে!

নারায়ণও আপন ভাবনার গভীরে আপনিই ডুবে ছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে এতক্ষণে কথা কয়ে উঠলো, বললে,—কাকা শেষ পর্যন্ত আমাকে সামলাতে না পেরে তাড়িয়েই দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। আমিও বেরিয়ে পড়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। কত জায়গায় যে ঘুরেছি, তার ইয়ত্তা নেই। অধিকাংশ ঘোরাই আমার হয়েছিল তীর্থকে কেন্দ্র করে। শেষ পর্যন্ত, সোমনাথ মন্দিরে বসে আমার যেন দিব্যদৃষ্টি ফিরে এলো। দিব্যদৃষ্টি বলা ভুল,—মনে হল, দেশে ফিরে যাই, কাজে লাগাই আমার অভিজ্ঞতা।—এলাম। সত্যিই একদিন অবশেষে দেশে ফিরে এলাম। বাবুজী, নানান দেশ ঘুরে এসে নানান লোক দেখে এটুকু বুঝেছি, 'প্রস্‌টিটিউশন'কে একেবারে উচ্ছেদ করা যাবে না, তবে শোভন একটা রূপ দেওয়া যেতে পারে অবশ্য। আমার সাধ আর সাধনা হচ্ছে এই শোভনতাকে নিয়ে। প্রাচীন যুগে, শুনেছি, এ ধরনের 'দেবীপল্লী' ছিল শিল্প, কাব্য ও সংস্কৃতির লীলা-ক্ষেত্র। এ যুগেই বা তা না গড়ে উঠবে কেন? 'মৃচ্ছকটিকে'র বসন্তসেনার মতো চারুদত্তকে বিয়ে করে সংসারী হওয়ার সাধ এদের অনেকেরই থাকে, কিন্তু সাধ আর সাধনা তো এক জিনিস নয়। তাই, সে জিনিস গড়ে ওঠে না, ক্রমশই ভেঙে পড়ে।

থেমে গেলো নারায়ণ।

বললাম,—তা হলে, এখানকার নিয়মকানুন সব আপনারই সৃষ্টি ?

নারায়ণ মুখখানা নিচু ক'রে একমুহূর্ত কী যেন ভাবলো, তারপরে মুখ তুললো, বললো,—না, ঠিক আমার সৃষ্টি নয়। এ সবই প্রাচীন নিয়ম, আমি নতুন ক'রে প্রচলিত করেছি মাত্র। কিন্তু যা-ই বলুন বাবুজী, এ নিয়ম চালু ক'রে ভালো ফলই পেয়েছি। কোনো হৈ-হল্লা, খুন-খারাপি, মাতলামি,—এ সব এ অঞ্চলে আর নেই। অনেকটা সুসংহত, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন। নয় কী ?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।

বললে,—কিন্তু এসেছিল সংঘাত। যেদিন এ সব বিষয় সম্পত্তি কিনে নেন ঘনশ্যামদাসজী, আমি চলেই যাবো ঠিক করেছিলাম। কিন্তু উনি যেতে দিলেন না। আর তাছাড়া, আমারও কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল এর ওপর। নিজেরই তো সৃষ্টি, নিজে কেমন করে ভেঙে-চুরে দিয়ে চলে যাই বলুন ? তাই রয়ে গেলাম।

বললাম, একটা কথা বলবো ?

—বলুন বাবুজী।

—এই ফুলের নাম রাখার নিয়মটা বোধ হয় না রাখলেই ভাল করতেন।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলো নারায়ণ,—আমি জানি বাবুজী, এ প্রশ্ন আপনি করবেন। বহু লোকেই করেছে। আপনাকে আগেও বলেছি, এসব মেয়েদের সঙ্গে নিবিড় করে নিজের মনকে জড়াতে নেই। এদের বিয়ে করে ঘরে তুলে জীবন কাটানো যায় না। এরা ঘরণী হবার জন্য নয়। শুনলেন তো আপনি, ঘনশ্যামবাবু যে সরোজাকে নিয়ে ঘর বাঁধলেন, তাকে কিছুদিনের জন্য আবার এখানে রাখতে চাইছেন। ছেলের সামনে তাকে বার করতে লজ্জা হলো। দেখবেন বাবুজী, আমি বলে রাখছি, সরোজাকে উনি শেষ পর্যন্ত ত্যাগই করবেন।

—তাই কি আপনার ধারণা ?

—হ্যাঁ। আপনি দেখে নেবেন। আমি স-ব বুঝতে পারি। এটাই হয় বাবুজী, এদের নিয়ে পুরুষের নেশা চিরকাল থাকে না।

তর্কের খাতিরে আমি এর উপযুক্ত উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম অবশ্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সরোজার প্রসঙ্গটা ওঠায় আমাকে বাধ্য হয়ে চুপ করে যেতে হলো। জাজ্বল্যমান এই উদাহরণ চোখের সামনে থাকতে এর বিপরীত প্রসঙ্গ কেমন করে তুলতে পারি আমি ?

আমরা কথা বলছি, এরই মধ্যে একটা হিন্দী গানের তানমালা বিস্তার করতে

করতে সেই প্রথম দিনটির মতোই ঘরে এসে ঢুকলো নটরাজন,—'চল মন, গঙ্গা-যমুনাকে তীর!'

নারায়ণ বলে উঠলো,—এসো নটরাজন, এসো, খবর কী ওখানকার?

নটরাজনের মুখখানা বিরস হয়ে উঠলো, বললে,—খবর ভালো নয় নারায়ণ, ডাক্তার একরকম জবাবই দিয়ে গেল।

—সে কী!

—হ্যাঁ। একে বৃদ্ধ বয়স, তার উপরে খুব খারাপ ধরনের নিউমোনিয়া, বুকে 'প্যাচ'ও হয়েছে, অর্থাৎ প্লুরিসির আক্রমণ বলতে পারো।

—এখন কেমন?

আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে। বোধ হয় শেষ অবস্থা। তুমি এক কাজ করো। ওর মেয়েকে এইবার ওর কাছে পাঠিয়ে দাও।

—ভামতীকে?

নামটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিদারুণ চমকে কেঁপে উঠলো বুকের ভিতরটা। মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল,—ভামতী!

ওরা দুজনেই ফিরে তাকালো আমার দিকে।

এক মুহূর্তের বিরতি। নারায়ণ বললে,—হ্যাঁ বাবুজী, ভামতীর মায়ের কথাই আমরা বলাবলি করছি, সরস্বতী আম্মা। কিন্তু, আপনি কী করে জানলেন এ নাম? চেনেন মেয়েটিকে? আসল নাম ধ'রে কোনও মেয়েকে তো আপনার জানবার কথা নয়!

ভয়ানক অপ্রতিভ হয়ে গেলাম মুহূর্তের মধ্যে, কী বলা উচিত কী করা উচিত স্থির না করতে পেরে অবশেষে বলে উঠলাম,—মানে, যে মেয়েটি চা দিয়ে গেল, ওকে যেন একবার ভিতরে মনে হলো ডেকে উঠেছিলেন ওই নাম ধ'রে!

ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত করে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে, সেই মুহূর্তে বিশেষ আর কথা না বাড়িয়ে শুধু বললো,—তা হবে। কিন্তু খুব সজাগ কান তো আপনার।

তারপরেই আর দ্বিধা দ্বিরুক্তি না করে চট ক'রে ভিতরে চলে গেল নারায়ণ। চুপচাপ কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত।

নটরাজন আমার দিকে তাকিয়েছিল, তারপরে ধপ করে বসে পড়ল খাটের উপর, কপালে হাত দিয়ে নীরব নিস্পন্দ বসে রইল সে।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলো নারায়ণ। তার পিছনে পিছনে এলো ভামতী।

আমার কাছে একটু দাঁড়ালো, একবার ব্যথাতুর তুটি চোখ মেলে তাকালো আমার দিকে, ঠোঁট তুটি কেঁপেও উঠলো, তারপরে দ্রুত পায়ে চলে গেল বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে।

নারায়ণ নির্বাপিত-প্রায় ধূপকাঠিগুলিকে সরিয়ে ধূপদানিতে নূতন ধূপ সাজাতে লাগল এক মনে, সেই দিকে তাকিয়ে, তারপরে আমার দিকে তাকালো নটরাজন, নারায়ণকে উদ্দেশ ক'রেই বলে উঠলো,—ইনিই সেই বাঙালী বাবুটি, না ?

—হ্যাঁ।

সস্মিত মুখে নটরাজন বললে,—নমস্কার মশায়। অনেক শুনেছি আপনার নাম।

—কার কাছে ?

—এই আমাদেরই মধ্যে আলোচনা হয় তো, তাই।

পরে নারায়ণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে,—ও কোথায় গেল ? আমাদের বিশ্বনাথম্ ?

—ঘনশ্যামদাসজীর বাড়ি। এই এত ভোরেই ডেকে পাঠিয়েছে।

বলে উঠলাম,—আচ্ছা নারায়ণজী, উনি এ প্রতিষ্ঠান চালান কেন আজও ? সরোজাকে তো উনি পেয়েই গেছেন, আর এটা তারপরে চালিয়ে লাভ ? কী স্বার্থ ওঁর ?

—স্বার্থ !—বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো নারায়ণের মুখে, বললে,—আমাদের সবারই স্বার্থ রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি জুড়ে। আমার তো বটেই, এমন কি নটরাজনেরও। বিশ্বনাথমেরও।

তারপরে, একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলে,—ঘনশ্যামদাসজী হচ্ছেন ব্যবসায়ী লোক, ব্যবসার খাতিরে বহু লোককে ওঁর হাতে রাখতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি সেদিক থেকে ওঁর বিশেষ কাজে লাগে। যেমন করে আপনি সহজেই প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন এখানে। আর আমার স্বার্থ ? আমার স্বার্থ হচ্ছে, এই প্রতিষ্ঠানেরই মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে আবার পুনরাবিষ্কৃত করা। নটরাজনের স্বার্থ হচ্ছে অবশ্য অন্যরকম। এদের মধ্য থেকে সে বড়োদরের গায়িকা আর নৃত্যশিল্পী গড়ে তুলতে চায়। আর, বিশ্বনাথমের স্বার্থ ? তার গ্রাসাচ্ছাদন চলে এই প্রতিষ্ঠানের এজেন্সি-স্বরূপ তার যা আয় হয়, তা থেকে।

নটরাজন বলে উঠলো,—তাঞ্জোরের মেয়েরা এইভাবেই 'ভারতনাট্যম্'কে রক্ষা করেছিল। আমার কথা হচ্ছে, এরাই বা পারবে না কেন ? এখানকার এক-

একজনের এমন ছন্দোময় শরীর, এই ধরুন না কেন, যে মেয়েটির কথা হচ্ছিল, সেই ভামতী বলে একটি মেয়ে—

কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল নটরাজন, তারপরে কী মনে করে বলে উঠলো,—কিন্তু কী হলো নারায়ণ ? যাবে না সরস্বতী আম্মার কাছে ?

—হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। আমি বিশ্বনাথমের জন্য অপেক্ষা করছি।

—ও, হ্যাঁ, তাও তো বটে—নটরাজন বললে,—সরোজাকে নিয়ে কী একটা গোলমাল হয়েছে শুনলাম। ঘনশ্যামদাসজী তাকে আর কাছে রাখতে চান না, এইখানেই ফেরত পাঠিয়ে দিতে চান নাকি !

সরোজার কথায় গম্ভীর হয়ে নারায়ণ বললে,—সংঘাত-যে শেষে এভাবে একদিন নেমে আসবে, তা ভাবি নি। আমি স্থির জানি নটরাজন, এখানে এসে থাকবার ফন্দী ওর নিজের, নইলে ঠিক এ চিন্তা মাথায় আসতো না ঘনশ্যামদাসবাবুর।

একটু হাসলো নটরাজন, বললে,—কিন্তু কেন সরোজার এ চিন্তা ? ওর থাকবার জায়গার অভাব হবে ঘনশ্যামদাসজীর কল্যাণে, এ আমি বিশ্বাস করি না।

মুহূর্তে চোখ দুটি ধ্বক্ করে জ্বলে উঠলো নারায়ণের, বললে,—কিন্তু, আমিও নারায়ণ শর্মা। এখানকার বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায় আমার নামে। আমিও দেখবো আমার বিরুদ্ধে যায় কে এখানে !

নটরাজন বললে,—কেউ যাবে না। যেতে সাহসও করবে না। আমি এখানকার লোক নই, তামিলনাদের লোক, অথচ এখানে পড়ে আছি অদ্ভুত এক মায়ার শিকল পায়ে জড়িয়ে। বুঝলেন বাবুজী, বাইরে ঘুরতে বেরোই, আবার ফিরে-ফিরে ঠিক আসি এখানে। আলারিপ্পু', 'পদম্' এইসব শেখাই 'ভারতনাট্যমে'র, আমাদের জিনিস আমরা না বাঁচিয়ে রাখলে কে রাখবে ? কিন্তু দম চাই, স্বাস্থ্য চাই, পরিশ্রম করার শক্তি চাই, নইলে কী করে হবে ? এই নারাণ-ভাইয়ার কঠোর নিয়ম-নীতির জন্য তবু অনেক কাজ করা যাচ্ছে, নইলে সব ভেঙে-চুরে যাবে।

বাইরের দরজায় ঠিক এই সময় বেজে উঠলো একটা করাঘাত। নারায়ণ প্রশ্ন করলে,—কে ?

—আমি। বিশ্বনাথম।

মুহূর্তে ওদের ভঙ্গিমায় দেখা গেল নিদারুণ ঔৎসুক্য। নারায়ণ বললে,—দরজা খোলাই আছে। ভিতরে এসো।

কিন্তু ভেজানো কপাট ঠেলে প্রথমেই যে ঘরে এলো, সে বিশ্বনাথম্ নয়, একটি মেয়ে। হাতে একটা কাপড়ের পুঁটুলি। তার পিছনে-ছিল বিশ্বনাথম্, ছোট একটা চামড়ার স্যুটকেস হাতে।

যারা এ-বাড়িতে থাকে, তাদেরই বয়সী হবে এ-মেয়েটি, রূপের দিক থেকে নয়টি মেয়ের মধ্যেই মিশে যাবার যোগ্য। শুধু মিশে কেন, নজনের মধ্যে একজন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতো। এটা একনজর দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু, এই কি সরোজা, ঘনশ্যামদাসবাবুর স্ত্রী ?

বিশ্বনাথম্ হাতের স্যুটকেসটা মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে বললে,—ভীষণ ব্যাপার। ঘনশ্যামদাসবাবুর ছেলে রামদাসবাবু টেলিগ্রাম করেছে আসছে বলে, আবার ওদিকে ওঁর সেই ইঁদুর—বাচ্চু, সে মারা গেছে হঠাৎ। উনি তো পাগলের মতো হয়ে গেছেন।

সোনার ঘণ্টি-পরা বাচ্চু! সেই ঠুং ঠুং ঠুং ঠুং করতে করতে এগিয়ে এসে ঘনশ্যামজীর হাত থেকে হালুয়া খাওয়ার ছবিটি মুহূর্তে ভেসে উঠলো চোখের সামনে।

মেয়েটি ততক্ষণে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নারায়ণের দিকে। কেমন যেন বিব্রত বোধ করছে নারায়ণ সেই তীব্র তীক্ষ্ণ ঋজু দৃষ্টিপাতের সামনে। সে কোনক্রমে শুধু বলে উঠলো,—সরোজা ?

—হ্যাঁ। থাকতে এলাম আমার পুরানো জায়গায়।

—কিন্তু তা কী ক'রে হয়! তুমি হচ্ছো ঘনশ্যামদাসবাবুর—

গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো মেয়েটি,—উনি আমাকে জন্মের মত ত্যাগ করেছেন।

মনে হচ্ছিল, কেমন যেন দুর্বল হয়ে গেছে নারায়ণ ওর সামনে। বললে,—ও, আচ্ছা, বেশ।

আর কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করে দৃঢ় পদক্ষেপে ভিতরে চলে গেল মেয়েটি!

ধপ করে খাটের ওপর বসে পড়ে নারায়ণ বললে,—ও যে ভিতরে গেল, থাকবে কোন্ ঘরে ? তুমি এক কাজ করো বিশ্বনাথম্, সব থেকে ছোট মেয়েটার নাম যেন কী! ভারাহালু। তাকে তুমি রেখে এসো অন্য বাড়িতে। এখানে তো নজনের বেশী থাকবার নিয়ম নেই।

—ভারাহালু !

—হ্যাঁ, নারায়ণ বললে,—এতে এত আশ্চর্য হচ্ছো কেন বিশ্বনাথম্ ! শুধু রূপ নয়, গুণের কথাটাও ধরতে হবে। সেদিক থেকে ভারাহালুকে অন্যত্র রাখার অপরাধ হবে না আশা করি।

বলেই দু হাত জোড় করে দেওয়ালে আকীর্ণ দেবমূর্তির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে নারায়ণ বলে উঠলো,—যাও বিশ্বনাথম্, যা বললাম করো গিয়ে। সব জেনে শুনে দ্বিধা করা তোমার পক্ষে উচিত নয়।

—যাচ্ছি।

বিশ্বনাথম্ ভিতরে যেতেই উঠে দাঁড়ালো নটরাজন, বললে,—যাবে না ভাইয়া, সরস্বতী আম্মাকে দেখতে ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়, চলো।

বললাম,—যদি কিছু মনে না করেন, আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি ?

নটরাজন বলতে যাচ্ছিল,—হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন না—

বাধা দিয়ে বলে উঠলো নারায়ণ,—কেন বাবুজী, আপনি যেতে চান কেন ?

একটু হেসে বললাম,—এমনি। মানে—সব শুনে-টুনে খুব কৌতূহল হচ্ছে।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে নারায়ণ বললে,—অযথা কৌতূহল কি ভালো ? মন শান্ত করে বাড়ি যান বাবুজী। আপনি মানী লোক, আমাদের এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে আপনার মাথা না ঘামানোই ভাল।

একটু অপ্রস্তুতের মতোই বলে উঠলাম,—না না, অন্য কিছু নয়, মানে, যদি কোন উপকারে লাগতে পারি—

বাধা দিয়ে নারায়ণ তাড়াতাড়ি বললে,—ধন্যবাদ বাবুজী। সে রকম বুঝলে নিশ্চয়ই খবর দেবো। আজ আসুন। নমস্কার।

পথে আসতে আসতে নারায়ণের আচরণটা অনাবশ্যক রূঢ় মনে হচ্ছিল। আমি গেলে হয়তো ভাল হতো, হয়তো সে একটু ভরসা পেতো, হয়তো আমি নিজে কাছে থেকে উপযুক্ত শুশ্রূষা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারতাম।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, এতটা চিন্তা আমার পক্ষে না করলেও চলবে। সত্যিই তো, ওদের দুঃখ-কষ্ট-সমস্যার জন্য কতো লোক রয়েছে, নারায়ণ নিজে একাই একশো, আমি তার মধ্যে মিছিমিছি অনুপ্রবেশ করি কেন ?

এ-কথাটা মনে হতেই অনেকটা হালকা হয়ে গেল মনের ভার। সহজ স্বাভাবিক গতিতে পা ফেলতে ফেলতেই বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম।

কিন্তু, এ কী হয়েছে বাড়ির পরিবেশ! ঘনশ্যামদাসজীর কর্মচারীর দল এধারে ওধারে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দু-একজন ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে এদিক ওদিক। বাড়ির বাইরে কিছু জনতার ভিড়। তাদের সরিয়ে দিতে দিতে আমার দিকে চোখ পড়লো পান্থলুর। বললে,—এসেছেন বাবুজী! উনি যে আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। জানেন কী হয়েছে?

সংক্ষেপেই বললাম,—জানি পান্থলু।

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর পান্থলু আমার কাঁধের কাছে হাতটা রেখে আমাকে চুপিচুপি সরিয়ে নিয়ে এলো বারান্দার এক ধারে, তারপরে ফিসফিস করে নিম্নকণ্ঠে বললে,—দেখলেন সরোজাকে? এমন মেয়ে দেখি নি। উনি টাকাকড়ি দিতে চাইলেন, কিছুই সে নিলো না, মাথা উঁচু করে নিজের সামান্য টুকিটাকি জিনিস নিয়ে সোজা ঘর থেকে পথে নেমে পড়লো।

—তুমি কী চিনতে আগে থাকতে?

পান্থলু একটু আমতা-আমতা করে বললে,—না, তা ঠিক চিনতাম না, তবে পরিচয়টা সবই জানতাম। কিন্তু আসল কথাটা তা নয়।

—তবে?

—ঘনশ্যামদাসবাবু ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অন্য কারণে।

—কী? তাঁর ছেলে আসছে বলে তার করেছে সেইজন্যে?

একটু অবাক হয়েই আমার মুখের দিকে তাকাল পান্থলু, বললে,—অনেক খবরই দেখছি ওখান থেকে পেয়ে গেছেন বাবুজী। হ্যাঁ, ওঁর ছেলে রামদাসবাবু এসে পৌঁছচ্ছেন কাল সকালে। সেই জন্যই তো সরোজাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু, ব্যাপারটা এও নয়।

—তবে?—এক মুহূর্ত থেমে থেকে তারপরে পান্থলু কিছু বলবার আগেই বলে উঠলাম,—জানি। বাচ্চু মারা গেছে, সেই শোকটাই ওঁর বড্ড লেগেছে, তাই না?

—ঠিক তাই,—পান্থলু বললে,—সব ছাপিয়ে বাচ্চুকে হারানোর দুঃখটাই ওঁর কাছে মর্মান্তিক হয়েছে। বুড়ো একটা ইঁদুর মরে গেছে তাইতে এত শোক এ এক দেখবার জিনিস বাবুজী! চলুন না ওর ঘরে। নীচে গদিতেই বসে আছেন।

আপনাকে দেখলে, আপনার সঙ্গে কথা বলে হয়তো কিছু সান্ত্বনা পেতে পারেন।

বললাম,—বেশ, চল।

—আসুন বাবুজী।

লাল কাপড়ের ঝালর দেওয়া অতিকায় একটা তালপাখা হাতে নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একটা চাকর, ঘনশ্যামদাসবাবু গদির উপরে বসে আছেন, একটা গেঞ্জি মাত্র গায়ে, চোখের নিচে কালি, মুখখানা দেখাচ্ছে বিশীর্ণ পাণ্ডুর, মাথার চুল এলোমেলো, মূর্তিমান শোকেরই প্রতিচ্ছায়া বলা যায়।

আমাকে দেখামাত্রই ভগ্ন কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলে ঘনশ্যামদাসবাবু,—বাচ্চু নেই, বাবুজী, বাচ্চু নেই!

সবই শুনেছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা চোখে দেখে আমার একটু অদ্ভুতই লাগছিল। একটা ইঁদুরের জন্য মানুষ যে সত্যই এত শোকাকুল হতে পারে, এ আমার ধারণার অতীত ছিল।

অথচ উপস্থিত ক্ষেত্রে ছদ্ম গাম্ভীর্য ধারণ করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই, বললাম,—কোথায় বাচ্চু?

—দেরিতে এলেন বাবুজী, নইলে শেষ দেখাটা দেখতে পেতেন।

বলতে বলতে সত্যি-সত্যিই কেঁদে ফেললেন ঘনশ্যামদাসবাবু,—এই একটু আগে ওকে শ্মশানে নিয়ে গেল।

—শ্মশানে!

পান্থলু এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি বললে,—হ্যাঁ বাবুজী। বহু লোক সঙ্গে গেছে। সানাই টানাই বাজিয়ে—রীতিমতো শোভাযাত্রা। আমিও যেতাম, কিন্তু আমার হাতে একটা কবচ আছে, শ্মশানে যাওয়া মানা।

উত্তরোত্তর আমার অবাক হবার পালা। নিম্নকণ্ঠে পান্থলুকে বললাম,—ঘনশ্যামদাসজী গেলেন না কেন?

পান্থলু বললে,—শেঠজীকে আমরাই যেতে দিলাম না।

কথাটা বোধ হয় শুনতে পেয়েছিলেন ঘনশ্যামদাসজী, বললেন,—না বাবুজী, গেলাম না, ওরা ওকে পোড়াবে, এ দৃশ্য আমি চোখে দেখতে পারব না।

ওঁর আকুলতা আর শোকদুঃখ অনুভব করতে করতে আমার হঠাৎ অন্য একটা কথা মনের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের মত ঝিলিক দিয়ে উঠলো। মনে হলো যিনি এই বিচিত্র বিশ্ব আর মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষের মনোরাজ্যেও তাঁর কি

বৈচিত্র্যের লীলা! এই যে বাচ্চুর জন্য শেঠজীর এত কান্না, এ হয়তো নিছক বাচ্চু নামক ইঁদুরটির জন্য একেবারেই নয়, যার নাম ওঁর মুখে একবারও উচ্চারিত হচ্ছে না, সেই সরোজাকে হারানোর তীব্র বেদনারই এ হয়তো এক বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ, কে বলতে পারে!

চিন্তাটা জাগবার সঙ্গে সঙ্গে, যত না সমবেদনায় মথিত হতে লাগল মন, তার থেকেও আশ্চর্য হয়ে গেলাম নিজেই নিজের চিন্তাধারাকে অনুধাবন করে। শেঠজীর মনের ব্যথা বুঝতে গিয়ে, যিনি মন-জীবন-বিশ্বজগতের স্রষ্টা, তার কথা এমন করে হঠাৎই আমার মধ্যে জেগে উঠলো কেমন করে! এ ভাবে কখনও তো চিন্তা করি নি আগে? মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে খনিজ পাথর বার করে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈচিত্র্য নিয়েই ছিল আমার নিজস্ব চিন্তার জগৎ, তার মধ্যে কী-ভাবে এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্পর্শ এসে পড়ছে আজ বারংবার!

—তুমি কবি।

একটি মেয়ের মুখের কথা মানুষের মনকে এমন করে নাড়া দিতে পারে, নিজের কাছে এও যেমন এক আবিষ্কার, আর, এখন, এই মুহূর্তে, শেঠজীর মনোরাজ্যের এক বিশেষ পরিচিতির কথা, আমার মনের দিগন্তে অভাবিতরূপে ভেসে ওঠা, এ আবিষ্কারও কম মূল্যবান নয়।

এরই প্রচ্ছন্ন আনন্দে বিভোর হয়ে ওঁর একেবারে পাশে গিয়ে বসলাম আমি। বললাম,—শেঠজী, একজনের চলে যাওয়াটা সহজ, কিন্তু সে যা দাগ রেখে চলে যায়, তা মুছে যাওয়াটা সহজ নয়।

একটু যেন অবাক হয়েই তাড়াতাড়ি আমার মুখের দিকে তাকালেন ঘনশ্যামদাসজী, তারপরে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকবার পর বললেন,—বাবুজী, বাচ্চু চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার স-ব চলে গেল।

এই 'স-ব' চলে যাওয়ার কথাটা উল্লেখ করে ঘনশ্যামদাসজী কী ইঙ্গিত করলেন কে জানে, আমি সরোজার কথাটা পান্নলু আর চাকরটা থাকায় বলি-বলি করেও বলতে পারলাম না। নইলে আমি যে সরোজার ব্যাপারটা সব জেনে গেছি, তা ওঁকে বুঝিয়ে দেবার এ-ই ছিল সুযোগ।

অন্য প্রসঙ্গই উত্থাপন করতে গেলাম। বললাম,—কী হয়েছিল?

শেঠজীর চোখ আবার এল ছলছল করে, বললেন,—ভোরে উঠে যেমন ওকে ডাকি, তেমনি ডাকছি, কিন্তু এলো না। ভিতরে গিয়ে দেখি, নর্দমার ধারে বাচ্চু

মরে পড়ে আছে, গলার কাছে প্রকাণ্ড ক্ষত, কোন বড় জন্তু ভাম-টাম হবে হয়তো, টুটি কামড়ে ওকে মেরে ফেলে থাকবে।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে। কিন্তু—

হ্যাঁ বাবুজী, এই 'কিন্তু'র কথাটাই ভাবছি। এত বছর ও আমার কাছে আছে, কোনদিন কিছু হলো না, আজ হঠাৎ ওকে মেরে ফেললো কেন ?

বললাম,—আচ্ছা শেঠজী, অন্য কিছু নয় তো ? মানে, ওর গলায় গয়না ছিল, তার লোভে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন,—জয় সীয়ারাম ! না না, সে সব নয়, ওই দেখুন, ওর গলার সেই সোনার ঘন্টিটা আমার সামনেই পড়ে আছে খবরের কাগজটার উপরে।

এতক্ষণে চোখে পড়া উচিত ছিল। ওঁর সামনেই খবরের কাগজের ভাঁজে জ্বলজ্বল করছে বাচ্চুর ঘন্টি। বললেন,—এটা ওরা খুলে রেখে গেছে। কিন্তু, আমি ওটা কী করে সিন্ধুকে তুলি বলুন তো বাবুজী ? পাস্থলু, এটা তুমি দান খয়রাতের কাজেই লাগিও।

—আচ্ছা, শেঠজী।

রামদাস এসে পড়ার আগেই এর গতি করতে হবে। সে হচ্ছে এ যুগের পড়ি লিখি আদমি, বাচ্চু যে আমার গণেশজীর বাহন এ কথা হয়তো সে বিশোয়াসই করবে না।

—তাই হবে, শেঠজী।

—নিয়ে যাও ওটা, এখুনি নিয়ে যাও।

পাস্থলু তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—না না, শেঠজী, সে আমি কেমন করে পারবো ! আপনি ছুঁতে পারছেন না, আমিও বা ছুঁই কী করে !

—কেন, তুমি ছোঁবে না কেন ?

আজ্ঞে, মৃত জীবের ধারণ করা বস্তু ব্রাহ্মণ হয়ে আমার কী ছোঁয়া উচিত ?

শেঠজী বললেন,—তাও তো বটে। কিন্তু ওটা যে বিক্রি করতে হবে বাচ্চুর শ্মশানবন্ধুদের মধ্যে সে টাকা ভাগ করে দিতে হবে।

সে ওরা এসে পড়ুক, ওরা নিজেরাই একটা ব্যবস্থা করে নেবে।

—বেশ। তাই হোক।

—আমি বরং বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, ওরা কেউ এলো কিনা।

—যাও। এ চাকরটাকেও নিয়ে যাও, পাখার বাতাসে আমার দরকার নেই। বাবুজীর সঙ্গে নিরিবিলি একটু কথা বলবো।

পাখাটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে রেখে চাকরটা চলে গেল, পান্থলুও গেল বাইরে।

শেঠজী বললেন,—আমার লক্ষ্মী চলে গেল বাবু, আমার এখানকার কাজকর্ম সব যাবে।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলে উঠলাম,—আচ্ছা, ঘনশ্যামদাসজী, আপনারা সবাই এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন কেন? একটা বুড়ো ইঁদুর মারা গেছে, তাতে হয়েছে কী?

যেন শিউরে উঠলেন আতঙ্কে, বললেন,—মামুলী ইঁদুর নয় বাবুজী, গণেশজীর বাহন।

বললাম,—ঘনশ্যামদাসজী!

—বলুন।

—শুধু কি বাচ্চুর জন্যই আপনার মনটা হু-হু করছে? আর কারুর জন্য না?

—না, বাবুজী, আর কারুর জন্য না। বাচ্চুর চেয়ে বড়ো আর আমার কাছে কেউ না।

বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেললেন তিনি। ওঁর কান্না আর অকপট উক্তিতে অবিশ্বাস করার কিছু নেই, আগে হলে এ উত্তরেই কৌতূহল আমার মিটে যেত, কিন্তু কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, ওঁর অবচেতন মনে বইছে অন্য এক হাহাকারের স্রোত। হয়তো সে-কথা ওঁর নিজেরও স্পষ্ট জানা নেই।

তুলতে পারতাম সরোজার কথা। কিন্তু মনে হলো, ঠিক সেই মুহূর্তটি এখনও আসে নি। উঠে দাঁড়ালাম, বললাম,—আজ্ঞা দিন, আমি ঘরে যাই শেঠজী। সেই সকাল থেকে—

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই,—তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন শেঠজী,—আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। বিশ্রাম করুন বাবুজী, কাল সকালে আমার ছেলে আসবে, তার আলাপ করবেন, আমার পড়ি-লিখি ছেলে, আপনার সঙ্গে মিলবে ভালো।

—অবশ্যই আলাপ করবো।

চলে এলাম উপরে, নিজের ঘরে।

তারপর কাটতে লাগল সময়, অফিসের জমানো কিছু কাগজপত্র দেখাশোনার কাজ সেরে স্নান খাওয়া দাওয়ার পর চুপচাপ শুয়ে রইলাম সারা দুপুরটা। ইতিমধ্যে 'বাচ্চু'র সৎকার শেষ করে ফিরে এলো শ্মশানবন্ধুরা, সে এক

রীতিমতো কোলাহল। আমি আর নীচে নামি নি। শ্মশানবন্ধুরা আবার একসময় চলে গেল, আবার চুপচাপ হয়ে গেল বাড়িটা।

বিকেল হয়ে আসছে, শুয়ে শুয়ে হাতের আঙুলটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভামতীর দেওয়া সোনার আংটিটাই দেখছিলাম। হরিদ্রাভ জ্বলজ্বলে প্রায় চৌকো একটা পাথর পড়ে আছে সোনার বেষ্টনীতে।

আংটিটা সামান্য একটু বড়ো হয়েছে আমার আঙুলে। নিঃসন্দেহে এটি পুরুষেরই হাতের আংটি,—এটা ও পেলোই বা কোথা থেকে? আর পাওয়া জিনিসই যদি, এমন করে আমাকে উপহার দিলোই বা কেন?

শুয়ে শুয়ে এই সব চিন্তা করতে করতে কখন যে একটু তন্দ্রাভাব এসেছিল কে জানে, চাকরটার ডাকে যখন জেগে উঠলাম, তাকিয়ে দেখি, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

উঠে বসলাম তাড়াতাড়ি। এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে রওনা হলাম নারায়ণের উদ্দেশ্যে। বেরোবার সময় শেঠজীর গদির দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য লক্ষ্য করেছিলাম, গদিতে তিনি নেই, একা পান্থলু বসে কী সব কাগজপত্র নিয়ে যেন লেখাপড়ায় ব্যস্ত, উপরতলাটা অন্ধকার। হয়তো সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে একা ঘরে চুপচাপ শুয়ে আছেন ঘনশ্যামদাসজী।

দরজা বন্ধ ছিল। টোকা দিতেই নারায়ণের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, —ভিতরে আসুন।

আমি প্রবেশ করতেই একটু অবাক হল সে, বললে,—বাবুজী আপনি! আমি ভেবেছিলাম, অন্য কেউ। আসুন, বসুন।

বসলাম গিয়ে কাছে। সেই নবগ্রহের মূর্তিসমন্বিত ঘরখানি, সেই ভিতরের দরজার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসা সঙ্গীতলহরী।

নারায়ণ একটু হেসে বললে,—এত যে কাণ্ড, নটরাজনের গানের কিন্তু বিরাম নেই। সে ঠিক ভিতরে গিয়ে তানপুরা নিয়ে বসেছে।

বলে উঠলাম,—কেমন আছেন সেই মহিলাটি?

—কে? ভামতীর মা? ভাল নয়।

—চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছু হলো?

—নিশ্চয়ই। আমি নিজে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছি। নতুন ডাক্তার আসছেন। তবে খুব ভরসা দিচ্ছেন না। শেষ বয়সে কতখানি যুদ্ধ করা সম্ভব?

ঠিক এই সময় দরজায় আর একবার টোকা বেজে উঠলো কার যেন। নারায়ণ একবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে তারপরে বলে উঠলো,—ভিতরে আসুন।

দরজা ঠেলে ঘরে এলেন স্থূলকায় এক ব্যক্তি, ধুতির ওপরে কমলালেবু রঙের হাফশার্ট গায়ে, বাঁ হাতের কব্জিতে মোটা নিকেলের ব্যাণ্ডে ঘেরা সোনালী রিস্টওয়াচ।

কথাবার্তায় বুঝলাম, অতিথিবর্গেরই একজন হবে। ফুলের নামের প্রশ্নে, অতি অদ্ভুত, লোকটি একটু ভেবে নাম উচ্চারণ করলো,—'চম্পা!'

কোন ভাবান্তরই দেখা গেল না নারায়ণের মুখে, কিন্তু কী জানি কেন, আমার বুকের মধ্যটা হঠাৎই ধ্বক্ ক'রে উঠলো। জানি, নাম বদলায়, তবু আমার প্রথম দিনের প্রথম উচ্চারিত নামটির সঙ্গে স্মৃতি এমন বিজড়িত হয়ে আছে যে, ঐ নাম মুহূর্তের মধ্যে চঞ্চল করে তুললো আমাকে।

লোকটি যথারীতি ভিতরে প্রস্থান করতেই আমি সাগ্রহে বলে উঠলাম,—নারায়ণ?

তার সেই খেরো-বাঁধানো খাতাটি খুলে, কী একটা নামের ওপর যেন লাল কালির রেখা টানছিল সে, মুখ তুলে বললে,—কী?

বললাম,—একটা কথা বলবো? সে তো আজ আসে নি এখানে?

একটু যেন অবাকই হলো নারায়ণ বললে,—কে?

তারপরেই একটু হেসে বলে উঠলো,—ও, বুঝেছি। না না, সে আজ আসবে কী ক'রে তার মাকে ছেড়ে? কিন্তু বাবুজী, আপনার কথাটা কী? বসে আছেন, ফুলের নাম করুন?

—ফুলের নাম?

ঠিক এই ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, এবং সত্যি কথা বলতে কী, সে সব কিছু মনে করেও আমি আসি নি। ওর কাছে ছুটে এসেছিলাম শুধু একটি সংবাদ জানতে। কেমন আছে তার মা?

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সে কথাটাই বা বলি কী করে ওকে? তার মা অসুস্থ, সেই ব্যাপারে আমারই বা অনর্থক মাথা-ব্যথা কেন?

ফুলের নাম জিজ্ঞাসা করা নারায়ণের পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় বা অযৌক্তিক হয় নি, বরং জিজ্ঞাসা করাই স্বাভাবিক। এবং আমার পক্ষেও স্বাভাবিক হবে, আগের মতোই কোন ফুলের নাম করা।

একটু ইতস্তত করেই বললাম,—ফুলের নাম! হ্যাঁ, তা করছি। এই নিন, আগে টাকাটা রাখুন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল নারায়ণ, বললে,—টাকা থাক্ বাবু, আগে কোনও ফুলের নাম করুন দেখি?

—কেন? আগে তো টাকা দেওয়াই নিয়ম!

—তা হোক, করুনই না?

একটুক্ষণ থেমে থেকে কোনো ফুলের নামই বলতে চেষ্টা করলাম। মনে হচ্ছিল, সত্যিই তো, এখানে যখন এসেছি, তখন ওসব মিথ্যা ভাবালুতায় কাজ কী? করি যে-কোনো একটা ফুলের নাম, করা যাক যে-কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ! কিন্তু, আশ্চর্য, ঠিক সেই মুহূর্তে চট করে কোন ফুলের নামই মনে পড়লো না।

—কী হলো? বলুন?

—বলছি। এই ধরুন—

বলতে বলতেও থেমে গেলাম, 'চম্পা' ছাড়া আর তো মনে পড়ছে না কোনও নাম! ঘুরে ফিরে 'চম্পা' নামটাই বা এত করে মনে জাগছে কেন!

একটু বাঁকা হেসে নারায়ণ বললে,—মনে আসছে না তো কোনও ফুলের নাম? থাক্ বাবুজী, মনে করে কাজও নেই।

বলেই খেরো বাঁধানো খাতাটা বন্ধ করে দিলো সে। বললে,—বিশ্বনাথম্‌কে একটা কাজে ভিতরে পাঠিয়েছিলাম। দাঁড়ান, ওকে ডেকে নিয়ে আসছি।

—কেন?

—ওকে আমার আসনে বসিয়ে আপনাকে নিয়ে একটু বেরুবো।

—কোথায়?

একটু থেমে তারপরে বললে,—বাবুজী, আমাকে একটা লোহার তৈরী মানুষ বলে আপনারা মনে করেন, না? আমারও একটা মনে আছে, আমিও সব বুঝতে পারি।

—কী?

কাছে এসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ালো, আর অতি অদ্ভুত চোখ দুটো তার ছলছল করে উঠলো, বললে,—সরোজা আজ থেকেই এ বাড়ির নয়জনের একজন হয়েছে, ফুলের নামও নিয়েছে,—এই পরিবর্তনটার কথা চিন্তা করতে করতে আপনার কথা ভাববার অবকাশ তেমন পাই নি। নইলে

সকালেই যখন ভামতীর মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিলেন, তখনই অনুমতি আমার দেওয়া উচিত ছিল।

ওর চোখের দিকে একটু বিস্মিত হয়েই তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, বললাম, —তা হলে অনুমতি এখন দিচ্ছ ?

—দিচ্ছি ভাই, কিন্তু এ কথাটা যেন পাঁচ কানে না যায় !

উঠে দাঁড়ালাম, বললাম,—তা যাবে না, যদি তুমি 'আপনি আজ্ঞে' ছেড়ে এর পর এই 'ভাই' সম্বোধনের ফলস্বরূপ 'তুমি'তে এসে সত্যিই নেমে দাঁড়াও।

হেসে বললে,– আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

কাছেই একখানা মাটির ঘর। দরজার কড়া নাড়তেই একটি বুড়ী ঝি এসে দরজা খুলে দিলো, তারপরে নারায়ণকে দেখে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ালো।

ঘরের মেঝে পাকা, কিন্তু দেওয়াল মাটির, সাদা রঙ করা। মাথায় তালপাতার ঘন ছাউনি ! ঘর অবশ্য মাত্র দুখানা। বাইরের ঘর, অর্থাৎ যেটাতে নটরাজন থাকে, সেটা একটা প্রকাণ্ড তক্তপোশে ভর্তি, তার উপরে পাতা বিছানা, বিছানার উপরে বই খাতাপত্র, একটা মৃদঙ্গম্, গোটাকয়েক বাঁশের বাঁশী, একটা হারমোনিয়াম, এই সমস্ত শোভা পাচ্ছে নিতান্ত আগোছালো ভঙ্গিতে।

এই ঘরখানা পার হয়ে একটি দাওয়া, দাওয়ার পরে ছোট একটা বাঁধানো উঠোন, উঠোনে ঠিক ও-বাড়িতে যেমন দেখছিলাম, তেমনি দুটি লৌহদণ্ডে ঝোলানো একটি দোলনা। উঠোনে বা দোলনায় কেউ কোথাও ছিল না, শুধু যে বুড়ী ঝিটি দরজা খুলে দিয়েছিল, সে এসে দাঁড়ালো দাওয়ার এক পাশে। আমরা উঠোন পার হয়ে যে ঘরখানায় গিয়ে পৌছলাম, সেটাতেই শুয়ে ছিলেন মহিলাটি, ছোট্ট একটা খাটে। পায়ের কাছে বসে আছে ভামতী, মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন শোনবার চেষ্টা করছে সে মায়ের মুখ থেকে।

আমাদের দেখে সে মুখ ফেরালো, নারায়ণের পিছনে পিছনে যে আমি গিয়ে উপস্থিত হবো, এ সে ভাবতেও পারে নি। বিপুল বিস্ময় নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো সে।

নারায়ণ মহিলাটির মুখের কাছে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ডাকলো,— সরস্বতী আম্মা !

ধীরে ধীরে ওর দিকে চোখ তুলে তাকালেন, ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু হাসির আভাসও ফুটে উঠলো, অতি ক্ষীণ স্বরে কোনক্রমে যেন বলে উঠলেন,—নারায়ণ ?

—হ্যাঁ, আমি। কেমন আছো ?

ঠোঁটের কোণের হাসিটা এবার ফুটে উঠলো স্পষ্ট হয়ে, কোনও কথা বললেন না, শুধু ম্লান একটু হেসে চোখ দুটি বুজলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোণের জমা অশ্রুবিন্দু দুটি ধারা বেয়ে দুটি গালের উপরে নেমে এলো।

নারায়ণ মুখ ফেরালে ভামতীর দিকে, বললো,—ডাক্তার এসেছিল এ বেলা ? কী বলে ?

দুটি বড়ো বড়ো চোখের দৃষ্টি নারায়ণের ওপরে মুহূর্তের জন্য ফেলে চোখ দুটি নামিয়ে মুখ নত করলো সে। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো নারায়ণ, বললে,—বুঝেছি। আমি বড়ো ডাক্তারকেও আনবার চেষ্টা করছি কাল সকালে। আসল কথা, ওষুধ ইনজেকশন—এসব তো পড়ছে, এখন ভালমতো নার্সিং দরকার।

ভামতী বললে,—আমি তো করছি সাধ্যমতো।

—করতেই হবে।

ভামতী বললে,—মার যতদিন কিছু না হয়, এখানেই থাকব তো ?

নারায়ণ একমুহূর্ত থেমে থেকে তারপরে বললে,—তাই থাকবে। তোমার ও-বাড়ির ঘরে আপাতত স্থান হয়েছে ভারাহালুর।

—কেন ? ভারাহালুর ঘর কী হলো ?

—সে ঘরে পাকাপাকিভাবে এসে বাস করছে এখন সরোজা।

—সরোজা !

—হ্যাঁ। ঘনশ্যামদাসজী তাকে ত্যাগ করেছেন। এবং সেও তার পুরনো জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও থাকবে না।

—কেন ?

—কেন ! তাকেই একদিন জিজ্ঞাসা ক'রো।

ভামতী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর হঠাৎ আমাকে নির্দেশ করে নারায়ণকে বলে উঠলো,—ইনি ?

—ইনি ? আমাদের বাবুজী ? নারায়ণ একমুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, তারপরে ভঙ্গি পরিবর্তন ক'রে সহজভাবে বলে উঠলো,—ইনি এসেছেন তোমার মায়ের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে। আমিই নিয়ে এসেছি। মনে হয়, ইনি নিয়মিত দেখাশোনা করলে রোগীর নার্সিং বা চিকিৎসা ভালই চলবে।

নটরাজন এক পাগল লোক, কাজকর্মের ব্যাপারে তার ওপরে খুব নির্ভর করা যায় কী ? এঁর ওপরে যথেষ্ট নির্ভর তুমি করতে পারবে আশা করি।

ভামতী মাথা নিচু করে রইলো, কিছু বললো না।

ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে নারায়ণ বলে উঠলো,—তা হলে বাবুজী, আমি চলি। তোমার ওপর এদের সব ভার দিয়ে গেলাম, মনে থাকে যেন ?

বললাম,—সাধ্যমতো বইবার চেষ্টা করবো।

নারায়ণ একটু হেসে, তারপরে সত্যিই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমি ভামতীর দিকে ততটা নয়, যতটা লক্ষ্য করছিলাম তার মাকে। কপালের উপরে সিঁথির কাছে এবং কানের পাশে চুলে পাক ধরেছে, দুটি চোখ বসা, গালে কপালে চোখের কোণে কুঞ্চনের রেখা, সমস্ত দেহটা কঙ্কালসার, শীতের পার্বত্য জলধারার মতো বিশীর্ণ পড়ে আছেন যেন পাষাণের বন্ধনে, কিন্তু তবু মনে হলো, অপার্থিব এক সৌন্দর্যের জ্যোতিরেখা কে যেন এঁকে রেখেছে অন্ধকার রাত্রির কৃষ্ণ পটভূমিকায়।

এ-সৌন্দর্যের বিশ্লেষণও করা যায় না, এ সৌন্দর্যের কথা বলেও বোঝানো যায় না, এ জিনিস ধরা পড়ে মাত্র অনুভূতিতে।

কিন্তু অনুভূতি ? পৃথিবীর মাটি আর পাথর নিয়ে যার কারবার, তার মধ্যে অকস্মাৎ এ অপার্থিব অনুভূতির স্পর্শ জাগলই বা কেমন ক'রে ?

চকিতে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম ভামতীর দিকে। ওর চোখ থেকে বিস্ময়ের ঘোর বোধ হয় কাটে নি, নিষ্পলক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চোখে চোখে মিলে যেতেই বললে,—এলে কেন এখানে ?

বললাম,—খুবই অবাক হয়েছ, না ?

নিম্নকণ্ঠে প্রায় ফিস ফিস করেই বললে,—নারায়ণকে জয় করলে কেমন ক'রে, তাই ভাবছি।

—তার মানে ? এর মধ্যে জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন আসছে কেন ?

—আসছে। তুমি জান না, নারায়ণভাই কোন মেয়ের কাছে কোন বাইরের পুরুষকে কখনও অনর্থক মিশতে দেয় না।

বললাম,—আমি কী বাইরের পুরুষ ?

—নও !

একটু থেমে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম,—হয়তো তাই। কিন্তু তা বলে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলো,—কিন্তু-টিন্তু নয়, ওদের চোখে তুমি তা-ই, বাইরের লোক।

একটু হেসে বললাম,—নারায়ণকে নির্বোধ মনে ক'রো না, সে ঠিক বুঝেছে।

—কী বললে!—যেন আর্তনাদ করে উঠল ভামতী,—বুঝতে পেরেছে ওরা সব?

—ওরা, বলতে কী বোঝাতে চাও জানি না, তবে নারায়ণ সমস্তই আন্দাজ করতে পেরেছে।

—নটরাজন?

—সে হয়তো নয়, কিন্তু ক্রমশ সেও জানতে পারবে।

চুপচাপ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলো ভামতী।

বললাম,—ভয় পাচ্ছো কেন? জানাজানি হলেই বা!

—না না, জানাজানি হওয়াটা ঠিক নয়, এর ফল ভাল হয় না।

—তা হলে, কী করবে এখন?

বলে উঠলো,—বাধা দেবো।

বললাম,—কাকে? আমাকে? আমার এখানে আসাটা তুমি বোধ করতে পারবে?

হঠাৎ মুখের উপর দুটি হাত চেপে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

—এ কী! কাঁদছ কেন?

বললে,—আমি চাই না তুমি এখানে আসো। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে, তুমি না এলেই বা মাকে আমার দেখবে কে? নারায়ণভাই ব্যস্ত মানুষ, আর নটরাজন? সে অন্য জগতের লোক, সে খেয়ালী। নারায়ণভাই সত্যি কথাই বলেছে, তুমি ছাড়া নির্ভর করার মতো অন্য কেউ আমার নেই।

একটু থেমে তারপরে বললাম,—বেশ। তোমার মায়ের ভার আমি নিলাম। আর তুমি যা ভয় করছো, তা আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার আমার সম্পর্ক নিয়ে কেউ যাতে কিছু মনে করতে না পারে, সেদিকে আমার সজাগ দৃষ্টি থাকবে।

আমার কথায় কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত হলো ভামতী, বললে,—নারায়ণভাই যখন জানতে পেরেছে, জানুক। তার কাছ থেকে অন্য কেউ কখনও কিছু জানতে পারবে না। কিন্তু অন্য কাউকে যেন আর বুঝতে দিয়ো না। তাদের নিজেদের বহু ব্যর্থতার ইতিহাস আছে, তারা নারায়ণভাইয়ের এই প্রশ্রয়ের কথাটা জানতে পারলে তারই কাছে গিয়ে অশান্তির সৃষ্টি করতে পারে।

সামান্য একটু ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বলে উঠলাম,—তোমার ইঙ্গিতটা কি নটরাজনকে লক্ষ্য করে ?

—হ্যাঁ, কতকটা তাই।

বললাম,—ওরও কি আছে কোন ব্যর্থতার ইতিহাস ?

বললে,—থাকতে পারে। নইলে এমন করে পড়ে আছে কেন এ পল্লীতে ? কী স্বার্থ ওর এখানে ?

বললাম,—সেটা আমি জানি। নৃত্যশিল্পী আর গায়িকা গড়ে তুলতে চায় তোমাদের মধ্য থেকে।

বললে,—কে জানে ! কিন্তু আমার মনে হয় আরও যেন কিছু আছে ওর ভেতরে। কী এক দুঃখ থেকেই বুঝি ওর এই শিল্পীমনের জন্ম ! প্রতিটি সৃষ্টির মূলেই তো থাকে গভীর কোনও বেদনা। নয় কী ?

বললাম,—এটা তুমিই বা বুঝলে কী করে ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—তা আমি পারি বুঝতে। আমার শিক্ষাগুরুই বলো, আর দীক্ষাগুরুই বলো,—সে এই আমার মা।

নির্জীবের মতো বিছানায় এলিয়ে পড়ে আছেন মহিলাটি। চোখ দুটি বোজা, যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন বলে মনে হলো।

বললাম,—চিকিৎসা তো ভালই হচ্ছে, কী বল ?

বললে,—তোমার কি তাই মনে হয় ? ইনজেকশন্ তো দিয়ে গেল, আরও নাকি দিতে হবে।

—খাওয়ার ওষুধ ?

—এই যে শিয়রের কাছে, টেবিলটার উপরে।

—কী বলেন ডাক্তার ?

—অবস্থা ভাল নয়। সারারাত জাগতে হবে। হাত পা ঠাণ্ডা না হয়ে আসে।

বলতে না বলতেই কেঁদে ফেললো ভামতী,—মা যে আমার কতখানি, তা তোমরা বুঝবে না। সব শিখেছি, সব জেনেছি এই মায়ের কাছ থেকে। এই মা যদি—

বাধা দিয়ে কোমল কণ্ঠে বলে উঠলাম,—এত কাতর হয়ো না। ঠিকমতো চিকিৎসা হলে, ঠিকমতো সেবা শুশ্রূষা হলে—দেখতে না-দেখতেই সেরে উঠবেন উনি।

দুটি চোখ আমার উপর স্থাপিত করে বললে,—আমার বড্ড ভয় করছে। আমি যে পাপ করেছি।

—কী পাপ?

বললে,—ঐ নবগ্রহমূর্তি বড় জাগ্রত। ওঁদের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কাউকে ফুলের নাম বলবো না বা কাউকে নিজের নাম বলে দেবো না।

—অথচ আমাকে বলে দিয়েছো, এই তো?

—হ্যাঁ।

বললাম,—তাতে কোনই পাপ হয় নি।

—বলছ কী তুমি!

—ঠিকই বলছি। কে আমি তোমার? আমাকে না বলে তুমিই বা থাকতে কেমন করে?

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো, তারপরে স্থানকাল ভুলে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো,—তুমি বুঝতে পেরেছ তা?

কী জানি কী হলো, আমিও কোনও উত্তর দিতে পারলাম না, মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বললে,—জানো, মাকে তোমার কথা বলেছি।

ফিরলাম ওর দিকে। আশ্চর্য হয়ে বললাম,—কী বলেছো!

—নাই বা শুনলে?

—দোষই বা কী শুনলে?

বললে,—অন্তরে সাত্ত্বিকভাব, বাইরে অন্য-কিছু, এ-রকম 'কবি' পুরুষের বর্ণনা মায়ের কাছ থেকেই শুনেছিলাম।

একটু হেসে ওর কাছে সরে গিয়ে বললাম,—তা-ই হয়েছে। মায়ের কাছে এসব শুনে শুনে মনের মধ্যে একটা কল্পনার রাজ্য গড়ে তুলেছো, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাও সবাইকে। আর যাই করো, আমাকে কিছু কল্পনা করো না,—ঠকবে।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললে,—না, ঠকবো না।

বলেই মায়ের শিয়রে গিয়ে বসে পড়লো, ধীরে ধীরে ওঁর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো,—মা বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছে। তুমি এখন যাবে না?

এক মুহূর্ত ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম,—যাবো বলে তো আসি নি। থাকবো।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর দুটি চোখ, একটু যেন ভয়, একটু যেন শঙ্কাও জেগে উঠলো সে দৃষ্টিতে, বললে,—তুমি থাকবে! মানে?

বললাম,—বাইরের ঘরটা তো নটরাজনের। সে দেখেই বুঝেছি। তোমার ঘর কোন্‌টা?

তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—আমার আবার ঘর কোথায়! মায়ের ঘরই আমার ঘর।

—রাত্রে শোবে কোথায়?

বললে,—সে ওই পাশের ঘরখানায়।

—তা হলেই হবে। আমি থাকবো এ ঘরে। একজন কেউ ওঁর শিয়রে জেগে না থাকলে চলবে না।

তেমনি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো আমার দিকে, তারপর ঈষৎ চাপা কণ্ঠে বললে,—রাত জাগার জন্য তো আমিই আছি, তুমি কেন?

বললাম,—সঙ্গে আর একজন থাকলে দোষ কী?

ধীরে ধীরে নিচু করলো মুখ, তৎক্ষণাৎই কোন উত্তর দিলো না। তারপর চোখদুটি যখন তুলে ধরলো, দেখলাম, দুটি চোখই অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে গেছে, বললে, ভিতরে ভিতরে বুক কাঁপছে আমার দারুণ ভয়ে, যদি কিছু হয়? আমার পাপের শাস্তি যে এমন ভাবে নেমে আসবে, তা আমি কখনও ভাবি নি।

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, বললাম,—তুমি সরো। মায়ের শিয়রে বসে অনর্থক কেঁদে কেঁদে ওঁর ঘুমটা ভেঙে দিয়ো না।
হয়তো কান্নার আবেগটা শান্ত করবার জন্যই উঠে দাঁড়ালো। তারপর মাকে যেন আমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলে গেল পাশের ঘরে।

একটু ঝুঁকে মহিলাটির মুখের দিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম ভালো ক'রে। মনে হলো, এ ওঁর ঠিক ঘুম নয়, অথচ অজ্ঞানও হয়ে যান নি, কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছেন। কপালে হাত রেখে শরীরের উত্তাপটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম। জ্বর খুব বেশি হবে না, বুকের ব্যথা বা শ্বাসকষ্টের ব্যথায়ও ওঁকে তেমন কাতর মনে হচ্ছে না। পায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, পাও ঠাণ্ডা নয়। অথচ এমনভাবে পড়ে আছেন কেন?

মনে একটা প্রশ্ন নিয়েই শিয়রে বসে ওঁর মেয়ের মতো হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম মাথায়। নীরবেই কাটতে লাগলো সময়। কেরোসিনের উজ্জ্বল টেবিল

ল্যাম্পটা ঘিরে একটা জ্যোতির্বৃত্ত, ঘরখানার বাকি অংশে আলো-আঁধার অদ্ভুত এক রহস্যের মায়াজাল সৃষ্টি করেছে।

কিছুক্ষণ পরেই এলো ভামতী। সে দ্রুতপায়ে মায়ের বিছানা পর্যন্ত এসে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে চলার গতি দিলো থামিয়ে। ইঙ্গিতে জানালাম, কাছে এসো।

বললাম,—ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে নাকি? রাত এখন সাড়ে আটটা।

—তাই নাকি! কিন্তু মা যে ঘুমিয়ে পড়েছে! ঘুম ভাঙানো কি উচিত হবে?

বললাম,—ঘুম কী? আমার তো মনে হয় না। তুমি একবার ডাকো দেখি?

বেশিক্ষণ ডাকতে হলো না ভামতীকে, ওঁর কপালে হাত রেখে মুখের কাছে ঝুঁকে বার কয়েক ডাকতেই যেন অতি দূর থেকে সাড়া দিলেন; যেন সুদূর কোনো জগৎ থেকে উত্তরণ করলেন এই জগতে।

ভামতী ওষুধটা খাইয়ে দেবার পর ওঁর দুটি বিহ্বল দৃষ্টি যেন কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে মনে হলো।

—কী খুঁজছো মা?

দুটি চোখ অবশেষে স্থাপিত হলো আমার ওপর, ধীর কণ্ঠে বললেন,—নটরাজন?

তাড়াতাড়ি বলে উঠলো ওঁর মেয়ে,—না মা, এই সেই বাঙালী ভদ্রলোক। তোমার সেবা করতে এসেছেন।

স্নিগ্ধতায় ভরে গেছে বৃদ্ধার দুটি চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে সস্নেহ হাসি, আস্তে আস্তে থেমে থেমে বললেন,—সেবা! না। কারুর সেবা আমাদের নিতে নেই। আমরা দেববধূ।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুজে গেল চোখের দুটি পাতা, ঠোঁট দুটি কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেল। অবশ্য আশঙ্কার কিছু নয়, তাড়াতাড়ি হাত টেনে দেখলাম, কপালে হাত রেখে দেখলাম। অবস্থার তারতম্য বিশেষ কিছুই হয় নি, বরং জ্বরটা কমই মনে হচ্ছে।

কিন্তু এভাবে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আচ্ছন্নের মতো হয়ে পড়া, এও যেন কেমন স্বাভাবিক ঠেকছে না।

ভামতী বললে,—ঘুমিয়ে পড়লো, না ?

—তাই কী ?

—হ্যাঁ, এভাবেই তো ঘুম আসছে ওর।

বললাম,—অবস্থা অবশ্য খারাপ নয়, কিন্তু ঘুমটা ? তা হবে। হয়তো ঘুমই হবে। আমারই বোঝবার ভুল।

বলে, আর একবার পায়ে হাত দিলাম। না, পাও ঠাণ্ডা নয়।

ভামতী বললে,—শোনো ?

—কী ?

—খেয়ে তো আসোনি।

—কী আশ্চর্য, এখন কি সেকথা জিজ্ঞাসা করার সময় ?

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে এনে বললে,—মেয়ে হয়ে জন্মেছি যে! বলো না গো ? আর বলবেই বা কী, মুখ দেখেই বোঝা যায়। ও-ঘরে এসো তো চট করে, আসন পেতে রেখে এসেছি, দুটি মুখে দিয়ে নাও।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে, বললাম,—আশ্চর্য তোমরা ! আমি বলি, থাক ওসব, হোটেল থেকে এখুনি খেয়ে আসছি।

খপ করে আমার হাতটা ধরলো, বললে,—না। যেতে হবে না।

বললাম,—আচ্ছা পাগল তো !

—কেন ! পাগলামিটা কিসে দেখলে ?

—এই একটু আগে বলছিলে, 'তুমি যাবে না ?' আর এখন না যেতে দেওয়ার মতলব !

ও কিন্তু এ পরিহাসের সুরে যোগ দিলো না, মুখ নত করলো, গম্ভীর ওর মুখ।

—কী হলো !

ধীরে ধীরে দুটি আয়ত চোখের করুণ দৃষ্টি আমার উপর স্থাপিত ক'রে বললে,—খাবে না ?

চোখের ভাষায়, গলার স্বরে, এমন এক মিনতি ছিল যে, আমি আর 'না' করতে পারলাম না। বললাম,—আচ্ছা, চলো। কিন্তু মায়ের কাছে থাকবে কে ?

—আমিই থাকবো। তোমাকে বসিয়ে দিয়েই চলে আসবো।

পাশের ঘর। ঘরখানা লম্বায় ও-ঘরখানারই সমান, পরিসরে ছোট। দরজার কাছেই একটা নেয়ারের সাদা ফিতে-বোনা খাটিয়া, তার পাশে কয়েকটা বাক্স ওপরে ওপরে সাজানো, আর ঘরের বিপরীত অংশ জুড়ে ঠাকুর-পূজার নানাবিধ উপকরণ। ধূপ-ধুনো, ঝকঝকে পিতলের পিলসুজের মাথায় প্রদীপ জ্বলছে জলচৌকির উপর চতুর্ভুজ নারায়ণের বেশ বড়ো একটা ছবি বসানো—দেওয়ালে হেলান দেওয়া, সেই ছবির ওপরে চন্দনের ফোঁটা, পায়ের কাছে ফুলের রাশি।

কী আকর্ষণে যেন এগিয়ে গিয়েছিলাম ছবিটার কাছে। দেওয়াল ভরে নানান ঠাকুর-দেবতার ছবি, নানান তীর্থেরও ছবি। কিন্তু সব থেকে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করলো যেটা, সে' হচ্ছে একজোড়া পায়ের ঘুঙুর—নারায়ণের মূর্তির পাশেই রাখা আছে ভিন্নতর ছোট্ট একটা জলচৌকির ওপরে। দেখেই বোঝা যায়, বহু পুরানো, কিন্তু যত্নের অবধি নেই; তারও ওপরে চন্দনের ফোটা, ফুলের অঞ্জলি; দুটো জল-চৌকিতেই আলপনা আঁকা।

কতক্ষণ ধরে এই সমস্ত নিরীক্ষণ করছিলাম মনে নেই, পিছন থেকে ভামতী এসে চুপিচুপি বললো,—কী দেখছো?

বললাম,—এটা যে তোমার মায়ের পূজার ঘর, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু—

—থামলে কেন, বলো?

বললাম,—ঠাকুরের পাশে ওই ঘুঙুরটা কিসের? ওটারও কী পূজা হয়?

বললে,—হয়। আমাদের নিয়মকানুন সব তোমরা বুঝবে না।

—অন্তত চেষ্টা করছি বুঝতে।

একটু ইতস্তত করে বললে,—মাও ছিলেন আমার মতো দেববধূ। সে তো শুনেছো? দেবতার মন্দিরে জীবনের প্রথম নৃত্য মা করেছিলো ওই ঘুঙুর পায়ে দিয়ে, সেই জন্যই ওই ঘুঙুর ওভাবে রেখে দিয়েছেন মা, পূজোও করে।

—জীবনের প্রথম নৃত্য মানে?

বললে,—আমাদের একটি মেয়ে—ভারাহালু—সে শীগগিরই তার জীবনের প্রথম নাচ দেখাবে মন্দিরে। তোমাকে নিয়ে যাবো, দেখো'খন নিজের চোখে। নাচ শেখবার পর, প্রথম নাচ দেখাতে হয় দেবতার কাছে—দেবতার মন্দিরে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। নাচটাকে আমরা মানুষের আধ্যাত্মিক ভাবের একটা বিকাশ বলে মনে করি। ক্রমে ক্রমে তুমি সবই জানতে পারবে। এখন খাবে এসো।

খাওয়া দাওয়ার পর আমি স্থান নিলাম বৃদ্ধার কাছে। বললাম,—তুমি শোও গিয়ে, আমি জেগে আছি।

ও বললে,—তা কি হয়!

—হয়। যাও দেখি তুমি।

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো আমার মুখের দিকে, বললে, সত্যিই জেগে থাকবে! কেন?

—এমনি। খেয়াল।

আমার মুখের দিকে তাকালো, বললে,—খেয়াল নয়, আমি বুঝতে পেরেছি, কেন।

কেমন যেন অদ্ভুত গম্ভীর আর কঠিন দেখালো ওর মুখ। আশ্চর্য হয়ে বললাম,—বলতে চাও কী তুমি?

নির্মম কণ্ঠে বললে,—আজ ও-বাড়ি যাও নি?

আমি ওর প্রশ্নের উত্তরে হতবাক্ হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছি লক্ষ্য ক'রে বললে,—অন্য মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প ক'রে এলেও তো পারতে!

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তারপরে একটু হেসে বললাম,—হ্যাঁ তা পারতাম। কিন্তু পারলাম না।

কয়েকটি নিস্তব্ধ মুহূর্ত। মায়ের পায়ের কাছে বসে ও। শিয়রে আমি। এক সময় বলে উঠলো,—মাকে খাইয়ে দিই এবার?

বললাম,—হ্যাঁ, তা দেওয়া উচিত। কিন্তু এমন নিঃঝুমের মতো পড়ে আছেন কেন বুঝছি না।

মাকে ডেকে ও বোধ হয় বার্লি খাওয়ালো এক বাটি। এবারেও চোখ মেলে কাকে যেন খুঁজতে খুঁজতে আমার ওপর দৃষ্টি স্থাপিত করলেন—নটরাজন?

ভামতী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—সে এখনও আসে নি। এ সেই বাবুজী।

বাবুজী!—বৃদ্ধা একটু হাসলেন, কোমল কণ্ঠে বললেন,—আমি ভাল আছি রাত অনেক, না? তোমরা শুয়ে পড়গে।

পরক্ষণেই বাইরে একটা কলরব শোনা গেল, দাওয়ায় শুয়ে থাকা সেই ঝিটির কণ্ঠস্বর। তারপরে খিল খোলার শব্দ, কয়েক মুহূর্ত পরেই উঠোন পার হয়ে ঘরে এসে দাঁড়ালো নটরাজন, আমাকে দেখে বোধ হয় একটু অবাকই হয়ে গেল সে, বললে—যান নি বাবুজী?

একটু হেসে বললাম,—না তাড়ালে যাবো না। থাকবো।

—ছি ছি, এ কী বলছেন। এ আমাদের সৌভাগ্য।

ভামতী বলে উঠলো,—খাওয়া হয়েছে?

নটরাজন বললে,—হ্যাঁ। ও-বাড়িতে। সরস্বতী আম্মা কেমন?

ততক্ষণে আচ্ছন্নের মতো হয়ে গেছেন বৃদ্ধা, নটরাজন কাছে এসে ওঁকে ভালো করে দেখলো, তারপরে বললে,—আপনারা রইলেন, তেমন কিছু বুঝলে আমাকে ডাকবেন। কেমন?

—আচ্ছা।

যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল নটরাজন।

তারপরে কাটতে লাগলো সময়। মিনিটের পর মিনিট। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রহরের পর প্রহর।

ভামতী মায়ের পায়ের কাছে ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ছিল, একসময় বললে,—ঘুম পাচ্ছে না তোমার?

—না।

—শোবে না?

—না।

—না আবার কী? ও-ঘরে বিছানা করেছি। শোও গিয়ে।

—না।

সোজা হয়ে উঠে বসলো এবার, বললে,—মা তো ঘুমুচ্ছে। ঘরে ঝিও তো রয়েছে। তুমি ঘুমোও গিয়ে।

ইতিমধ্যে অবশ্য সেই বুড়ী ঝিটি এসে ঘরের এক পাশে শতরঞ্চি পেতে শুয়ে পড়েছিল, সেও আচ্ছন্ন নিবিড় ঘুমে। বললাম,—বরং তুমি গিয়ে ঘুমোও।

এবং এরই উত্তরে হঠাৎ সে বলে বসলো অদ্ভুত একটা কথা, বললে—তুমি আগে যাও বিছানায়, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

তার মানে!—অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই ধরতে পারলাম ওর ইঙ্গিত, বুঝতে পারলাম কী ভয়ানক কথা ও বলতে চায়!

মুহূর্তে যেন সমস্ত শরীরটা ঘৃণায় ঘিনঘিন করে উঠলো! কী জঘন্য পশুই না ও ভেবেছে আমাকে! মনে হলো, এখুনি ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাই।

পরক্ষণেই মনে হলো, এ চিন্তা ক'রে অন্যায় ও কিছু করে নি। ওর সঙ্গে আমার আলাপের সূত্র কী? হঠাৎ কী-এক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে যে-ভাবে প্রথম গিয়েছিলাম ওর ঘরে, তাতে ক'রে আমাকে নিছক দেহবাদী ছাড়া সত্যি-সত্যি আর কী ভাবা উচিত ওর পক্ষে? অন্তত নিজের ওপরেও আমার সেই ধারণা। কিন্তু, ও-ই আমার মনে জাগিয়ে দিয়েছে অন্য এক ভাবের প্রবাহ, যাতে অনুক্ষণ অবগাহন করে চলেছি, আর মনে হচ্ছে, এই যা দেখছি, এই যা করছি, এই যে আমাদের দৈনন্দিন জীবন, এই যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা, এর বাইরেও এক রসের জগৎ আছে, এক আনন্দের বিশ্ব বিদ্যমান।

অবশ্য, কে জানে, এ মাত্র কল্পনাবিলাস কি না, ওরও—আমারও?

তাই ওর কথার উত্তরে একটু হেসেই বললাম,—বেশ। তুমি শোও গিয়ে আগে। আমিই বরং যাচ্ছি একটু পরে।

সত্যি-সত্যি উঠে দাঁড়ালো ভামতী, দুটি ঘুম-ঘুম চোখের দৃষ্টি আমার ওপর স্থাপিত ক'রে বলল,—দেরি ক'রো না, ভোরে উঠতে হবে আমাকে।

চলে গেল পাশের ঘরে।

আমি কিন্তু প্রস্তুত ছিলাম না এ পরিস্থিতির জন্য।

প্রথমে মনে একটা অদ্ভুত বিতৃষ্ণা এলেও, পরে মনে হলো, ক্ষতি কি? বৃদ্ধা অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন, রাত্রিও শেষ প্রহরে এসে পৌঁছেছে, অখণ্ড নিস্তব্ধতা চারিদিকে, এ সময় মূর্তিমান পাপের মতো ভামতীর কাছে গেলে, আর যাই হোক অন্তত ভামতীর অনুমানের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে।

কবি! বিশ্বরহস্যের সর্বত্র যে চিরসুন্দরকে প্রত্যক্ষ করে, সে-ই নাকি করি! আমি যে ওর অনুমান মতো সত্যিই 'কবি' নই, তার প্রমাণ দেবো ঠিক এই মুহূর্তে ওর কাছে গিয়ে লালসার বহ্নিতে বহ্নিমান হয়ে। পড়ে থাক্ রোগিণী, এক পাশে, দূরে থাক্ সমস্ত সুকুমার অনুভূতি। বৃদ্ধার মুখের দিকে চেয়ে তাঁর ওই

আচ্ছন্নভাব দেখে যে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে মন নিবিড় হয়ে উঠছিল, তা থেকে জোর ক'রে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

জানলার বাইরে ঝাঁকড়া-মাথা একটা গাছ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা একটা হাওয়া ভেসে আসছে। জানলায় ঝুঁকে হাওয়ার কাছে মাথাটা রেখে একটু যেন স্নিগ্ধ হলো মন, তারপরে ধীরে ধীরে গেলাম পাশের ঘরে ভামতীর কাছে।

দেবমূর্তির-কাছে-রাখা সেই প্রদীপটি কখন নিভে গেছে, সেই নেয়ারের খাটটায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে, চুপচাপ শুয়ে আছে ভামতী,—ঘুমের ঘোরে বেশবাস এলোমেলো, বুকের আঁচলটা লুটিয়ে পড়ে আছে মাটিতে!

কয়েক মুহূর্ত ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে এলো অন্য এক ভাব।

মনে হলো, নিশীথ রাত্রে বিশ্বসংসার যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তারও এক রূপ ফুটে ওঠে। সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। এ যেন ঘুম নয়, কোনো এক কৌতুকময়ী যাদুকরী যেন তার মায়ার জাল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে সবাইকে।

পাশের ঘর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে যেটুকু আলো এসে পড়েছে এই ঘরে, সেই আবছা আলোতেই ভামতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, কী নিশ্চিন্ত নির্ভাবনাতেই না ও এসে ঘুমিয়ে পড়তে পেরেছে!

কিন্তু আশ্চর্য ওর আহ্বান! আমাকে যে অমন করে ডেকে এলো, সে কি এই ভামতী? বিশ্বাস হয় না। যে ঘুমিয়ে আছে, সে আর-এক মেয়ে, আর-এক জগতের মেয়ে, আর এক অনুভূতির মেয়ে। একে ছোঁয়াও যায় না, বোঝাও যায় না।

ধীরে ধীরে ফিরে এলাম ওর কাছ থেকে। ফিরে এলাম ওর মায়ের কাছে। ঠিক তেমনি একই ভাবে পড়ে আছেন বিছানায়, আলো-কমানো বাতিটার স্বল্পালোক আলো-আঁধারে অদ্ভুত মায়াজাল বিস্তার করেছে।

আমার চোখে মৃদুমাত্র ঘুমের ছোঁওয়া নেই, কী এক অজানা অনুভূতির আবেশে দেহমন আচ্ছন্ন। মহিলাটির শিয়রের কাছে যে খোলা জানলাটি দিয়ে ঝিরঝিরে বাতাস আসছিল, সেইখানে দাঁড়িয়ে জনপদপ্রান্তের বিস্তৃত পর্বতমালা চোখে পড়লো। রাত গভীর বলে রাস্তার আলো বোধ হয় 'মনুষ্যপালসমিতি' বা মিউনিসিপ্যালিটি'র লোকেরা নিভিয়ে দিয়েছে। অন্ধকারে যতদূর দেখা যায়, অরণ্যচারী হস্তীযূথের মতই দেখাচ্ছিল পাহাড়গুলোকে। মনে হচ্ছিল, বহু মত্ত

মাতঙ্গ যেন একসঙ্গে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। তারই এক কোণে, পর্বতচূড়ার অনেক নিচে, বলা যায় পাহাড়ের কোলে,—সাদা-সাদা দেখাচ্ছিল শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরটা। বোধ হয় এখনও আলো জ্বলছে মন্দিরে, কান পেতে শুনলে, বাতাসে কেঁপে কেঁপে ভেসে-আসা কোনো সঙ্গীত-মূর্ছনার রেশও অনুভব করা যায়; নিশীথ রাত্রে হয়তো নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীতের আরতি করছে দেব-দাসীরা। আর যারা দেববধূ, তারা নেই মন্দিরে, একজন তো ঘুমিয়েই আছে পাশের ঘরে।

কী একটা অস্ফুট শব্দ শুনে আমি তাড়াতাড়ি জানলা ছেড়ে ছুটে এলাম মহিলাটির কাছে। বোধ হয় ঘুম ভেঙেছে। হাত দুটি ওঠাবার চেষ্টা করছেন, ঠিক পারছেন না, ভয়ানক কাঁপছে দুটি হাত। বালিশ থেকে মাথাটাও ওঠাবার চেষ্টা করছেন, তাও পারছেন না, চোখ দুটি বিস্ফারিত।

আমি চট ক'রে ভামতীকে ডেকে আনবো কি না ভাবছি, হঠাৎ ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, বিস্ফারিত সেই চোখের দৃষ্টিতে ভয়ও নেই, আতঙ্কও নেই, অদ্ভুত এক আনন্দের জ্যোতিতে সমস্ত মুখখানা যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে! কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওঁর মুখের দিকে। মনে হলো, ক্ষীণ কণ্ঠে কী যেন বলছেনও তিনি।

তাড়াতাড়ি ওঁর কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম মেঝের ওপরে। খাটের কিনার ধরে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ওঁর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, চোখের দৃষ্টি শূন্যে কী এক অশরীরী উপস্থিতির দিকে স্থিরনিবদ্ধ, অপ্রত্যাশিত আনন্দের আবেগে বুঝি ধারাও নেমেছে চক্ষু বেয়ে, বলে চলেছেন,—এসেছো! আমাকে নাও সঙ্গে ক'রে, আমার হাত ধরে নাও।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, মনে হচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু উনি যেন ঠিক দেখতে পেয়েছেন কাউকে ওঁর সামনে।

খুব মৃদু কণ্ঠে ব'লে চলেছেন,—এক হাতে তোমার গদা, অন্য দুই হাতে শঙ্খ আর চক্র। চতুর্থ যে হাতটিতে তোমার পদ্ম, সেই হাতটি ধ'রে আমাকে তুলে নাও তোমার কাছে।

বার বার উনি বলতে লাগলেন এই কথাটা। জ্বরের-ঘোরে ভুল বকা ব্যাপারটা আমার দেখা আছে, এটা ঠিক সে পর্যায়ে পড়ে না। জ্বরও তো বেশি নয়, অথচ—

অথচ ব্যাপারটা যে কী, তা বুঝেও বুঝতে পারছিলাম না। ভক্তিমতী নারী

চতুর্ভুজ নারায়ণের দর্শন পেয়েছেন, এ-কথাটা সেই মুহূর্তে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারলে ভাল হতো, সহজ হয়ে যেতো ব্যাপারটা। কিন্তু এ-যুগের লোক আমি, এ-যুগের বস্তুবাদের ভাবধারায় লালিত, চট ক'রে 'অলৌকিক' বলে মনে করবো কেন সব-কিছুকে ?

উনি দেখছেন, কিন্তু আমি তো দেখছি না কিছুই ! তবে এ কী কোন মানসিক বিকার ? তাও মেনে নিতে মন রাজী হচ্ছে না। ক্রমে ক্রমে কেমন যেন একটা ভয় হতে লাগলো মনে। উনি বার বার বলছেন,—তুমি এসো, নাও আমাকে।

আর আমার মনের গহন কন্দরে কী অদ্ভুত যেন এক সুর উঠছে, বলছে,—আমাকেও নাও। গ্রহণ করো আমাকে রসের রাজ্যে।

যেন হাহাকার করে বলতে চায় আমারই ভিতরকার আর-এক মন,—আমি ভূতত্ত্ববিদ, সম্পূর্ণ বস্তুবাদী সাধারণ একটি লোক,—কিন্তু আমাকে তুমি পরিবর্তিত করে দাও। আমি তোমার এ সুন্দর রাজ্যের সুন্দর কণাটুকুও যেন দেখতে পারি ! 'কবি' ক'রে দাও তুমি আমাকে।

—কবি !

কথাটা চিন্তার মধ্যে বিদ্যুতের মতো চমক দিতেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। অদ্ভুত এক আতঙ্কের অনুভূতি এলো মনে। বৃদ্ধাটির ব্যাপারে ততটা নয়, যতটা নিজের নিভৃত অন্তরের প্রতিধ্বনি শুনে।

একপ্রকার ছুটেই চলে এলাম পাশের ঘরে। অন্য কিছু ভাববার অবকাশ ছিল না, দরজার কাছ থেকে ডাকতে লাগলাম,—ভামতী ! ভামতী !

সাড়া নেই। ভিতরে গিয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে সেই আলুলায়িত কুন্তলা ঘুমন্ত নারী-শরীরের দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে থেকে ওর মাথায় হাত দিয়ে ডেকে উঠলাম,—ভামতী !

উঁ !—বলে ঘুমের ঘোরেই পাশ ফিরলো।

বাহুমুলে নাড়া দিয়ে ডাকতে লাগলাম,—এই শীগগির ওঠো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ধড়মড় করে উঠে বসলো ভামতী,—কী ! কী হয়েছে।

—তোমার মা—

—মা ! কী হয়েছে মায়ের ?

বলতে-না-বলতেই কোনক্রমে আঁচলটা সামলে তাড়াতাড়ি এ-ঘরে ছুটে এলো ভামতী। টেবিল-ল্যাম্পের আলোটা উজ্জ্বল ক'রে দিয়ে আমিও ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

—মা ! মা !

যেন অঘোর ঘুম থেকে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করলেন বৃদ্ধা, ভামতীকে দেখে অপূর্ব স্নেহের ভাবে ভরে গেছে মুখ, বললেন,—কী মা ভামতী ?

যেন অতি স্বাভাবিক হয়ে গেছেন তিনি, ব্যাধির কোনো গ্লানি, কোনো বিকার তাঁকে যেন আর ছুঁয়ে নেই।

—ভাল আছো ?

ঠোঁটের কোণে তেমনি প্রসন্ন হাসি, বললেন,—আছি।

—কষ্ট হচ্ছে কোনও ?

—না।

আমার দিকে চোখ ফেরালো ভামতী, চোখের ভাষায় নীরবে প্রশ্ন করলো, —কী ? ভয় পেয়েছিলে কেন ?

বৃদ্ধা জল চাইলেন এ সময়।

ভামতী ওঁকে জল খাইয়ে ওঁর মাথায় হাত বুলোতে লাগলো নীরবে। আমি ওঁর পায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, ওঁর মেয়ের সাহায্যে থার্মোমিটার লাগিয়ে শারীরিক উত্তাপ নিলাম, সামান্য একটু জ্বর রয়েছে মাত্র। বুকে বেদনা শ্বাসকষ্ট যেন কিছুই নেই। ধীর ক্ষীণ কণ্ঠে মেয়ের সঙ্গে সহজ ভাবেই কথা বলে যাচ্ছেন তিনি।

একসময় মেয়ে ডাকলো আমাকে, বললে,—এসো, মা ডাকছে।

আমি খুব কাছে এসে বসতেই সস্নেহে তাকালেন আমার দিকে, একখানা হাত উঠিয়ে আমার মাথায় ছুঁইয়ে আশীর্বাদও করলেন মনে হলো যেন। বললেন,— ভাব আছে তোমার মধ্যে। ভাবী হয়ো।

কথাটার তাৎপর্য সেদিন বুঝি নি। কিন্তু বৃদ্ধার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম।

মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। আলোটা চোখে না লাগে, এইজন্য কমিয়ে দিয়ে ঘরের অপর জানালাটির কাছে একটা ডেকচেয়ার পেতে দিলো ভামতী, বললে,—এসো, এখানে বসবে এসো।

নিজে একটা মোড়া টেনে নিয়ে কাছেই বসলো। বললে,—রাত আর বেশি নেই, বাকি রাতটা গল্প করে কাটাবে, না, ঘুমোবে ? আমি বলি, ঘুমিয়ে নাও বরং।

ডেকচেয়ারে এলিয়ে দিয়েছি ততক্ষণে নিজেকে। ওর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ।

আমার বাহুতে একটা নাড়া দিয়ে বললে,—ও-ঘরে চলো। ঘুমোবে।

সংক্ষেপে বললাম,—ঘুম আসবে না।

—অর্থাৎ গল্প করবে, এই তো? বুঝেছি।

আমি চুপ করে রইলাম। ও একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলতে শুরু করলো—তখন আমার কাছে এলে না কেন, ও-ঘরে?

চুপ করেই আছি।

ও বললে,—জানি, আমি ডাকলেও তুমি তখন আসতে পারতে না। আমি জেনে শুনেই ডেকেছিলাম। অন্য লোক হলে ডাকার অপেক্ষাও করতো না। আমার মায়ের অসুখ হয়েছে, তাতে তার কী? সে তার ভোগের কড়ি কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে ছাড়তো।

—বাজে কথা বলো না।—একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে উঠলাম,—কোনো মানুষই তা পারে না।

বোধ হয় একটু হাসলো, বললে,—মানুষের তুমি কতটুকু জানো? তুমি তো অ-মানুষ!

চুপ করে রইলাম।

একটু থেমে আবার বললে,—রাগ করেছো?

সবিস্ময়ে বললাম,—কেন?

—তোমাকে অ-মানুষ বলেছি।

—তাতে রাগ করার কী আছে?

—নেই!

বলে উঠলাম,—থাক এসব কথা। কেন তোমার ঘুম ভাঙালাম জিজ্ঞাসা করলে না তো?

—জিজ্ঞাসা কী আর করবো! ভয় পেয়েছিলে।

বললাম,—হ্যাঁ, তা পেয়েছিলাম। কেন, শুনবে?

ওকে বললাম ওর মায়ের সব কথা। সেই বার বার 'আমাকে নেবে! নাও।' প্রভৃতি কথা।

শুনতে শুনতে দুটি চোখ ওর ভরে এলো জলে, বললে,—সত্যি বলছো!

—মিথ্যে বলবো কেন?

চোখ মুছে বললে,—না, মিথ্যে বলবার লোক তুমি নও।

বলেই তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে গেল মায়ের কাছে, বললে,—মা!

আমিও এসেছিলাম পিছু পিছু। বললাম,—ঘুমোচ্ছেন। ডাকছো কেন?

ওর চোখের ধারা আর বাঁধ মানলো না, আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলতে লাগলো,—মা পেয়ে গেছে।

—কী?

—মেয়ে মানুষের যা পাবার শ্রেষ্ঠ জিনিস।

ওকে ধ'রে আস্তে আস্তে নিয়ে এলাম ওর আসনে, বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসলাম পাশে। ডেকচেয়ারের হাতলে দু হাত রেখে মাথাটা এলিয়ে দিলো তার ওপরে, বললে,—তোমায় তো বলেছি, দেববধূ ছিলো মা। না, দেবদাসী নয়, দেববধূ। দেবতার প্রতি আমাদের দাসীর ভাব নয়,—দয়িতার ভাব, প্রেমিকার ভাব।

বললে,—কত রূপেই না তিনি আসছেন আমার জীবনে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি আমি পাবো? পাবো না।

—কেন?

ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো,—আমি যে পাপ করেছি!

ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিলাম আমি। ওর কান্না থামাই-ই বা কী ক'রে, অথবা ওকে সান্ত্বনাই বা দিই কী ভাষায়? এই সব দয়িতা-প্রেমিকা, হেন-তেন—এসবের ব্যাখ্যা আমার জানা নেই, বিশ্বাসও তেমন নেই। 'দেবদাসী' আর 'দেববধূ' এদের মধ্যে আসল তফাতটা কোথায়, সেটা ভালভাবে জানলেও না হয় মনোরম ভাষা বিস্তারের একটা প্রয়াস করে দেখতাম।

এই সব ভাবছি, হঠাৎ কানে গেল দূরাগত সুরের গুঞ্জনধ্বনি, দক্ষিণদেশীয় গায়কের কণ্ঠে হিন্দীগানের উৎসারণ,—জাগো মোহন প্যারে, সঁবরী সুরত মোরে মন ভাওয়, সুন্দর লাল হমারে—

মনে মনে চমকেই উঠলাম বলা যায়। ভোর হয়ে এসেছে তা হলে? গানের সুরে এই ভোর হওয়ারই বার্তা শোনাচ্ছে নটরাজন। কিন্তু কাকে সে শোনাতে চায়?

আরও কাছে আসতে লাগলো গানের সুর। সুর কানে যেতে যেন চিত্রার্পিতের মতো কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ছিল ভামতী, হঠাৎ চমকে কাছে সরে এসে ফিসফিসিয়ে বললে,—ওই আসছে। যদি জিজ্ঞাসা করে তো বলো, আমি পাশের ঘরে ঘুমিয়ে আছি।

বলেই আর দাঁড়ালো না, ছুটে চলে গেল পাশের ঘরে। আর আমি ব্যাপারটাকে ভাল করে অনুধাবন করার আগেই এসে পড়লো নটরাজন।

কাছে এসে বৃদ্ধার দিকে ঝুঁকে, তার পরে আমার দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলো,—কেমন আছেন ইনি ?

—ভালই তো মনে হয়।

আমার দিকে তাকিয়ে বললে,—সারা রাত জেগেছেন তো ?

বললাম,—হ্যাঁ, তা জাগতে হয়েছে।

একটু অপ্রস্তুতের মতোই বললে,—ভেবেছিলাম উঠে আসবো, এসে আপনাকে একটু রেহাই দেবো। কিন্তু গানের সুরে সুরে এমন আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম যে, রাত্রে আর আসর ছেড়ে উঠতেই পারলাম না। এই আসছি। নারায়ণও সমানে জেগেছে সারা রাত আমার সঙ্গে।

—নারায়ণ !

—হ্যাঁ। কী যে হলো, একা ঘরে বসে আমি রেওয়াজ করি তো, ও এসে শুয়ে থাকে ওর বিছানায়। আজ দেখলাম অদ্ভুত ওর মনের অবস্থা ! বললে—ঘুমোবো না নটরাজন, সারা রাত তোমার গান শুনবো। হ্যাঁ, তা গানের পর গান শুনে গেছে। আমিও শ্রোতা পেয়ে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম,—শ্রোতা থাকে না বুঝি ?

একটু হেসে বললো—প্রথম রাত্রিতে দুটি-একটি মেয়ে এসে বসে, কিন্তু ওদেরই বা অবকাশ কই ? তাই একাই বসে বসে সুর তুলি। নারায়ণ কাল আমার এক পুরানো প্রিয় গান মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। বলল—'সেই গানটা গাও নটরাজন। সেই কৃষ্ণচূড়া ফুলের গান।' হ্যাঁ বাবুজী, আমাদের দক্ষিণদেশীয় প্রাচীন কবির এক গান আছে, যার ভাবার্থ হলো—দেবতার মাথার ফুল কৃষ্ণচূড়া, তাকে মাথায় রেখো, কখনও পায়ে ফেলে দলে-পিষে নষ্ট ক'রো না।

কী জানি কী হলো মনের মধ্যে, একটু হেসে হালকা সুরেই বলে উঠলাম,—শেষকাল ফুলের গান ?

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে চকিতে তাকালো নটরাজন, তারপরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—হ্যাঁ ফুলের গান। ও-বাড়িতে ফুলের নামই যখন সব, তখন ফুলের গানে আর আশ্চর্যের কথা কী ?

স্থান কালপাত্র অনুসারে কোনও প্রয়োজনই ছিল না ও-প্রসঙ্গ তোলার। তবু, কী আশ্চর্য, আমার মতো স্থূল স্বভাবের বাস্তববাদী লোকের মনও অনুভূতিপ্রবণ হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। মনের মধ্যে কী একটা সন্দেহ মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকের মতোই রেখান্বিত হয়ে উঠলো। বললাম,—কাল কারও নাম ছিল নাকি কৃষ্ণচূড়া ফুল ?

নিদারুণ চমকে যেন কেঁপে উঠলো নটরাজন, তারপরে সবিস্ময়ে বলে উঠলো—কী বললেন বাবুজী ?

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললাম,—না না, কিছু মনে ক'রো না, এমনিই বললাম কথাটা, মানে, হঠাৎই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

একটু হেসে জানলার কাছে সরে গিয়ে ঈষৎ চাপা স্বরে নটরাজন বললে,—সত্যি কথাই মুখ দিয়ে বেরিয়েছে আপনার। আপনি হয়তো ওদের সব নিয়ম-কানুন জানেন না। আসল কথা, কাল ভোরে এসে সবে পৌঁছেছিল সরোজা, অথচ কালই সে মন্দিরের সরোবরে স্নান করে পুজো দিয়ে ওদের যা করণীয়, তা করবার ব্রত গ্রহণ করেছিল, অর্থাৎ নিয়েছিল ফুলের নাম। আর সেই ফুলের নাম হচ্ছে কৃষ্ণচূড়া। নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কী করে জানলে ? তোমার তো জানবার কথা নয়। না, সত্যিই আমি জানতাম না, ঘটনাচক্রে জেনে ফেলেছিলাম। আমি তখন নারায়ণের কাছে বাইরের ঘরে বসে। কে একজন এসে কৃষ্ণচূড়ার নাম বলে ভিতরে চলে গেল। লাল-খেরো-বাঁধানো খাতাটায় সেই নামটা লাল কালি দিয়ে কাটতে গিয়ে রীতিমতো হাত কাঁপছিল নারায়নের। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কী হল তোমার ? আর আশ্চর্য, কেমন যেন ধরা গলায় সে বললে—কিছু না। আমি ঝুঁকে পড়ে নামটা পড়তে গিয়ে দেখি, কৃষ্ণচূড়া হচ্ছে সরোজা।

বললাম,—তা সরোজার ব্যাপারে নারায়ণের এমন হলো কেন ?

নটরাজন বললে,—সে এক অদ্ভুত ঘটনা। পরে বলবোখন আপনাকে। কিন্তু ভোর হয়েছে, ওঁর মুখে একটু গঙ্গাজল দিলে ভাল হতো।

—কার মুখে ?

—সরস্বতী আম্মার।

বলতে বলতে বৃদ্ধার কাছে এসে দাঁড়ালো নটরাজন। তেমনি নিঃঝুমের মতোই এক ভাবে পড়ে আছেন। ওঁর কপালে আর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কী যেন দেখছিল নটরাজন, বললে,—আমার কী মনে হচ্ছে জানেন ? মহাযাত্রা ওঁর আসন্ন।

—কী বলছো তুমি !

একটা নিশ্বাস ফেলে নটরাজন বললে,—হ্যাঁ, তাই আমার মন বলছে। তাই গঙ্গাজল মুখে দিতে চাই। ওঁর মেয়ের মতো উনিও দেববধূ ছিলেন, ওঁরও সেই ছোট বয়সে দেবতার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল।

—কিন্তু পাবে কোথায় গঙ্গাজল ?

নটরাজন বললে, শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের পাশে যে ঝিলটি আছে, লোকের বিশ্বাস, তাতে গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতীর অন্তঃসলিলা ধারা এসে মিশেছে। দাঁড়ান, আমি গিয়ে নিয়ে আসছি।

অন্তরাল থেকে সবই শুনছিল ভামতী। পাশের ঘর থেকে উন্মত্তের মত ছুটে এলো সে, নটরাজনকে উদ্দেশ ক'রে বলে উঠলো,—ঠিক বলছো, মা আর বাঁচবে না ?

ওর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে আমার দিকে তাকালো নটরাজন, বললে,—আপনি এখন ওদের ছেড়ে যেন যাবেন না বাবুজী, আমি আসছি।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম,—আমি বলি কী, তুমি বরং ডাক্তারকে খবর দিয়ে এসো।

বললে,—বেশ। পথে ডাক্তারের বাড়ি পড়বে, আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চলে গেল। তবে কি সত্যিই বৃদ্ধার মহাযাত্রা আসন্ন ? ভামতী ওঁকে আকুল হয়ে ডাকতে লাগলো—মা—মা !

চোখ খুলে প্রসন্ন দৃষ্টিতেই তাকালেন মেয়ের দিকে, কী যেন বলবারও চেষ্টা করলেন, কিন্তু মুখে ফুটলো না কোনও কথা।

ঘরে আর কেউ নেই। বৃদ্ধা আর ভামতী। কী এক অদৃশ্য টানে ওঁর শিয়রের কাছে বসে পড়লাম এক সময়ে, ঠাণ্ডা কপালটায় ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিতে লাগলাম হাত।

বাক্‌রোধ হয়ে গেলেও জ্ঞান তখনও হারান নি, চোখ ঘুরিয়ে একবার যেন দেখবার চেষ্টা করলেন আমাকে।

বললাম,—কেমন বোধ করছেন ?

বোধ হয় কানেও গেল আমার কথা, ডান হাতখানা কোনক্রমে তুলে নিয়ে এলেন নিজের গলার কাছে, যেন বলতে চাইলেন,—কী হলো আমার ! গলার স্বর ফুটছে না কেন ?

বললাম,—ভাববেন না, এখুনি ডাক্তার এসে পড়বে।

যেন নিস্তেজের মত পড়ে রইলেন বৃদ্ধা, ভামতী ওঁর পায়ের উপর মুখ রেখে কাঁদছিল, এক সময় মুখ তুলে তাকালো মায়ের দিকে, তারপরে আমাকে উদ্দেশ করেই বলে উঠলো—দেখলে তো ? আমার পাপের ফল ! নবগ্রহমূর্তিকে

লুকিয়ে কিছু করতে ভয় করে, তবু আমি করেছি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে, কিন্তু তার ফল যাবে কোথায়? মাকে যে চলেই যেতে হবে।

মৃদু কণ্ঠে বললাম,—আবার বলছি, তোমাদের এসব সংস্কার আমি মানি না। আর তা ছাড়া, ডাক্তার আসুন, কিছু যে একটা ঘটবেই, এর কী মানে আছে?

বললে,—আমি জানি। মা আর থাকবে না।

মহিলাটি আমার সত্যিই কেউ নন, কিন্তু ভামতীদের এই যে সংস্কারাচ্ছন্ন ভাব এই যে অন্ধ বিশ্বাস, এর বিরুদ্ধে আমার মনটা যেন রুখে দাঁড়ালো। এই যে ভামতী বার বার বলছে আমাকে গোপনে ওর নাম বলে দেওয়া ওর কাছে পাপ, —মনে হতে লাগলো, তার সঙ্গে আমারও গুরুতর কোনো অপরাধ জড়িয়ে আছে। আর এটা যতই মনে হতে লাগলো, ততই মনে হলো, জয়ী আমাকে হতেই হবে, বাঁচাতেই হবে মহিলাটিকে।

ডাক্তার এসে ইন্‌জেকশন দিয়ে গেলেন, বোধ হয় 'কোরামিন', হার্টের জন্য। বললাম,—কেমন বুঝছেন?

ডাক্তার যা বললেন তাতে বুঝলাম, অবস্থাটা খুবই খারাপ। তবে উপযুক্ত শুশ্রূষা অনেক সময় অসাধ্যও সাধন করতে পারে!

দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় মনকে বাঁধলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, অসাধ্যই সাধন করবো। রইলো পড়ে আমার কাজ, রইলো পড়ে ঘনশ্যামদাসজী, তার ছেলে রামদাস আর পাম্বলু। আমি এ-বাড়ি ছেড়ে কোথাও নড়বো না, যতক্ষণ না সেরে ওঠেন।

পরদিন এসেও ছিল পাম্বলু আমার খোঁজে, বললে,—রামদাসজী এসেছেন। আপনার খোঁজ করছেন।

বললাম,—করুন খোঁজ। আমি এখন যেতে পারবো না।

তারও পরের দিন। পাম্বলু এসে বললে,—আজও যাবেন না?

—না। তাঁর দরকার, তিনি আসুন।

পাম্বলু বললে,—কে? রামদাসজী? তিনি আসবেন না। কিন্তু শেঠজী যে চলে যাচ্ছেন!

—তাই নাকি!—বললাম,—তা হোক, তবু যাবো না। বরং তাঁকে আসতে বলো।

পাম্বলু তাড়াতাড়ি দু কানে দুটি আঙুল ছুঁয়ে বলে উঠলো,—সর্বনাশ। ছেলে যে সব শুনেছে! বাবাকে কি আর এদিকে আসতে দিতে পারে!

পরের দিন অবশ্য পাম্বলু আর আসে নি। কিন্তু আমার ব্যাপার দেখে বোধ হয় চমৎকৃতই হয়েছিল নারায়ণ আর নটরাজন। এই চারটে দিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে ডুবিয়ে রেখেছিলাম নিজেকে। এ অঞ্চলের সব থেকে বড় ডাক্তারকেই ডেকে এনেছিলাম নিজে গিয়ে নারায়ণের সাহায্যে। তাঁর সঙ্গে অনুক্ষণ যোগাযোগ রাখা, রোগীর শিয়রে বসে দিন-রাত সেবা করা!

আচ্ছন্নের মত সর্বক্ষণ সরস্বতী আম্মা পড়ে আছেন বটে, কিন্তু জ্ঞান হারান নি একেবারে। তাই আমি কে, আমার সঠিক পরিচয় না জানলেও, আমার সেবার মর্মটা বুঝতেন। এমন হলো, নিজের মেয়ের থেকেও আমাকে যেন খুঁজতেন বেশি।

অভিভূত হয়ে নারায়ণ একদিন আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরেছিল মনে আছে, বলেছিল,—তুমি কে ভাই? এমনটি কখনও দেখি নি।

আমি একটু হেসে বলেছিলাম,—ভাই বলে ডেকেছো, মনে থাকে যেন!

—হ্যাঁ! আজ থেকে তুমি আমার ভাই, আমার পরমাত্মীয়।

নটরাজন একান্তে একদিন ডেকে নিয়ে বললে,—আপনার সেবার জন্যই এখনও বেঁচে আছেন। বাস্তবিকই, আপনার ভালবাসাকে আজকের দিনে প্রণাম জানাতে ইচ্ছা করে।

ওদের সেই চৌকো উঠোনের এক কোণে বসে ছিলাম দু জন। ওর কথায় একটু অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকালাম, বললাম,—এর মধ্যে ভালবাসাটা আবার দেখলে কোথায় নটরাজন? মানুষ মানুষের জন্য যদি একটু না করে, তো, চলবে কী ক'রে?

নটরাজন একটু হাসলো, বললে,—আর 'আপনি' করে বলবো না—'তুমি'। দেখ, এ কয়দিনে আমাদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা হয়েছে, তা তো অস্বীকার করতে পারবে না? সেই অধিকারেই বলছি, দেখবার চোখ আমাদের দিয়েছেন ভগবান, মনও দিয়েছেন অনুভব করবার।

বললাম,—ভূমিকা রেখে দাও, বলতে চাও কী?

বললে,—শুনবে বন্ধু? আমিও খেয়ালের বশে একদিন এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। আমিও বিদেশী। তামিলনাদের লোক। আমিও তোমার মতো এমনি ক'রে একটি মেয়ের মায়ায় পড়ে গিয়েছিলাম।

—বটে? কে সে?

অল্প একটু হেসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নটরাজন বললে,—'সে' তো

এখানে বড়ো নয়, বড়ো হচ্ছে, 'তাকে' উপলক্ষ ক'রে আত্মবিকাশ। সেটা আগে শোনো ?

—বলো।

একটুক্ষণ চুপ করে থেমে রইলো নটরাজন, যেন ফেলে-আসা সেই দিনগুলির স্মৃতির প্রবাহে অবগাহন করলো কয়েক মুহূর্ত, তারপরে সুপ্তোত্থিতের মতোই বলে উঠলো,—জানো ভাই, আশ্চর্য এই ওদের রীতি-নীতি। ঐ যে ফুলের নাম করার নিয়ম, ওর বোধ হয় উদ্দেশ্যই হচ্ছে, মনের টানকে বাড়তে না দেওয়া। কিন্তু মনের ধর্মে আমি শিল্পী, আমি ভাবুকতায় আচ্ছন্ন, আমার মন তাতে কিছুতেই মানলো না।

—তারপর ?

বললে,—ওই সরোজাকে নিয়ে ঘনশ্যামদাসবাবুর কথা তো শুনেছো। ওঁর ছিল অগাধ পয়সা, তাই বাড়ি-ঘর-দোর সব কিনে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারলেন তিনি। মেয়েটিকেই তিনি নিয়ে যেতে পারলেন। কিন্তু আমরা ?

প্রশ্ন করলাম,—বলবে না, কে সেই মেয়েটি ? এই নজনের মধ্যে একজনই তো হবে ?

ওকে এই প্রশ্ন করলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল ভামতীর কথা। ভামতীও একদিন ওর সম্বন্ধে এমনি এক সন্দেহের কথাই বলেছিল,—নিশ্চয়ই এখানে কেউ আছে ওর, নইলে এমন ক'রে এখানে ও থাকতে পারতো না।

আমার কথায় আবার একটু হাসলো নটরাজন, বললে,—বার বার একই কথা জানতে চেও না। কী হবে নাম দিয়ে ? যদিও আমার সব অনুপ্রেরণাই তাকে কেন্দ্র করে জেগে উঠেছে, তবু আজ সে আমার কাছে 'একা' একটি মানুষ নয়, এখানকার সবার ওপরই আজ আমার সমান স্নেহ। আমার 'স্নেহ' শব্দটা তুমি লক্ষ্য ক'রো। আমি নারায়ণের ওখানে যাই শিক্ষক হিসাবে, অতিথিরূপে কখনও নয়। সে প্রয়োজনও কখনও বোধ করি না।

একটু অবাক হয়েই তাকালাম ওর মুখের দিকে। আমার সে দৃষ্টি লক্ষ্য করেই আবার ও একটু হাসলো, বললে,—না ভাই, মিথ্যে কথা আমি বলছি না। এ যে কত বড়ো সত্য, তা হয়তো তুমিও একদিন বুঝতে পারবে।

বললাম,—তা হলে বলো, তুমি অতি মহৎ ব্যক্তি, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ।

হেসে উঠল হো-হো ক'রে, বললে,—মোটেই জিতেন্দ্রিয় নই। আচ্ছা, একদিন রাত্রে তোমাকে আমার কাছে বসতে দেবো, আমি যখন আমার বীণায়

হাত দিয়ে সুরের মধ্যে ডুবে যাবো, তখন আমার দিকে তাকিয়ে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে, আমি কী বলতে চাই। ওখানে নারায়ণের যে নিজস্ব ঘরখানা আছে, তুমি দেখ নি সে ঘরখানা। আমি সেখানেই বসে রাত্রে রেওয়াজ করি।

—মেয়েদের শেখাও কখন ?

—সকালে।

—আর রাতে ?

—সম্পূর্ণ নিজের। আমি আর আমার বীণা। না না, আমার নিজস্ব বীনা-খানি তুমি দেখ নি, সেটি নারায়ণের ঘরে রেখে দিয়ে এসেছি সযত্নে।

—এখানে রাখোনি কেন ?

একটু থেমে তারপরে বললে,—ছিল। কিন্তু আর এখানে বসে বীনায় হাত দিতে পারবো না। আমার বীণা বড় স্বার্থপর।

বলেই একটু হাসলো নটরাজন, বললে,—সমস্ত মন-প্রানটা বীণায় অর্পণ না করলে সে সাড়া দেয় না। এখানে আর সেটা হবার জো নেই, মনঃসংযোগ করতে পারি না।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো নটরাজন, তারপরে একটিও কথা না বলে আপন মনেই চলে গেল অন্যদিকে।

সেদিন সকালের দিকে রোগীর ঘরে আমি একা বসে আছি চুপচাপ। ভামতীকে দেখলাম, একসময় স্নান সেরে পিঠে খোলাচুল এলিয়ে দিয়ে ঘরে এসে দাঁড়ালো। মায়ের কাছে এসে বসে মাকে পরীক্ষা ক'রে, তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো,—আজ একটু ভাল আছে, না ?

—হ্যাঁ। তাই তো মনে হচ্ছে।

বললে,—প্রদীপ যেমন নিভে যাবার আগে দপ করে জ্বলে ওঠে, এ-ও হচ্ছে তাই। আমি জানি, মা আর বাঁচবে না, মা যাবেই।

ভিতরটা অকস্মাৎ কেঁপে উঠলো, কণ্ঠে জোর এনে বললাম,—কখ্খনো না। হতেই পারে না তা। তুমি ও-ভাবে বলবে না কখনও।

আমার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপরে বললে,—তুমিই বা কী অদ্ভুত মানুষ, এখানে এভাবে পড়ে আছো কেন ?

—এমনি। এমন রোগীকে ফেলে আমি যাই কেমন ক'রে ?

বললে,—তাই কী ? রোগীকে দেখবার লোকের কি অভাব আছে এখানে ?

—না, তা নয়, তবু—

কেমন যেন ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠলো মুখে, বললে,—জানি, কেন তুমি এখানে আছো।

—কেন ?

আমার চোখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত, অদ্ভুত স্নেহ-ঝরা দুটি চোখের দৃষ্টি। তারপরে কোমল অথচ আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলো,—এতো ভালবাসছো তুমি আমাকে !

রাগ করে উঠে দাঁড়ালাম,—যত সব কল্পনা ! ভালবাসা আবার কোথায় ? নিছক একটা কর্তব্যবোধ।

—তাই বুঝি ?

বললাম,—শোনো। আমি একটু বাসা থেকে ঘুরে আসছি। ওদিককার খবরও যে রাখি না অনেক দিন। পাম্বলু তিন দিন এসে ঘুরে গেছে।

—যাচ্ছো ?

—হ্যাঁ।

আর কোনদিকে না তাকিয়ে, বিন্দুমাত্র কালক্ষয় না ক'রে, তাড়াতাড়ি চলে এলাম বাইরে।

বাসায় ফিরে প্রথমেই দেখা হয়ে গেল ঘনশ্যামদাসজীর ছেলে রামদাসজীর সঙ্গে। পাম্বলু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে-ই আলাপ করিয়ে দিলো। ছিমছাম স্যুট-পরা পরিচ্ছন্ন কর্মঠ চেহারার ব্যক্তি। বয়স তিরিশের কাছাকাছি যেতে এখনও বাকি, কিন্তু চলনে-বলনে এমন একটা ভারিক্কী ভাব এসে গেছে, যে, যে-কোন গুরুদায়িত্বের ভার বহনে এখুনি তার দেহ-মন-প্রাণ সর্বতোভাবে প্রস্তুত। নমস্কার জানিয়ে বললেন,—তিন দিন ধরে আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছি। আজ হয়ে গেল।

হাসিমুখে বললাম,—দুজনের স্বার্থ যে একই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে, দেখা একদিন হতেই হবে।

হাস্য-পরিহাসবোধ অবশ্যই আছে ভদ্রলোকের, সহজ বন্ধুত্বের সুরেই বলে উঠলেন,—ব্যবসায়িক স্বার্থের কথা বলছেন ? ও তো আছেই। আপনার সঙ্গে আমার দরকারটা ব্যক্তিগত। কিন্তু আজ নয়। রোগীর সঙ্গে এ কয়দিন যুঝে-যুঝে আপনি ক্লান্ত, আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। আরাম করে নিন, পরে কথা হবে।

বললাম,—কিন্তু আমার সব খবরই রেখেছেন দেখছি যে !

হেসে বললেন,—অপরাধ নেবেন না। এখানে আমি এখন থাকবো ঠিক করেছি। সমস্ত পরিস্থিতিটাই তো আমাকে বেশ ক'রে বুঝে নিতে হবে, কী বলেন ?

—তা অবশ্য।

বলে, আর কথা না বাড়িয়ে, সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলাম আমি। এটুকু বুঝলাম, রামদাস শুধু শিক্ষিতই নয়, বুদ্ধিমানও বটে। 'চতুর' বললে কথাটা খারাপ শোনায়, কিন্তু লোকটি আর যাই হোক, ঠকবার পাত্র নয় বা হটবার পাত্রও নয়।

একটু পরেই চুপিচুপি ওপরে উঠে এলেন স্বয়ং ঘনশ্যামদাসজী। এ কয়দিনেই স্বাস্থ্য যেন ভেঙে পড়েছে। ঝঞ্ঝাহত, বিপর্যস্ত, অসহায়। বললেন,—আমার ছেলে আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে বাবুজী। আজই বিকেলে রওনা ক'রে দিচ্ছে। বলছে, আর দেশ থেকে ফিরতে দেবে না।

বললাম,—তা হলে আপনার ব্যবসা, আপনার সম্পত্তি ?

বললেন,—সব হয়তো বিক্রি করে দেবে।

—আপনার মত আছে তাতে ?

বললেন,—আমার পড়ি-লিখি জোয়ান ছেলে, ও যা করবে, তাতে কি অমত করা আমার সাজে ?

সায় দিয়ে বললাম,—তা তো বটেই।

বললেন,—আচ্ছা, আরাম করুন বাবুজী, আমি পরে আসবো।

'আরাম' করা অবশ্য বেশীক্ষণ হলো না, এলো পান্থলু। বিরস তার মুখ। বললে,—খবর খুবই খারাপ বাবুজী। উনি চলে গেলে এখানকার কাজকর্মও বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলেপিলে সংসার নিয়ে খাবো কি ? আবার কি ভাইজাগে যেতে হবে স্টিভেডোর-ফার্মে বিল টাইপ ক'রে দিন কাটাতে ?

কথাটা মনে হতেই হেসে ফেললাম, বললাম,—না পান্থলু, নিষিদ্ধ বস্তু'র নাম টাইপ ক'রে পাপ অর্জন করতে হবে না তোমাকে।

—তবে ?

বললাম,—কিছু ভেবো না। ব্যবসায়ী কখনও ব্যবসা তুলে দিতে পারে না। ঘনশ্যামদাসজী না থাকেন, ওঁর ছেলে থাকবেনই, দেখো।

—এখানে স্থিতি হয়ে ?

—হ্যাঁ। তুমি দেখে নিও।

বলেই টেবিলে অপেক্ষমান এ কয়দিনের জমানো ডাকের চিঠিগুলি নিয়ে পড়লাম। পান্থলু বললে,—যাই বাবুজী। রামদাসবাবুর সঙ্গে বেরুচ্ছি।

—কোথায় ?

যে-সব জায়গায় আপনি প্রস্‌পেকটিং করেছেন, সে-সব জায়গায় উনি ঘুরে ঘুরে দেখবেন বলছেন।

বললাম,—তা ভালই তো! আমাদের ফার্মের সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজের যে ব্যবসাটা ঘনশ্যামদাসজী চালাবেন বলে প্রস্তাব করেছিলেন, ওইটাই বুঝি ঠিক করতে চান ?

পান্থলু বললে,—হ্যাঁ, বোধ হয় তাই হবে।

বললাম,—তবে ? বড় যে চাকরি যাবার ভয় করছিলে ?

আজ্ঞে, বাবুজী, প্রসপেক্‌টিং ক'রে যে-দরের জিনিস পাওয়া গেছে, তাতে যদি উনি খুশি না হন ?

একটু হেসে বললাম,—হবেনই। ব্যবসায়ী লোক, রত্ন চিনতে ভুল করবে না।

কথাটার মধ্যে ভিন্ন কোন অর্থের আভাস লক্ষ্য করে পান্থলু যেতে-যেতেও ঘুরে দাঁড়ালো, বললে,—আজ্ঞে ?

আবার হাসলাম,—বয়সে তরুণ। দেবীপল্লীর রত্নের প্রস্‌পেক্‌টিংয়ে নিয়ে যাও না ? তারপরে তোমার চাকরি ঠেকায় কে ?

উত্তরে বিরসমুখেই পান্থলু বললে,—বড় শক্ত ঠাঁই।

—কী রকম ?

চাপা কণ্ঠে পান্থলু বললে,—আসামাত্রই ঠারেঠুরে একটু-আধটু ইঙ্গিত করেছিলাম। সেয়ানা লোক, বুঝেছিল ঠিকই। বললে ওখানকার এস্টাব্লিশমেণ্টের কাগজপত্র নিয়ে আসুন। ওসব পাট আমি একেবারেই তুলে দেবো।

—তারপর ?

—আপাতত ব্যাপারটা চাপা পড়ে আছে। এখন তো আপনার পাহাড়-পর্বতের প্রসপেক্‌টিংয়েই চললাম।

হেসে বললাম,—এসো। তোমার পথ শুভ হোক।

চলে গেল পান্থলু। অফিসের জরুরী চিঠিপত্রগুলো পড়ে এবং কিছু টুকিটাকি কাজ সেরে বেরিয়ে পড়লাম হোটেলের উদ্দেশে। কাছেই হোটেল। ফিরে

আসতে বেশী সময় লাগলো না। এসে, বিছানার উপর ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছি, রাত্রিজাগরণে চোখ ভারী,—ঘুম আসছে, আবার আসছেও না, কী-এক চিন্তায় এলোমেলো হয়ে আছে মন। মনের এই ভার-হয়ে-হয়ে-থাকা, কিছু ভাল-না লাগা, অকারণ এক দুশ্চিন্তার পীড়া,—এর সঠিক কারণটা যদি নিজেই বিশ্লেষণ করতে পারতাম তো ভারমুক্ত হওয়া যেতো। বার বার ঘুরে ফিরে ভামতীর কথাই মনে জাগছে বটে, কিন্তু নিজের চিন্তাধারার মধ্যে দুটি বিপরীত স্রোত লক্ষ্য ক'রে নিজেই অবাক হচ্ছি। একবার মনে হচ্ছে, ভামতী ছাড়া আমার জীবন অর্থহীন! আবার সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হচ্ছে,—এ কী মোহের জালে জড়াচ্ছি নিজেকে! এর থেকে যত তাড়াতাড়ি ছুটি পাই ততই ভালো। ওর সেই একটি কথাই বার বার মনের মধ্যে গুমরে উঠছে, তুমি কবি—তুমি কবি!

অস্বস্তির আর সীমা নেই। শুয়ে থেকেও মনে হচ্ছে, অজস্র কাঁটা কে যেন ছড়িয়ে রেখে গেছে আমার শয্যায়, যতই পাশ ফিরি, দংশনের জ্বাল থেকে মুক্তি নেই।

কতক্ষণ যে এ-ভাবে কেটে গেছে কে জানে! ঘুমও আসছে শরীরও শ্রান্ত, অথচ মন চায় না স্থির হতে।

—বাবুজী!

—কে?—চমকে, দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি, চুপচাপ আমার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন স্বয়ং ঘনশ্যামদাসজী। শরীর-মনের সেই বিশ্রামের অবকাশে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে ওঁকে কাছে পেয়ে ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত উল্লসিতই হয়ে উঠলাম আমি।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। উনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন,—আপনি শুয়ে থাকুন, আমি আপনার কাছে এই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসছি।

—তাতে কী হয়েছে! বসুন আপনি।

বসে একটু দম নিয়ে তারপরে বললেন,—বাবুজী, খবর তো সবই শুনেছেন।

বললাম,—আপনার বাচ্চুর খবর?

সোজা হয়ে বসলেন, কণ্ঠস্বর ধরা-ধরা, বললেন,—ও চলে গেছে, আর আমার সব-কিছু আঁধার হয়ে গেছে! নইলে—।

থেমে গেলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উনি কোনও কথা বলতে পারলেন না, আমিও না। নীরবে পার হয়ে গেল কয়েকটা মুহূর্ত।

একসময় ওঁর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হলো, কী অব্যক্ত বেদনায় যে ওঁর ভিতরটা গুমরে মরছে, তা যেন বুঝতে পেরেছি। কিন্তু পারলাম কেমন ক'রে? যে গভীর অনুভূতি আর মমতা দিয়ে সংবেদনশীল মানুষ মানুষের মন বুঝতে পারে, আমার তো তা নেই, ছিলও না। চিরদিন কাজ আর জীবনের বহিরঙ্গ অধ্যায় নিয়ে মেতে আছি, অন্তরে গহীন স্রোতের অবগাহনের মানুষ তো আমি নই। তবে?

কী আমার হলো? বার বার অন্তর্মুখী কেন হতে চাইছে আজ আমার মন? এ একধরণের আনন্দও বটে, জ্বালাও বটে।

সব-কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পার হয়ে অবশেষে বলেই উঠলাম,—ঘনশ্যামদাসজী?

—বলুন।

বাঁকা একটু হেসে বললাম,—সরোজাকে ছেড়ে ছিলেন যে বড়ো?

—আরে, চুপ চুপ,—ঘনশ্যামদাসজী চাপা কণ্ঠে বলে উঠলেন,—ছেলে টের পেলে কি আর রক্ষে থাকবে? আমার 'পড়িলিখি' ছেলে—চাঁদির টুকরো। ওর কাছে কেউ না। দিলাম মেয়েটাকে তাড়িয়ে।

এত সহজভাবে কথাটা উনি বললেন যে, আমি চমকে উঠলাম মনে মনে। তবে কি সত্য অনুভূতিটুকুর সাড়া জাগে নি আমার মনে? জানতে কি তা হলে আমি পারি নি ওঁর অন্তরের গভীরতম বেদনার বাণীটুকু?

বললাম,—মনে কষ্ট হলো না? শুনেছি, খুবই নাকি ভালবাসতেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—আর আমার বাচ্চুই যদি চলে গেল গণেশজীর বাহনই যদি চলে গেল তো, কী হবে আমার আর সবাইকে নিয়ে?

মনে হলো, তাই কি সত্যি কথা? সরোজার থেকে বাচ্চু বড়ো? প্রেমের থেকে সংস্কার বড়ো? পরক্ষণেই শান্ত হয়ে গেল মন, হতেও পারে। আমারই বা মনে কেন জেগে উঠেছে এই সব প্রশ্ন? তবু বলে উঠলাম,—সরোজা কোথায় গেল জানেন তো?

—তা আর জানি না!—ঘনশ্যামদাসজী বললেন,—সেই 'দেবীপল্লী'তেই গেছে। ওর যে আমি সবই জানতাম। শুনবেন তবে? মনে মনে ও ভালবাসে ওই নারায়ণকে।

—ভালবাসে!

—হ্যাঁ বাবুজী। দেখা হলে মুখেই দুজনার ঝগড়া, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে

অদ্ভুত টান। যখন ওকে নিয়ে আসি এখানে, নারায়ণ আসতে দেবে না, তখন সে কী ওর ঝগড়া! যা-তা বলে এসেছিল নায়াণকে। আর কী আশ্চর্য ব্যপার জানেন? আমার বেশ মনে আছে, নারায়ণ যেন ওর সামনে কুঁকড়ে গেল ভয়ে। আমি অবশ্য ওসব বুঝি-টুঝি না। ঐ বাড়ি, বাগান-টাগান, সবই একদিন কিনে নিলাম।

—এখন নাকি বিক্রি করে দেবেন।

একটু থেমে তারপর বললেন,—হ্যাঁ, তা দেবো। আর যদি বিক্রি করে দিতে না পারি তো, ওদের তাড়িয়ে ওখানে একটা ধর্মশালা বানিয়ে দেবো।

একটু আশ্চর্য হয়েই বললাম,—তা হলে ওরা যাবে কোথায়?

—যেখানে খুশি! যেখান থেকে সব এসেছে, সেখানে যাবে।

—যদি সমাজ ঠাঁই না দেয়, তবে?

—সে ওদের সমাজ, ওরাই ভাল বুঝবে। আমার ও নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই। কিন্তু বাবুজী, আপনাকে চুপি চুপি একটা কথা বলি, ওই সরোজা মেয়েটি কী বেইমান জানেন?

—কী রকম?

ঘনশ্যামদাসজী চাপা উত্তেজনায় যেন কাঁপছেন, বললেন,—আমি কত টাকাকড়ি দিতে চাইলাম, নিলো না। বললাম, তা হলে একটা বাড়ি কিনে দিই তোমার নামে। তা-ও নিলো না। শুনলে আশ্চর্য হবেন, কোন গয়না-গাটি বা শাড়ি-টাড়ি কিছুই নেয় নি। নেহাতই নিজের জিনিসগুলি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অবাক হয়ে শুনছিলাম সরোজার কাহিনী। তার বিচিত্র চরিত্রের যে দিকটি প্রকাশ পেল ওঁর কথার মধ্যে, তাতে মেয়েটির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হয়ে উপায় নেই। বললাম,—অদ্ভুত মেয়ে তো!

—অদ্ভুত!—ঘনশ্যামদাসজী বললেন,—ও-রকম একরোখা একগুঁয়ে মেয়ে বোধ হয় তামাম দুনিয়া খুঁজে পাবেন না। এ দেমাক কিসের থেকে জানেন?

—কিসের থেকে?

বললেন,—প্রেম। ওই নারায়ণ।

বললাম,—তা যদি হয় তো, এ-ও এক আশ্চর্য কাহিনী ঘনশ্যামদাসজী!

—তা হবে।

আর বিশেষ কিছু না ব'লে কিছুক্ষণ পরেই বিরসমুখে উঠে গেলেন ঘনশ্যামদাসজী।

উনি গেলেন বটে, কিন্তু আমার মনে রেখে গেলেন এক অপরূপ বিস্ময়ের ছায়াপাত। সরোজা মেয়েটি আর নারায়ণকে নিয়ে যে ইঙ্গিত উনি করে গেলেন, তা অনুধাবন ক'রে মনে মনে পৌছানো যায় অপূর্ব এক মাধুর্যের রাজ্যে। নারায়ণকে ভালবাসে, অথচ তাকে ছেড়ে ঘনশ্যামদাসজীর কণ্ঠলগ্ন হওয়া, এ যেন 'ত্যাগ করে ভোগ করা'র মতো অবস্থা! অন্য দিকে ঘনশ্যামদাসজীকে যখন ছেড়ে এলো চিরদিনের মতো, তখন সর্পিণীর নির্মোক-ত্যাগের মতো সব-কিছুই মুহূর্তে ত্যাগ করে এলো, তার গয়না-গাটি অশনবসন, সব। ও-মেয়ের পক্ষে অত্যাশ্চর্য ঘটনা নয় কি?

আশ্চর্য ঘনশ্যামদাসজীর মানসিক অবস্থাটাও। যাকে তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে ছেলের কাছে নিজের সম্মান রাখবার জন্য, তাকে তাঁর অদেয় কিছুই ছিল না, বাড়ি-ঘর টাকাকড়ি সবই তো দিতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু সে নিলো না, এই প্রত্যাখ্যানের জ্বালাতেই কি শুধু জ্বলছেন তিনি? আর কোনও জ্বালা নয়? প্রেমের স্বরূপ কী কে জানে, কিন্তু যে মাধুর্য সৃষ্টি করেছিল মেয়েটি তাঁর জীবনে, সেই মাধুরীর ক্ষয় হল অকস্মাৎ, সেই ক্ষয়ের কি জ্বালা নেই? আমি যেন নিজের মন দিয়ে ওঁর মনের হাহাকারকে অনুভব করতে পারলাম!

এই সব ভাবতে ভাবতে বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রাভিভূত হয়ে থাকবো, হঠাৎ একসময় জেগে উঠলাম আচ্ছন্নতা থেকে,-দূর ছাই, এসব ব্যাপার এত গভীর-ভাবে অনুভব করতে শুরু করলাম কবে থেকে? একটা লোক একটি মেয়েকে তার বিলাসের উপকরণ হিসাবে কাছে রেখেছিল কিছুদিন, তারপরে একদিন মেয়েটিকে সে ছেড়ে দিল, এই তো ঘটনা,—এর মধ্য থেকে এত মানসিক দ্বন্দ্ব আর বেদনার সুরই বা অনুধাবন করতে পারছি কেমন ক'রে?

তাড়াতাড়ি উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে টেবিলে বসলাম অফিসের কাগজপত্র নিয়ে। ক্রমশঃ ডুবেই গেলাম কাজে। অর্থাৎ বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল অফিসের কাজকর্মে।

একটা জরুরী চিঠির খসড়া করতে বোধ হয় মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম, সিঁড়িতে হঠাৎ দ্রুত পদশব্দ বেজে উঠতেই উৎকীর্ণ হয়ে উঠলাম। আমারই খোঁজে

ছুটে এসেছে বিশ্বনাথম্, তাড়াতাড়িতে চোখের চশমাটি পর্যন্ত পরতে গেছে ভুলে।

—বাবুজী—বাবুজী!

—কী ব্যাপার বিশ্বনাথম্?

—শীগগির আসুন আপনি। সরস্বতী আম্মা বোধ হয়—

কথাটা শেষ করতে পারলো না সে। আমিও যেন নেমে এলাম এক জগৎ থেকে আর এক জগতে। চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই ঘর, সেই ভামতী আর সেই বৃদ্ধা।

তাড়াতাড়ি জামাটা আলনা থেকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে বললাম,—চলো।

একটু দূর থেকেই দেখতে পেলাম, ওঁর পায়ের কাছে পড়ে কাঁদছে ভামতী, জানলার কাছে বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নটরাজন, আর বৃদ্ধা শীর্ণ হাত কোনক্রমে ওঠাতে চেষ্টা করছেন, পারছেন না।

—মা গো, কথা কও।

মেয়ের আর্ত চীৎকারের উত্তরে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন কী যেন বলবার, কিন্তু স্বর ফুটছে না কণ্ঠে, শুধু চোখের কোণ বেয়ে নেমে আসছে ধারা।

বললাম,—অমন করে কেঁদো না, তোমার কান্নায় ওঁর কষ্ট হচ্ছে, দেখছো না?

অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা তুলে ভামতী বলে উঠলো,—কী হলো মায়ের? কথা বলছে না কেন?

—ভেবো না। ডাক্তার ডেকে আনছি এখুনি।

জানলার কাছ থেকে নটরাজন বললে,—ডাক্তার ডাকতে গেছে নারায়ণ।

—এসেছিল নারায়ণ?

—হ্যাঁ। এই তো এতক্ষণ কাছে ছিল। আমিও এগিয়ে গিয়ে দেখছি।

নটরাজন ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আমি মহিলাটির শুশ্রূষায় মন দিলাম।

ভামতী আবার কেঁদে উঠলো,—আমি জানি, মা আর থাকবে না। আমার পাপ—

—চুপ কর তুমি। —বাধা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে ব'লে উঠলাম,—বলেছি

তো, ওঁকে বাঁচিয়ে তুলে আমি প্রমাণ করে দেবো যে, সমস্তটাই তোমাদের কুসংস্কার।

এর পরে বর্ণনায় বাহুল্য কিছু এনে লাভ নেই, আমাদের সমবেত শুশ্রূষায়, আর ডাক্তারের যত্নে ও চিকিৎসায়, সরস্বতী আম্মা দিনকয়েকের মধ্যেই ধাক্কাটা সামলিয়ে উঠলেন। অর্থাৎ ডাক্তারের ভাষায়,—বিপদ কেটে গেল।

তা অবশ্য গেল, কিন্তু যা রেখে গেল তাও মর্মান্তিক। বাক্‌যন্ত্রের কী উপসর্গ দেখা দিয়েছিল কে জানে, সরস্বতী আম্মা বেঁচে উঠলেন বটে, কিন্তু কথা গেল বন্ধ হয়ে। ডাক্তার বললেন, কিছু ভাববেন না, এটা সাময়িক।

দিন যায়। তেমনি করে বিছানায় এলিয়ে শুয়ে থাকেন তিনি, কিন্তু মাঝে মাঝে চোখের কোণ ওঠে ভিজে। কাছে গিয়ে বলি,—কী হয়েছে?

আকারে ইঙ্গিত বোঝান,—কী হলো আমার, কথা বলতে পারছি না কেন?

নারায়ণ আরও দিন কতকের জন্য ছুটি দিয়েছেন ভামতীকে, অর্থাৎ মায়ের সেবার জন্য ইচ্ছা করলে মায়ের কাছে সে থাকতে পারবে আরও কয়েকটা দিন।

ভামতীকে বললাম,—দেখলে তো? মা সেরে উঠলেন, তোমরা মিছিমিছি একেবারে ভয় পেয়ে—

মুখের দিকে তাকিয়ে শুনছিল আমার কথা, তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—শোনো।

—কী?

নিম্নকণ্ঠে বললে,—পাশের ঘরে যাও।

আজকাল এই-ই হয়েছে ওর রীতি। আমার সঙ্গে একান্তে কোনো কথা বলতে হলে মায়ের সাক্ষাতে বলে না, এইভাবে আড়াল খুঁজে নেয়।

আমি আসবার একটু পরেই ও এলো পাশের ঘরে। বললে—ঠিক বলছো, মাকে নিয়ে আর ভয় নেই?

একটু হেসে বললাম,—আমি কি বলবো, ডাক্তারই তো বলে গেলেন। আর কথা বলতে না-পারা? ওটা অনেক সময় হয়। দিনকয়েকের মধ্যে এটা থেকেও সেরে উঠবেন, তুমি দেখো।

আমার দুটি হাত ধরে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলো,—অসাধ্য সাধন করেছো তুমি। আমরা সবাই জানতাম, মাকে হারাবো।

বললাম,—তা হলে স্বীকার করছো, সংস্কার-টংস্কার সব বাজে! এ তোমার পাপ নয়, কিছু নয়—

যেন শিউরে উঠলো মুহূর্তে, বললে,—ও-কথা বোলো না, পাপ তো নিশ্চয়ই। শুধু তোমারই প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে এ-যাত্রা এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেলাম।

হাসলাম। বললাম,—প্রবল ইচ্ছাশক্তি তা হলে আছে ব'লে স্বীকার করছো তো?

—নিশ্চয়ই আছে।—হাসিতে যোগ না দিয়ে তেমনি গাঢ় কণ্ঠে ভামতী বললে, —শুদ্ধ সত্ত্বা যে তোমার!

পরিহাস-তরল কণ্ঠেই বললাম,—সে আবার কী!

আমার দুটি হাত নিজের গলায় জড়িয়ে নিয়ে বললে,—মা আরও বলতে পারবে। এসব লক্ষণ মায়ের খুব জানা। দেখছ না, মা কী ভীষণ ভালবেসে ফেলেছে তোমাকে। আগে 'নটরাজন নটরাজন' করতো, আর আজকাল তোমাকে নইলে তার একদণ্ড চলে না।

বললাম,—তা অবশ্য! কিন্তু আর নয়, এবার চলি। সন্ধ্যায় আসবো।

অবাক হয়ে বললে,—সন্ধ্যায় আসবে মানে! যাবে কোথায়?

বললাম,—কটা দিন তো এখানে এ-ভাবে কাটলো, এবার বাসায় যাই। অফিসের কাজকর্ম কত জমে গেছে জানো! দু দিন পাম্বলু এসে ফিরে গেছে।

হাত দুটো ধ'রে বললে,—না, কয়েকটা দিন ছুটি পেয়েছি। এই কয়েকটা দিন কাছে থাকো।

বললাম,—কাছেই তো থাকবো। সারাদিনের কাজ সেরে সন্ধ্যায় আসবো।

বললে,—না। যেতে দেবো না।

একটু হেসেই বলে উঠলাম,—পাগল!

দুটি ছলছল চোখ আমার উপর স্থাপিত ক'রে বললে,—পাগল আমি! এ কয়দিন সমানে রাত জেগে চেহারা কী হয়েছে দেখেছো!

—তা হোক। বাসায় গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম দিলে ঠিক হয়ে যাবে।

—এখানে ঘুমানো যায় না!

বললাম,—অফিসের কাজগুলো করবে কে?

—থাক্ না কাজ এ কয়দিন!

ওর কপালের উপর চূর্ণালক এসে পড়ে খেলা করছিল ভোরের ঝিরঝিরে

হাওয়ায়, তার ওপর হাতের ছোঁয়া রাখতেই আমার বুকে মুখ লুকালো। বললাম,—কতক্ষণ আর? দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।

হঠাৎ মুখ তুললো একসময়, গাঢ় কণ্ঠে বললে,—তোমার কাজ-কর্মের খুব ক্ষতি করে দিয়েছি, না?

সস্নেহে বললাম,—দূর পাগল! এসব কথা ভাবতে হবে না। চলি।

প্রায় জোর করেই নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এলাম বলা চলে। বাইরের ঘর থেকে কখন নটরাজন বেরিয়ে গেছে নারায়ণের কাছে। সকালেই তো তার গান শেখানোর পালা। অদ্ভুত গুণী লোক, গানও জানে, নাচও জানে। এবং দুটিই শেখাবার মতো ক্ষমতা রাখে। ওর কথা ভাবতে ভাবতেই কখন যে বাসায় এসে পৌঁছেছি, খেয়াল নেই। পান্থলু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো, বললে,—বাবুজী! ঈস্! আর-একটু আগেও যদি আসতেন!

অবাক হয়ে বললাম,—কেন?

বললে,—এই একটু আগে ঘনশ্যামদাসজী চলে গেলেন।

—চলে গেলেন! কোথায়?

—দেশে। চিরকালের মতো।

—সে কী!

—হ্যাঁ আপনার নামে একটা চিঠি রেখে গেছেন।

—কোথায়?

—ওপরে, আপনার ঘরের টেবিলে রেখেছি।

তাড়াতাড়ি উঠে এলাম ওপরে! আমার ঘরের একটা চাবি পান্থলুর কাছেই থাকতো, কারণ আমার ঘরে বসেই সে আমার কেরানীর কাজটা করে দিতো। সুতরাং ঘর ছিল খোলাই।

দেখলাম,—টেবিলের উপর গালা-দিয়ে-শীল-করা একটা খাম পড়ে রয়েছে।

চিঠিটা তৎক্ষণাৎ না খুলে পান্থলুকে প্রশ্ন করলাম,—চিঠিটা কি টাইপ করা?

পান্থলু বললে,—টাইপ করলে তো আমিই করবো। আমাকে তো দেন নি কিছু টাইপ করতে। আর তা ছাড়া, শেঠজী তো ইংরিজী লিখতেই জানতেন না।

—তা হলে লিখলেন কোন্ ভাষায়?—বলে উঠলাম,—আচ্ছা সে যাক। রামদাসবাবু কোথায়?

পান্থলু বললে,—তিনিও তো বাপের সঙ্গে গেলেন তাঁকে রেল-স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। বাপ রে, তিনটি ট্যাক্সি ভর্তি মালপত্র!

—ট্যাক্সি পেলেন কোথায় !

—শহর থেকে খবর দিয়ে আনিয়েছিলেন।

বললাম,– এত কাণ্ড ! আর আমি কিছুই জানতে পারলাম না ?

পাম্বলু বললে,—আমি বলেছিলাম শেঠজীকে ! আমি কেন, রামদাসজীও বলেছিলেন। তা বললেন—না, বাবুজী যেখানে আছে থাক্, তার আরামে ব্যাঘাত কোরো না।

মনে মনে হাসলাম কথাটা শুনে,—হঁ্যা, আরামই বটে।

মুখে বললাম,—তারপর ?

পাম্বলু বললে,—শুধু যাবার আগে আমাকে ডেকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললেন—এই খামটা বাবুজীকে দিস পাম্বলু।

ততক্ষণে চেয়ারে এলিয়ে দিয়েছি নিজেকে। বললাম,—চিঠি কী ব্যাপার নিয়ে, তা তুমি জানো ?

—না বাবুজী।

বললাম,—আচ্ছা, যাও পাম্বলু। আমি একটু বিশ্রাম করবো।

পাম্বলু,—আজ্ঞে, চিঠিটা ?

একটু হেসে বললাম,—চিঠির ব্যাপারে তোমারও কৌতূহল হচ্ছে, না ?

হঁ্যা, বাবুজী।

—পরে খুলবো। কী আবার, অফিস-সংক্রান্তই কিছু হবে। হয়তো আয়রন কিংবা ম্যাঙ্গানিজ ওরের যে প্রস্পেক্টিং করেছিলাম, সে বিষয় নিয়ে ওঁর আর ব্যবসার ঝুঁকি নেবার ইচ্ছা নেই। অতএব আমারও প্রস্পেক্টিং শেষ। অর্থাৎ পাততাড়ি গুটোতে হবে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে পাম্বলু বললে,—আমার তা মনে হয় না বাবুজী। ঘনশ্যামদাসজী ছেলের কাছে এ সম্বন্ধে টু শব্দটিও করেন নি। রামদাসজী ব্যবসা চালু রাখবেন বলে মনে হচ্ছে।

—তা হলে কী ব্যাপার নিয়ে চিঠিটা লেখা তাঁর !—বলতে-না-বলতেই খামের ধারটা ছিঁড়ে ফেললাম সঙ্গে সঙ্গে। একটা রেজেষ্ট্রিকরা দলিল, আর ইংরেজীতেই লেখা একটা চিঠি।

চিঠিটি সংক্ষিপ্ত : 'বাবুজীর সঙ্গে শেষ-দেখা হলো না বলে দুঃখিত। অনেক কথা ছিল বাবুজীর সঙ্গে। কাল রাত্রে চুপি-চুপি গিয়েছিলাম 'দেবীপল্লী'তে নারায়ণের সঙ্গে সব পাওনা-দেনা চুকিয়ে ফেলতে। ফেলেওছি। কিন্তু যে

দলিলটি নিজের হাতে সরোজাকে দেবো বলে নিয়ে গিয়েছিলাম, তা আর দেওয়া হলো না। দেখা হলো না সরোজার সঙ্গে। প্রথমে মনে হলো, নারায়ণই কায়দা ক'রে দেখা করতে দিচ্ছে না। দেখতে চাইলাম খাতা। তা সে তৎক্ষণাৎই দেখালো। দেখলাম, সত্যিই তার নামটা লাল কালি দিয়ে কাটা। আমি অবশ্য দেখা করতে পারতাম। আমি মালিক, মানি না তাদের আইন-কানুন। কিন্তু নারায়ণের ঘরটা দেখেছেন তো? নবগ্রহের মূর্তিগুলি যেন জীবন্ত মনে হলো। কেমন যেন হঠাৎ ভয় হলো, ওদের নবগ্রহ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা-করা নিয়মগুলি ভাঙতে। চলে এলাম।

'বাবুজী, একবার ভেবেছিলাম দলিলটা নারায়ণের হাতে দিয়ে আসবো। কিন্তু তাও পারলাম না। সরোজাকে ও যে মনে মনে ভালবাসে, তা আমি জানি। সরোজার নাম প্রতি সন্ধ্যায় নিজের হাতে লাল কালি দিয়ে কেটেও যে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে, তাকে নাড়া দেবো, এ শক্তি আমার কোথায়?

'এ দলিলের কপি আমার সিন্দুকে আছে, যথাসময়ে রামদাসের হাতে পড়বে। তাকে মুখে তো এসব বলতে পারি না, কিন্তু দলিলের মারফৎও যে সে এসব ব্যাপার আঁচ করবে এ লজ্জাতেও মরে যেতে ইচ্ছা করছে। ছেলের কাছে—ছি-ছি—এ কী লজ্জা, বলুন তো বাবুজী?

'ভয়ানক রাগ হচ্ছে ঐ মেয়েটির ওপরে। ঐ সরোজা। তাকে একটি দিনের জন্যও অনাদর করি নি, কিন্তু তবু সে কী ভাবে প্রতিশোধ নিলো একবার দেখুন! আমি তাকে নগদ টাকা দিতে চেয়েছিলাম, তা সে নেয় নি। রামদাস এসে পড়বার আগেই বাড়ি দিতে চেয়েছিলাম রেজেষ্ট্রি করে, তাও সে নেয় নি। নিলে ছেলের কাছে এভাবে আমাকে ধরা দিতে হতো না।

'কিছুই সে চায় নি। এই না-চাওয়াটাই তার চরম প্রতিশোধ নেওয়া। বাবুজী, একজন যদি আর-একজনের কাছ থেকে কেবল কিছু পেয়েই যায়, তাতে সে সুখী হয় না, পরিবর্তে সে কিছু দিতেও চায়।

'ভেবেছিলাম, দাম্ভিকা মেয়েটিকে কিছুই আমি দেবো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিতে হলো। না-দেওয়া পর্যন্ত যে আমার সুখ নেই বাবুজী, স্বস্তি নেই।

'তাই দিলাম। বাড়ি-টাড়ি আমার নামেই রইলো, যা পরে ছেলে পাবে, কিন্তু ওই দেবীপল্লীর খরচ-খরচা বাদ দিয়ে, নারায়ণের অংশ বাদ দিয়ে, আমার নিজস্ব যা আয় হতো, তার সব-কিছু স্বত্ব আমি সরোজার নামে সজ্ঞানে লিখে দিলাম। এর সাক্ষী রইলেন আমার এখানকার উকিল, আপনি চিনবেন না, কিন্তু

পান্থলু বা বিশ্বনাথম্, এরা চিনবে। আর সাক্ষী রইলো, এ চিঠি যে আমার হয়ে দিচ্ছে, সে। আপনি তাকে চেনেন ভাল ক'রে—বিশ্বনাথম্। সে আমার অতি বিশ্বস্ত লোক, তাকে আমি কিছু টাকা দিয়ে গেলাম।'

আমার সঙ্গে সঙ্গে পান্থলুও পড়ছিল চিঠিটা। সে এই সময় অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো,—বিশ্বনাথম্!

বললাম,—প্রাইভেটে বি-কম পড়ছে যে ছেলেটা, ঐ যে নারায়ণবাবুর ডান হাত, ওদের এজেন্ট, সেই বিশ্বনাথম্ পুরু কাচের চশ্‌মা-পরা।

পান্থলু বলে উঠলো,—বাহাদুর ছেলে বটে!

আমি ততক্ষণে ডুবে গেছি চিঠিটার শেষ অংশে।

'বাবুজী, যতই রাগ করি, মেয়েটিকে ভোলা আমার পক্ষে কষ্ট হবে। আপনি নিজে ওর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবেন। বিশ্বনাথম্ এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে হয়তো। সে যাতে আমার এই সামান্য উপকারটুকু গ্রহণ করে, সেটা দেখবেন।'—

একটু চমকেই মুখ তুললাম। বিশ্বনাথম্? সে এ-বিষয়ে সাহায্য করতে পারে, এ-কথাটার অর্থ কী? তবে কি ফুলের নাম ছাড়াও গোপনে সাক্ষাৎ করার কোন উপায় জানা আছে বিশ্বনাথমের? দেখতে হবে, জানতে হবে ব্যাপারটা। আবার পড়তে লাগলাম চিঠিটা।

—বাবুজী, ব্যবসায়ী লোক আমি, টাকা-আনা-পাই নিয়ে আমার কারবার। কিন্তু ঐ মেয়েটার সঙ্গে মিশে এইটুকু মনে হয়েছে, মানুষের মন কখনও মরে না। সে ভেঙে পড়ে, কখনও বিকৃত পথও ধরে, কিন্তু আলোর ছোঁয়া পেলে আবার সে জেগে ওঠে। এই আলোর ছোঁয়া হচ্ছে, প্রেমের পরশ। এই 'প্রেম' যে কী, তা আমি বোঝাতে পারবো না, কিন্তু এটুকু বলবো, এতো ক'রেও আমি তা পাই নি, এক বিন্দুও পাই নি। অবশ্য বলবেন, পাবার দরকারই বা কী? দরকার থাকে না, টাকার নেশায়, অন্য নানান নেশায়, মানুষ তার এই সব থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসটির কথা ভুলেই থাকে। কিন্তু যখন মনে পড়ে, তখন?

সে হাহাকারের তুলনা নেই, সে বেদনার কোন উপমাও নেই। আপনি শক্ত মানুষ, আপনার হয়তো আমার মতো অবস্থা কখনও হবে না। তবু বলি, সাবধান। মনের সঙ্গে জড়াবেন না কারুর মন। একজনকে যদি ভালো লেগে যায় তো, তক্ষুণি আর একজনের দিকে ঝুঁকবেন, ভুলেও আর তার সঙ্গ নয়।'

চিঠি শেষ করবার পর, আমি আর পাম্বলু কেউই কথা বলতে পারি নি কিছুক্ষণ। [illegible] কয়েক কাপ চা আনিয়ে খেলাম।

অফিসের জরুরী একটি চিঠির উত্তর লিখলাম। ল্যাবরেটরি অ্যানালিসিস্ অর্থাৎ যাকে বলে 'অ্যাসে-রিপোর্ট', তাই এসেছে অফিস থেকে। আমার পাঠানো ম্যাঙ্গানিজ ওরের নমুনার মূল্যায়ন। খুবই সন্তোষজনক এবং চিঠিটা রামদাসবাবুকে দেখানোও দরকার। ব্যবসা যদি এদিক দিয়ে তিনি করতে চান তো, এই সুযোগ।

কিন্তু বাপকে পৌঁছে তিনি ফিরে আসবার আগেই আমার হোটেল-পর্ব সমাধা হয়ে গিয়ে দিবানিদ্রার পালা চলেছে। ঘুম ভেঙে যখন উঠলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

পোশাকাদি পরিবর্তন করে, খামসুদ্ধ ঘনশ্যামদাসজীর চিঠিটা পকেটে নিয়ে নীচে নেমেছি, দেখি একটি ইজিচেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে অন্ধকার বারান্দায় চুপচাপ শুয়ে আছেন রামদাস। একা।

বলে উঠলেন,—চললেন বাবুজী ?

ভাবলাম, ঘনশ্যামদাসজীর দলিলের কথাটা ওঁকে এখন বলেই ফেলবো নাকি ? পরক্ষণেই মনে হলো সিন্দুক খুললেই তো যথাসময়ে দলিলটার কপি ওঁর চোখে পড়বে। আমি আগে থাকতেই বা বলতে যাই কেন ? মনের ভাব গোপন করে সহজ কণ্ঠে বলে উঠলাম,—একটু পরেই ফিরে আসছি। অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।

—আমারও আছে।

—কী রকম !

রামদাস বললেন,—আসুন ফিরে। পরেই হবে।

চলতে চলতে মনে হলো, দলিলের কথা কি তা হলে ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছে রামদাস ? কে জানে !

এ অবস্থায়, আমার কর্তব্য কী ? আমার কর্তব্য চুপচাপ দলিলটা সরোজার হাতে পৌঁছে দেওয়া। বিশ্বনাথমের সঙ্গে গোপনে দেখা আমাকে করতেই হবে। কিন্তু কে আগে ? বিশ্বনাথম্, না ভামতী ?

ভাবলাম, আগে ভামতীর সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎকার হোক, পরে বিশ্বনাথমের সঙ্গে দেখা করলেই হবে।

গেলাম। বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। গাঢ় হলদে রঙের একটা শাড়ি পরেছে, খোঁপায় হলদে রঙের একবাশ কলকে ফুল। বললে,—জানো? মা কথা বলেছে।

—বলেছেন!

—হ্যাঁ, এসো শীগ্‌গির।

ব'লে আমার হাত ধরে একরকম আমাকে টেনেই নিয়ে চললো ভিতবে। প্রথমেই পড়ে নটরাজনের ঘর। বইপত্র কী সব গোছাচ্ছিল যেন, বললে,—এই যে বাবুজী। এসেছো?

ভামতী তাড়াতাড়ি আমার হাতটা ছেড়ে দিলো। বোধ হয় লজ্জা পেয়েই।

হাসিমুখে বললাম,—না এসে পারলাম কই?

স্নিগ্ধ সস্নেহ হাসি নটরাজনের মুখে, বললো,—ও-বাড়ি যাচ্ছি বাবুজী। তুমি আসবে? বীণা শোনাবো।

আমি উত্তর দেবার আগেই ছেলেমানুষির স্বরেই বলে উঠলো ভামতী,—না, বাবুজী যাবে না। তুমি একাই থাকো গিয়ে তোমার বীণা নিয়ে।

হেসে উঠলো নটরাজন, বললে,—তা হলে দেখছি ছুটি পেলে না বাবুজী। আচ্ছা, আমি চলি।

আমাদেব দুটিকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুবে দাঁড়ালো সে, বললে,—শোনো। কাল ও-বাড়ির একটি মেয়ে, তার নাম ভারাহালু, ওদের যে নিজস্ব মান্দর আছে বাড়িব ভিতরের বাগানটাতে, পুরুষোত্তমের মন্দির, সেখানে নাচ দেখাবে। কাল খুব ভোরে, ব্রাহ্মমুহূর্তে। তোমাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এসো।

—মন্দিবে নাচ দেখাচ্ছে মানে?

নটরাজন বললে,—আমাদের ভাষায় বলি, 'আবঙ্গেত্রম্'। এব তেলেগু প্রতিশব্দ আমার ঠিক জানা নেই। ভামতী জানে। ওর কাছ থেকে জেনে নিও।

চলে গেল নটবাজন। পথ থেকে ওব কণ্ঠের মিলিয়ে-যাওয়া গানের সুর শোনা গেল,—ভামনে সত্যভামনে—

একটু অবাক হয়েই বলে উঠলাম,—নটরাজন আজ হিন্দী গান ছেড়ে তোমাদের ভাষায় গান গাইছে, ব্যাপারটা কী?

তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে উঠলো ভামতী,—ও-পাগলটার কথা ছেড়ে দাও।

বললাম,—কিন্তু কথাটার মানে কী হলো? 'ভামনে সত্যভামনে…' মানে?

আমার হাতে হাতটা জড়িয়ে হেসে ফেললো ভামতী,—বাপ রে, কোনও জিনিসটাই এড়িয়ে যাবার জো নেই। সহস্রচক্ষু!

বললাম,—অযথা কৌতূহল লক্ষ্য করে মনে মনে রাগ করলে বুঝি?

স্নিগ্ধ দুটি চোখের দৃষ্টি আমার দু চোখে ন্যস্ত ক'রে গভীর কণ্ঠে বলল,—না গো, রাগ করি নি। আমাদের কথা এমন করে জানতে চাও, এতে রাগ করবো? জানতে তো তুমি চাইবেই। তুমি যে কবি!

মুহূর্তে বিরক্ত হয়ে ছাড়িয়ে নিলাম ওর হাত, বললাম,—কী বলছো এসব!

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করলো, তারপরে আমার একটি হাত ওর দুটি হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে কোমল কণ্ঠে বললে,—বেশ, আর বলবো না। খুসি তো?

আমি তখনও মুখ ভার করে আছি লক্ষ্য করে বলে উঠলো,—হয়েছে হয়েছে, আর রাগ করতে হবে না। এখন শোনো, ও কী বলে গেল।

—কে?

—নটরাজন। ওই যে গান গাইলো না? 'ভামনে সত্যভামনে। আমি নারী। কিন্তু কোন্ নারী? সত্যভামা।

আশ্চর্য হয়ে বললাম,—তা হঠাৎ 'আমি সত্যভামা' এই কথা গাইতে গেল কেন?

—খেয়াল। ওর কি কোন মানে ধরতে আছে? ও-গানটা হচ্ছে একটা দারু।

—দারু মানে?

—মানে, পাত্রপ্রবেশ দারু।

—পাত্রপ্রবেশ দারু! মানে?

বললে,—বাব্বা! কত 'মানে'র মানে আর বলবো? চলো না ঐ ঘরে মার কাছে। মা সব জানে, বলবে 'খন।

বললাম,—হ্যাঁ। রোগা মানুষকে বকবক করাই আর কি! তুমি বলো না? তুমিও তো কম জান না দেখছি।

বললে,—ভারতনাট্যম্ জানো?

—জানি না? তোমাদের সারা দাক্ষিণাত্যই তো 'ভারতনাট্যম'-নৃত্যের জন্য বিখ্যাত।

—দেখেছো ভারতনাট্যম্?

—তা কিছু কিছু দেখেছি বইকি।

বললে,—ছাই দেখেছো। যা সব তোমরা দেখে থাকো, ভারতনাট্যমের সে আর কতটুকু ?

—মানে !

হেসে বললে,—আবার মানে ? তোমার মানের জ্বালায় কি দেশ ছেড়ে পালাবো ?

—বলো না ?

বললে,—যে ভারতনাট্যমের চর্চা বেশি হয়, যার পরিচয় বাইরের লোকেও জেনেছে, তা ভারতনাট্যমের একটা অংশ মাত্র। আমরা তাকে বলি, সাডির নৃত্য। অবশ্য এর মূল্যও কম নয়। যুগ যুগ ধরে দেবদাসীরা এই নাচ শিখে আসছে। এর মূল রসটা হচ্ছে, যাকে বলে শৃঙ্গার রস।

—তুমি জানো এই নাচ ?

—সামান্য। এরই আর-এক নাম দাসী-আট্টম্। দেবদাসীরা নাচতো কিনা, তাই।

—তোমাদেরও এই নাচ শিখতে হয় তো ?

—ঐ যে নটরাজন। ও শেখাচ্ছে কিছু কিছু। ঐ তো শুনলে ? একটি মেয়ে, ভারাহালু, কাল ভোরে মন্দিরে তার জীবনের প্রথম নাচ দেখাবে। দেখো। যদিও সেটা ঠিক সাডির নৃত্য, অর্থাৎ দাসী-আট্টম্ নয়।

—তা হলে ?

বলসে,—যেটা তোমরা দেখ সাধারণত, অর্থাৎ এই যে সাডির নৃত্য, এটা শিবের মন্দিরে হয়ে থাকে। কিন্তু শুনলে তো ? আমাদের যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, তিনি পুরুষোত্তম। তাঁর সামনে যে নৃত্য হয়, তা একটু আলাদা। একে আমাদের অন্ধ্রদেশে বলে, কুচিপুডি। এ নাচ সচরাচর লোকে দেখতে পায় না। একে ঠিক নাচও বলা চলে না, এ হচ্ছে নৃত্যনাট্য। নাচও থাকে, অভিনয়ও থাকে।

—বটে, দেখতে পারি না কোথাও এ নাচ ?

হেসে বললে,—কোথায় দেখবে ! মরে যাচ্ছে। ঐ তামিলনাদের লোকটা ঐ নটরাজন, ঐ লোকটা পাগল, ও আমাদের মধ্যে ওই নাচ আবার প্রচলন করতে চায়।

—ও জানে ?

—হ্যাঁ। পিতৃদত্ত কিছু সম্পত্তি-টম্পত্তি আছে, তারই আয়ে যা খুশি তাই

ক'রে বেড়ায়। কেউ তো কোথাও নেই। কুচিপুড়ি ব'লে একটা গ্রাম আছে, সেখান থেকে ও কিছু কিছু শিখে এসেছে। মাঝে মাঝে এখনও ও যায় সেই গ্রামে ওর গুরুর কাছে।

বললাম,—কুচিপুড়ি একটা গ্রামের নাম তা হলে?

উত্তর দিলো,—হ্যাঁ। ঐ গ্রামের নাম থেকেই নাচটার নাম হয়েছে কুচিপুড়ি। কৃষ্ণের পারিজাত হরণের গল্প জানো তো? বিয়ের পর সত্যভামা কৃষ্ণকে বললেন স্বর্গ থেকে পারিজাত গাছটিশুদ্ধ নিয়ে আসতে, তিনি তাঁর বাগানে পুঁতবেন। স্ত্রীর কথা রাখতেই তো ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ। জান না এই গল্প?

বললাম,—ঠিক জানি না। কিন্তু বলো। তার পর?

বললে—এই গল্প নিয়েই একটি কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্য আছে, তার নাম ভাম-কলাপম্। তার নিয়মটা হচ্ছে কী জানো? প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে যখন যে চরিত্র মঞ্চে এসে প্রবেশ করবে, অভিনয় আরম্ভ করিবার আগে, ছোট্ট গান গেয়ে আর নাচের মুদ্রা দেখিয়ে তার নিজের পরিচয়টা সে আগে দিয়ে দেবে। তাকেই বলে পাত্রপ্রবেশদারু। ভাম কলাপম এ 'সত্যভামা' যখন প্রথম মঞ্চপ্রবেশ করে, তখন সে ঐ গানটা গায়, যেটা তুমি নটরাজনের মুখে এইমাত্র শুনলে, 'ভামনে সত্যভামনে'—আমি নারী সত্যভামা।

মন দিয়েই শুনছিলাম ওর কথা, বলে উঠলাম,—বাঃ! সুন্দর তো! তুমি জানো সত্যভামার নাচ?

—সর্বনাশ! কোত্থেকে জানবো? ও নাচ মেয়েদের নাচবার নিয়ম নেই। ছেলেরাই নাচে।

—মেয়ের ভূমিকা?

—হ্যাঁ, মেয়ের ভূমিকা।

বললাম,—তুমি নিশ্চয়ই দেখেছো এই নাচ?

—না। আমার মা দেখেছে।

একটুক্ষণ চুপচাপ। বললাম,—ঐ যে মেয়েটি কাল নাচবে, ভারাহালু, সে কী নাচবে? কুচিপুড়ি?

—হ্যাঁ। সে যে নাচটা নাচবে, তাকে আমরা বলি, পূজা-নৃত্য। অনেকটা সাডির নৃত্যের আলারিপ্পুর মত। অথচ ঠিক আলারিপ্পু নয়।

বললাম,—তা হলে কাল ভোরে আসতেই হবে। দেখতেই হবে নাচ। আচ্ছা, এ নাচ মন্দিরে কেন?

বললে,—এই নিয়ম। শোনো? নাচ শেখবার পর সেই নাচটা প্রথম দেখাতে হয় দেবতাকে। আমাদের পুরুষোত্তমই তো পরম দেবতা। তাঁরই তো বধূ আমরা। কিন্তু আর বকবক করবো কতক্ষণ? মায়ের কাছে যাবে না?

—চলো।

আমার হাত ধরে আবার তেমনি করে নিয়ে চললো ভিতরে।

ঠিক যেমনটি দেখে গিয়েছিলাম, তেমন করেই শুয়ে আছেন বিছানায়। মুখের ভাবে প্রসন্নতা। আমাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই চি॰ ৃতে পারলেন। স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে গেল মুখ, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, তবু বললেন,-কাছে বসো। তোমাকে দেখি।

বসলাম। হাতটা বাড়িয়ে রাখলেন আমার কাঁধের উপর, নিজের দিকে একটু আকর্ষণ ক'রে, মনোযোগসহকারে কী যেন দেখতে লাগলেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, অস্বস্তি বোধ ক'রে চোখ নামাতেই বলে উঠলেন,—ভামতী ভুল করে নি।

আমার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল ভামতী, তার আঙুলের মৃদু ছোঁয়া আমার পিঠের উপর রেখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলো,—দেখলে তো মা! তোমার শিক্ষা আমি কিছু কিছু পেয়েছি। কিন্তু তুমি আর কথা বোলো না মা, বড় দুর্বল তুমি, কথা বললে হাঁপিয়ে উঠবে।

সত্যি কথা। ঐটুকু কথা বলেই শ্রান্ত বোধ করছিলেন মহিলাটি। বললাম, —একেবারে সেরে উঠুন, আপনার কাছ থেকে অনেক কথা শুনবো।

খুসি হয়ে মাথা নাড়লেন। ভামতী পিঠের ওপর আঙুলের সামান্য একটু চাপ দিয়ে বললে,—ওঠো। রান্নাঘরে রান্না করছি, দেখবে এসো।

তারপরে মায়ের দিকে ফিরে বললে,—ওকে নিয়ে যাই মা?

আমার ডান হাতটি ধ'রে কী যেন লক্ষ্য করছিলেন মহিলাটি, মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই আমি উঠে পড়লাম, কিন্তু হাতটা রইলো ওঁর হাতে। হাতটা ধরা অবস্থাতেই আমার আংটিটায় আঙুল বুলাতে বুলাতে হঠাৎ বলে উঠলেন,— এ আংটি কোথায় পেলে তুমি?

তাড়াতাড়ি বলে উঠলো ভামতী,—আমি দিয়েছি।

কী এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে, প্রথমে মুখখানা সাদা হয়ে গেল, তারপরে ধীরে ধীরে খুসির আলো জাগলো মুখে, বললেন,—ও আংটি আমার। আমিই পরতাম। ভামতীকে দিয়েছিলাম। খুব ভাল হয়েছে। ওটা তুমি সব সময় পরবে।

ভামতী মায়ের মুখের দিকে ঝুঁকে বললে,—খুসি হয়েছ মা ?

আবার শ্রান্তিবোধ করছিলেন, মাথা নেড়ে জানালেন,-হ্যাঁ।

ভামতী বললে,—শুয়ে থাকো। আমি ওকে ভিতরে নিয়ে চললাম।

মহিলাটি যেন কী এক চিন্তার গভীরে মুহূর্তে তলিয়ে গেছেন ততক্ষণে, সাড়া দিলেন না।

একটা পিঁড়ি পেতে দিয়ে ভামতী বললে,—ব'সো।

বসতে বসতে বললাম,—ঠিক এইখানটিতে তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনও তফাৎ নেই। রান্নাঘরের ব্যাপারে দেখছি, একেবারে আমাদের দেশের মতোই সব কিছু।

—তা বলে মাছ রান্না করি না আমরা।

এই বাহ্য পরিবেশের দিক থেকে কে বলবে তখন যে, আমি আমার দেশের রান্নাঘরে বসে আছি না?

ভামতী বললে,—শোনো, খাওয়াদাওয়া ক'রে রাত্রে আর যাওয়া হবে না।

বললাম,—সেকী ! অফিসের কাজের ব্যাপারে রামদাসজী বসে থাকবেন যে ! আর তা ছাড়া, আমার অন্য কাজও আছে। একবার ভাবলাম, সরোজার কথাটা একে বলেই ফেলি। কিন্তু কী ভেবে আর পারলাম না।

ও বললে,—থাকে থাকুক, আবার বলছি, আজ ছাড়বো না কিছুতেই।

বললাম,—মা রয়েছেন। এভাবে আমার এখানে রাত্রে থাকাটা দৃষ্টি কটু ঠেকবে।

ঝংকার দিয়ে বলে উঠলো ভামতী,—রাখো তো ওসব বাজে ওজর আপত্তি। এই নাও, কেমন 'মসলা-পাঁপর' ভেজেছি, একটু খেয়ে দেখ।

খেতে খেতে বললাম,—তা হলে ছুটি পাচ্ছি না সত্যিই ?

—না।—ভামতী বললে,—কিন্তু একটা ব্যাপার দেখলে? তোমাকে আংটিটা দেওয়াতে মা একটুও রাগ করলো না! ওটা কিন্তু মার বড়ো আদরের।

—আমাকে দিলে কেন তবে ?

মাথা ঝাঁকিয়ে ছেলেমানুষের মতো বলে উঠলো,—বেশ করেছি। আসলে ওটা মায়েরও নয়।

—কার ?

মুখ টিপে হেসে বললে,—শুনেছিলাম, অপরের হাতের আংটি। মাকে দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু 'তিনি'টি কে?

মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে বলে উঠলো—অতশত আমি জানি না।

অল্প একটু হেসে বললাম,—জানো না যখন, তখন উঠি।

—মানে!

উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে। সবিস্ময়ে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—চলে যাচ্ছো?

ওর ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে হেসে উঠলাম,—যাবো না। বসে বসে রান্না করো। আসছি ঘুরে। নারায়ণের খবর নেওয়া হয় নি, যাই একটু গল্প ক'রে আসি।

ভামতীর ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি, বললে,—আসলে আজ অন্য মেয়ের সঙ্গে ভাব করার ইচ্ছা হয়েছে, তাই না?

অপ্রতিভের মত হেসে উঠলাম, বললাম,—কী যে বলো!

—কেন?

বললাম,—অনন্য মেয়েকে যে পেয়েছে, অন্য মেয়ের সঙ্গে সে ভাব করতে যাবে কেন?

দুটি চোখে খুসির বিদ্যুতি, কিন্তু মুখে কৃত্রিম কোপ। বললে,—ঈস! অত বাক্‌চাতুরী করতে হবে না। আমি 'অনন্য মেয়ে' হতে যাবো কেন?

একটি হাত চট করে ধ'রে ফেললাম, বললাম,—সত্যি কথা। অভিভূত হবার মতো চরিত্রেরই মেয়ে তুমি।

ব'লেই আর দাঁড়ালাম না, কথাটা বলেই কেমন যেন লজ্জা হলো, এ ধরনের কথা যে আমার মুখে একদিন আসতে পারে, এ আমি নিজেই জানতাম না।

চলে আসছি, পিছন থেকে বলে উঠলো,—শীগগির এসো কিন্তু। বসে থাকবো।

ওর মায়ের ঘরের মধ্য দিয়েই বাইরে যেতে হয়। ঠিক তেমনি শুয়ে আছেন। তাড়াতাড়িতে চোখে পড়বার কথা নয়, তবু চোখে পড়লো। দুটি চোখ নিমীলিত, কিন্তু চোখের কোণ বেয়ে জল পড়ছে অবিরল ধারায়।

কাছে গিয়ে বললাম,—এ কী, কাঁদছেন কেন এমন ক'রে?

চমকে চোখ খুললেন। দুর্বল হাতটা উঠিয়ে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন,—না না, ও কিছু নয়।

—কাঁদবেন না। দুঃখ কিসের আপনার? আপনি তো সেরে উঠেছেন।

দুটি পরিপূর্ণ চোখ মেলে তাকালেন আমার দিকে, বললেন,—ও-আংটি যেন কখনও খুলো না।

ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠেই বলে উঠলাম,—আপনার মেয়ের কিন্তু এটা আমাকে দেওয়া ঠিক হয় নি।

—ঠিকই হয়েছে।—উনি একটু ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে আমার একটি হাত ধরে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন,—ঠিক তোমারই মতো একজন। এমনি খেয়ালী। এমনি বৈরাগ্যের দৃষ্টি।

একটু হেসে বললাম,—আমার বৈরাগ্য আছে এ-কথা শুনলে লোকে হাসবে। আমি সাধারণ লোক, রিপুর বশ।

বললেন,—রিপু থেকে অ-রিপুতে যাওয়ার পথও তোমার জানা। তুমি যাবেই। আমি সব লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি তোমার মুখে-চোখে-কপালে।

বললাম,—বোধ হয় ভুল হয়েছে আপনাদের।

—না। আমাদের চোখ পুরুষদের সম্পর্কে কতকগুলি ব্যাপার সহজেই বুঝতে পারে। জানো, সেও তোমার মতো ছিল, তাকে বাঁধতে পারি নি, অমন মানুষকে বাঁধা যায়ও না। হয়তো সংসার করে, গৃহীও হয়। কিন্তু তবু তারা থাকে আজন্ম-বৈরাগী।

কোন বিস্মৃত সুসুপ্ত তারে যেন আঘাত লেগেছে, বীণার মতো বাজছে সেই তার, আবার ওঁর চোখ হয়ে উঠলো সজল। তাড়াতাড়ি বললাম,—আর কথা বলবেন না, কাঁদলেও চলবে না। আমি যাই, একটু ঘুরে আবার আসছি। কেমন?

উনি চোখ মুছলেন, তারপরে ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে বললেন,—আচ্ছা।

সেই নবগ্রহের অদ্ভুত মূর্তি, সেই ধূপ, সেই মূর্তির পায়ের কাছে পুজো-করা ফুল। হাতবাক্সের উপরে লাল-খেরো-বাঁধানো খাতাটা খুলে মাথাটা তার উপরে নুইয়ে রেখে বসে ছিল নারায়ণ। আর পুরু কাচের চশমা-পরা বিশ্বনাথম্ বি-এ কমার্সের বই এপাশে-ওপাশে ছড়িয়ে রেখে, উবু হয়ে বসে খাতায় বুঝি কোন প্রবন্ধই লিখে চলেছে একমনে।

ভেজানো দরজা খোলার শব্দেই চমক ভাঙলো ওদের। নারায়ণ আমাকে দেখে বলে উঠলো,—বাবুজী!

—হ্যাঁ।

বিশ্বনাথম্‌ অবাক হয়ে বললে,—এখানে ?

আপন মনেই একটু হেসে বলে উঠলাম,—ফুলের নাম করবো।

সোজা হয়ে বসলো বিশ্বনাথম্‌, কিছুক্ষণ হতবাক্‌ হয়ে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

বললাম,—তোমাকে একটু ডিস্টার্ব করবো বিশ্বনাথম্‌? একবার আমার বাসায় যেতে হবে। রামদাসজী বসে থাকবেন আমার জন্য। পাম্বলুও থাকবে। ওদের বলে এসো, আমি এখানে আটকে গেলাম, বাড়ি ফেরা আজ আর হলো না।

—বেশ।—বলে উঠে দাঁড়ালো বিশ্বনাথম্‌, তারপরে তার স্যাণ্ডেলজোড়ায় পা গলিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে গেল ঘর থেকে।

পিছন থেকে ডেকে উঠলাম আমি,—শোনো বিশ্বনাথম্‌।

দরজার কাছে ও দাঁড়িয়ে গেল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম,—আরও একটা কথা জানাবার আছে রামদাসজীকে। শোনো এদিকে।

বলে আর কোনো দিকে না তাকিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে গেলাম ঘরের বাইরে। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে ওকে টেনে নিলাম পথের এক নির্জন প্রান্তে, বললাম, —রামদাসজীকে যা বলতে বললাম, তা তুমি বলে এসো। কিন্তু তাকে আর-কিছু সত্যি-সত্যি জানাবার নেই। একটা গোপন কথা ছিল তোমার সঙ্গে।

আমার আচরণে উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিল বিশ্বনাথম্‌ বললে,—কী কথা! বলুন ?

ভূমিকা না করে সোজাসুজি বলে ফেলাম,—সরোজার সঙ্গে গোপনে আমাকে একটু দেখা করিয়ে দিতে পারো ?

—কেন ?

বললাম,—ঘনশ্যামদাসজী সরোজাকে দেবার জন্য আমার হাতে একটা দলিল দিয়েছেন। এবং আমি জানি, এ দলিলের সব খবর তোমার জানা, তুমিই লিখেছো ঐ দলিল।

বিশ্বনাথম্‌ একটু থেমে থেকে সম্ভবতঃ সমস্ত ব্যাপারটা অনুধাবন করার চেষ্টা করলো। তারপরে বললে,—সবই তো জেনেছেন দেখছি। কিন্তু নারায়ণ-ভাইকে কি এসব কোন কথা বলেছেন ?

—না—না।—বললাম,—সে যাতে জানতে না পায়, সেজন্যই তো তোমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এলাম!

বিশ্বনাথম্ বললে,—অবশ্য আপনার নিজের হাতেই দলিলটা ওকে দেওয়া উচিত। আমার হাত দিয়ে গেলে ওদের মনে আমার সম্বন্ধে নানা সন্দেহ জাগতে পারে। আচ্ছা, এক কাজ করুন। কাল সকালে, অর্থাৎ মন্দিরের আরতির সময় আপনি শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে আসুন। ওখানে দেখা করিয়ে দেবো। আমি যে এ ব্যাপারের মধ্যে আছি, ঘুণাক্ষরেও এটা কাউকে যেন জানতে দেবেন না।

—না, তা দেবোনা। বললাম,—কিন্তু, একটা কথা। মন্দিরে যে দেখা করিয়ে দেবে, সেটা তোমাদের নিয়মবিরুদ্ধ নয় তো ?

—নিয়মবিরুদ্ধ তো বটেই। বিশ্বনাথম্ বললে,—কিন্তু নিয়মটা করেছে কে ? ট্রেডের খাতিরে আমি ওসব মেনে নিয়েছি, নইলে অন্তরের সঙ্গে আমার এসবে সায় নেই। এসবে বিশ্বাসও করি না। আচ্ছা, আমি চলি। এতক্ষণ এভাবে গল্প করা ঠিক নয়। নারায়ণ ভাই কিছু সন্দেহ করতে পারে। আপনি ওর কাছে যান।

বিশ্বনাথম্ চলে গেল। আমি আবার প্রবেশ করলাম ভেজানো দরজাটা ঠেলে। ঘরে তখন আর-কেউ নেই। ধীরে ধীরে বসলাম গিয়ে ওর কাছে, খাটের উপরে। মনে হলো কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে নারায়ণকে।

কণ্ঠে একটু পরিহাসতরলতার সুর এনে বলে উঠলাম,—কই, তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করলে না ?

চমক ভেঙে নারায়ণ বললে,—কোথায় আটকালে ? এ-বাড়িতে, না, ও-বাড়িতে ? আমি ভামতীর কথা বলছি।

অতো সোজাসুজি প্রশ্নে একটু লজ্জিতই হলাম বলা যায়। তাড়াতাড়ি সে লজ্জা কাটাবার জন্যই বলে উঠলাম,—তুমি কি মনে করো, অতো সহজেই আটকে যাবার লোক অ ামি

—কে জানে।

—ফুলের নাম করি ? আজ অন্য কারুর সঙ্গে গল্প করে কাটাবো।

—একটু আশ্চর্য হয়ে তাকালো আমার মুখের দিকে, বললে—কী হয়েছে বলো তো ? ঝগড়া করেছো ?

—দূর, ঝগড়া হতে যাবে কেন ! এই তো গল্প ক'রে এলাম তার সঙ্গে। সরস্বতী আম্মাও ভাল আছেন।

—জানি। কিন্তু—

বললাম,—কিন্তু-টিন্তু নয়, নাম করবো ফুলের ?

সেদিন কেন যে অতো ফুলের নাম করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, তার কারণ আজ কিছুটা বুঝি। সরস্বতী আম্মার কথাবার্তাই এ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মূলে। ঐ যে তিনি বললেন, আমি বৈরাগী, আমার কোন-কিছুতে আসক্তি নেই। আসলে এগুলিই জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল আমার মনে। মনে হয়েছিল, যা আমি নই, কেন ওরা বার বার তা বলে? এভাবে ওসব কথা বলার অর্থ ই বা কী?

নারায়ণ বললে,—ভাব করবে আজ অন্য মেয়ের সঙ্গে? সত্যি?

—সত্যি।

—তবে ফুলের নাম করো।

মনে হলো, ক্ষতি কী? না হয় কিছুটা সময় কাটিয়েই আসি একটি মেয়ের কাছে। তারপরে ভামতীকে সে গল্প করলে হয়তো সে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। বলবে, তোমার দ্বারা এ হতে পারে না। তোমার লক্ষণ দেখে জানি, তুমি 'অমুক তমুক'—

কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা অস্থিরতা জাগলো। পাছে মত বদলে যায়, তাই তাড়াতাড়ি যা মনে এলো ব'লো উঠলাম সেই ফুলের নাম,—সেবন্তী। অর্থাৎ সেঁউতি বা সেজুঁতি ভামতী আজ এই ফুলই খোঁপায় পরেছে, দেখে এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা চমকে যেন সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো নারায়ণের। মুখখানা যেন মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল। বললাল,—কী হলো?

মুখখানা নিচু করে রইলো কয়েক মুহূর্ত, তারপরে হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলো,—না, এর কাছে তোমার যাওয়া হতে পারে না।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—কার কাছে?

যা করা উচিত নয়, তাই করে ফেললো নারায়ণ। বলে ফেললো,—আসল নামটা, সরোজা।

কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে, তারপরে হেসে উঠলাম হো-হো ক'রে। বললাম,—বুঝেছি। তা হলে করবো অন্য ফুলের নাম?

উঠে দাঁড়ালো নারায়ণ। নবগ্রহের সেই মূর্তিগুলির দিকে একে একে তাকিয়ে তারপরে বললে,—আর কোনো ফুলই বাকি নেই আজ। একটি মেয়ের শুধু ছুটি, ভারাহালু। কাল সকালে আমাদের মন্দিরে তার নাচের 'আরঙ্গেত্রম্'।

মনে মনে কিন্তু অদ্ভুত ভারমুক্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে, ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত একটি খুসির স্রোত। উঠলাম, বললাম,—তা হলে যাই?

—না ভাই, যেয়ো না,—নারায়ণ হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ধরলো আমার একটা হাত, বললে,—আমায় মাপ করো। ঐ ফুলের নামটা শেষ পর্যন্ত কেউ করে নি দেখে মনে-মনে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। দেখলে তো মানুষের মন? শেষকালে তুমি এলে, দেবতার সামনে মিথ্যাচরণ করতে পারবো না। যাও তুমি তোমার সেবন্তীর কাছে।

দুটি হাতে মাথাটি টিপে ধপ ক'রে বসে পড়লো নারায়ণ। বললাম, তুমি কি পাগল হয়েছো বন্ধু? আমি যাবো না।

মুখ তুললো, বললে,—যদি না যাও তো বুঝবো, আমার দুর্বলতা তুমি ক্ষমা করো নি। বিশ্বাস করো, এ আমার মুহূর্তের দুর্বলতা। কী জানো, ঐ মেয়েটি এসে এখানকার সব-কিছু ওলোট-পালট ক'রে দিচ্ছে।

একটু হেসে বললাম,—অবশ্য কৌতূহল হয়। কেমন সে মেয়েটি, যে তোমার মতো বিচক্ষণ বিজ্ঞ পোড়-খাওয়া মানুষকেও নাড়া দিতে পেরেছে?

—না না, ঠাট্টা ক'রো না,—নারায়ণ বললে,—তুমি যাও। নইলে হয়তো—

থেমে যেতেই বলে উঠলাম,—হয়তো? হয়তো—কী?

হাত দিয়ে কপালটাকে সজোরে ঘষতে ঘষতে বললে,—তুমি যাও। যেতেই হবে তোমাকে।

—কী বলছো!

—বন্ধু, এই উপকারটা তুমি করো। আর-কেউ আজ আর আসবে না আমি জানি। তুমি না গেলে—শেষ পর্যন্ত হয়তো আমিই—কে বলতে পারে—হয়তো আমিই গেলাম, অতিথির মতো। সে দুরবস্থা থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও।

বললাম,—দুরবস্থা কেন! এতে তোমার ক্ষতিটা কী?

উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলো,—প্রচণ্ড ক্ষতি। আমি ওদের পুরোহিত। আমি ওদের—। না না, ধর্মে সইবে না। সমস্তই চুরমার হয়ে যাবে। এই পাথরের নটি দেবতার দিকে তাকিয়ে দেখ? ওঁদের সাক্ষী রেখে আমার যে প্রতিজ্ঞা, তা আমি ভাঙবো কেমন ক'রে।

—সংস্কার।

—না না, সংস্কার নয়, সত্য।

বললাম,—জানি না। আমি ফুলের নাম করেছি মাত্র, এখনও টাকা দিই নি। অতএব কোনো সত্যেই আমি আবদ্ধ নেই। আমি ভিতরেই যাচ্ছি, কিন্তু তোমার ঘরে, নটরাজনের কাছে। আছে তো সে?

খোলা খাতাটার উপরে মাথা ডুবিয়ে দিয়েছে নারায়ণ, কোনো উত্তর দিলো না মুখে, মাথা হেলিয়ে শুধু জানালো,—হ্যাঁ।

সেই পদ্মফুল-আঁকা দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই মনে হলো, দরজার কাছ থেকে সরে গেল একটি ছায়ামূর্তি। সরে গিয়ে অদূরের থামটার আড়ালে দাঁড়ালো।

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে সবটা লক্ষ্য করে, তারপরে পা বাড়ালাম। থামটার কাছাকাছি এসে থেমে গেলাম, বললাম,—মনে হয় আমি জানি আমি কার সঙ্গে কথা কইছি। আপনার নাম—সরোজা।

চমকে উঠলো মেয়েটি, থামের পাশ থেকে সরে এলো। বললাম,—আড়াল থেকে আমাদের সব কথাই আপনি শুনেছেন মনে হয়। লজ্জা পাবেন না, আমি নারায়ণের অন্তরঙ্গ বন্ধু। লোকটিকে আমিও ভালবাসি।

সেই আবছা আলোতেই আমার মুখের দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে ছিলো সে। আলপাকা-রঙের কইম্বাটুর শাড়ি পরা। বললে,—বুদ্ধিমান লোক আপনি মনে হচ্ছে। তবে আর যা-ই করুন, আমাদের ব্যক্তিগত কথার মধ্যে দয়া করে থাকতে আসবেন না।

বলেই হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছিল, পিছন থেকে ব'লে উঠলাম—শুনুন?

থমকে দাঁড়ালে। বললে,—কী?

অদ্ভুত কিন্তু পরিস্থিতি! দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে যে সরাসরি এই মেয়েটির সম্মুখীন হতে হবে, এ-ও যেমন ভাবি নি, তেমনি ভাবি নি, খেয়ালের বশে ফুলের নাম করবার জেদ ধরে শেষ পর্যন্ত এমনি এক ফুলের নাম ক'র বসবো, যে নাম হয়েছে একেবারে এই সরোজার!

চকিতে মনের কোণে একটা অভিলাষ বিদ্যুতের মতো চমক দিয়ে উঠলো। বললাম,—একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

মেয়েটি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েই দৃঢ়কণ্ঠে বললো,—অন্য কারুর সঙ্গে এভাবে কথা বলা আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ।

বলেই আর দাঁড়ালে না, তাড়াতাড়ি সামনের ঘরটার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ওঁর ঘরের কপাটটা লক্ষ্য করলাম। মনে হল, ঠিকই হয়েছে। এই-ই বোধ হয় বিধাতার নির্দেশ। নইলে, এমন ভাবে আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটলো কেমন ক'রে?

দ্রুতপায়ে নারায়ণের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, পকেট থেকে তিনটি দশ টাকার নোট বার ক'রে ওর সামনে রেখে বলে উঠলাম,—এই নাও টাকা। ফুলের নাম তো আগেই করেছি। যেতে পারি ?

মুখ তুললো নারায়ণ। অদ্ভুত প্রসন্নতা ছুটি চোখের দৃষ্টিতে, ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত স্নেহমণ্ডিত হাসির রেখা। মাথা নেড়ে জানালো,—যাও !

দরজা তো চিনেই গিয়েছিলাম। এগিয়ে গিয়ে ভেজানো দরজায় টোকা দিলাম। মুহূর্তে দরজাটা খুলে সামনা-সামনি এসে দাঁড়ালে সরোজা। বললাম,-নিয়মমতই এসেছি। . ফুলের নাম, সেবন্তী।

দরজায়-রাখা হাত ছুখানি যেন মুহূর্তে শিথিল হয়ে পড়ে গেল। বললাম,—এবার ঘরে আসতে পারি ?

অস্ফুট কণ্ঠে বললে,—আসুন।

পিছন পিছন ঘরে ঢুকে পায়ের জুতো খুলে খাটের একপাশে উঠে বসলাম। ঠিক তেমনি সাজানো একখানা ঘর। জানলার কাছে কয়েক মুহূর্ত নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর বোধ হয় সামলাতে পারলো নিজেকে। তারপরে ফিরে, হাসিমুখেই কাছে এসে দাঁড়ালো। একেবারে ভিন্ন মূর্তি ! বললে,—কী চাই ? গান ? নাচ ?

ততক্ষণে ইতিকর্তব্য আমি স্থির করে নিয়েছি। পকেট থেকে সেই দলিলটা বার করে ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। হাতে নিয়ে একটু আশ্চর্য হয়েই বললে,—কী এটা !

উঠে দাঁড়ালাম, বললাম,—দলিল। আজ থেকে এ প্রতিষ্ঠানের আপনি মালিক।

—মানে !

বললাম,—ঘনশ্যামদাসজী যাবার সময় এটি আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। এটা দেবার জন্যই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম।

মুখে বিচিত্র হাসি, সরোজা হঠাৎ খামশুদ্ধ দলিলটা ছু হাতে ক'রে অবলীলায় ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো।

—এ কী করছেন !

ওটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে জানলা দিয়ে ফেলে দিলো। বললে,—এ দিয়ে আমি করবো কী ?

বললাম,—টাকায় আপনার দরকার নেই ?

—না।

আশ্চর্য হয়ে বললাম,—তবে ?

—তবে কী ? এই যা এখানে করছি, এ-ও টাকার জন্য, এই তো ? সে টাকায় অগৌরব নেই।

—বুঝলাম না।

বাঁকা একটু হেসে বললে,—বুঝবেনও না। যে বুঝবে, সে বসে আছে ওই বাইরের ঘরে, আপনার বন্ধু, ওই নারায়ণ।

সরোজার কাজলপরা বড়ো বড়ো চোখদুটির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম, অবাক লাগে, সব কিছু বুঝেও সে চুপচাপ ব'সে থাকতে পারে কী ক'রে ? কী ক'রে আপনাকে এখানে সে প্রতিনিয়ত সহ্য করবে ? কী ক'রে প্রতিনিয়ত বাইরের লোককে সে—!

বাধা দিয়ে সে তাড়াতাড়ি বললে, চুপ করুন। আমি সেইটাই দেখতে চাই। দেখতে চাই কতো ওর সহ্য গুণ ! ওর ভিতরটাকে ক্রমাগত ঘা দিয়ে ভেঙে চুরমার না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই—স্বস্তি নেই !

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম, তখন আরেক মানুষ ! বিস্ফারিত অগ্নিক্ষরা দুটি চোখ, চাপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, উত্তেজনায় কাঁপছে। বলতে লাগলো, এখানকার প্রায় সব মেয়েই ধর্মবিশ্বাসে অটল। ধর্মের প্রতি দুর্বলতার সেই সুযোগ নিয়ে ওরা—আপনার ঐ বন্ধু—ঐ বন্ধুকেইত ওরা অস্ত্রের মতো ব্যবহার করছে ! ব্যথা যে কোথায় গিয়ে বাজে,—ও নিজেকে দিয়ে বুঝুক ! ওকে সেটা মর্মে মর্মে বোঝাবার জন্যই আমি এখানে এসে আবার ঢুকেছিলাম। আপনি শত হলেও বাইরে থেকে এসেছেন, আমাদের কথাবার্তা বুঝবেন না জানি। আমার ওপর ওর টান নেই ভেবেছেন ? খুবই আছে। যেদিন বাইরে চ'লে গিয়েছিলাম সেদিন থেকে ও দগ্ধাচ্ছে, ভিতরে ভিতরে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম আমি চলে যাবো, আর ও-ও এই ধর্মের নামে কপটাচার বন্ধ ক'রে দেবে। কিন্তু তা'তো হলো না। তাই এখান থেকে মুক্তি পেয়েও এখানকার শিকল আবার হাতে-পায়ে তুলে নিয়েছি, রোজ রাতে নতুন নতুন ফুল হয়ে ফুটি আর ওর মনের মধ্যে এক একটি হাতুড়ির ঘা দিই। ভাঙবেনা ভাবছেন ? নিশ্চয়ই একদিন চুরমার হয়ে গুড়িয়ে যাবে।

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো অনুধাবন করবার চেষ্টা করছিলাম। ওর বক্তব্যের বিরুদ্ধে নারায়ণ যে কী যুক্তি দিতে পারে তা আমি

জানি, আমাকে অনেক আগেই একদিন সে বলেছিল। কিন্তু ধর্মের কপটাচার বলে সরোজা যা বোঝাতে চাইছে, ঠিক তার বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি তেমন কই? যারা বিশ্বাস করে, রোজ সন্ধ্যায় পুরুষোত্তমই আসছেন নানান রূপ ধরে,—তাদের মধ্যে এ বিশ্বাস সঞ্চারিত ক'রে তাদের দিয়ে প্রকারান্তরে কপটাচারকে কি প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না? সরোজার এ অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু এসব যুক্তিতর্কের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি সেই মুহূর্তে আর যা অনুভব করছিলাম, তা অন্য—নারায়ণ-সরোজার মানসিকতা। দুটি চরিত্রের দুটি বিভিন্ন প্রকাশ। একজন অপরজনকে ভাঙতে চায়, কিন্তু সে-ও ভাঙবে না, কতো আঘাত দেবে তুমি দাও, আমি অটুট আছি। হৃদয়ের অভিব্যক্তির দিক দিয়ে এ-ও এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা!

কিন্তু সরোজা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সম্ভবত আত্মবিস্মৃতিজনিত একটি লজ্জাও। মুখ নিচু করে কী করবে বা কী বলবে বোধ হয় স্থির করতে পারছিল না।

আমি বললাম, ধন্যবাদ। আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা আপনি আজ খুলে দিলেন। আমি যা ভাবতাম—

—যাক—মুখ তুললো সে, ঠোঁটের কোনে মৃদু একটু হাসি, কণ্ঠস্বর শান্ত।

আমি বোধ হয় নারায়ণের প্রসঙ্গে কিছু বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু বাধা দিয়ে বলে উঠলো সরোজা,—থাক্ ওসব কথা। যার কাছে এসেছেন, তার সঙ্গে কথা বলুন। আমি আজ সেবন্তী।

অনেক কথাই ভিড় করে আসছিল একসঙ্গে, কিন্তু জানি, উত্তর আর পাবো না। সরোজা সত্যিই আর কথা বলবে না আমার সঙ্গে, কথা বলবে সেবন্তী।

ধীর মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম,—কেমন ক'রে গ্রহণ করবেন আমাকে?

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো, তারপরে বললো—ওর এ-ব্যবস্থাটা একদিক দিয়ে দেখতে গেলে মন্দের ভালো। ভিন্ন নামগুলো আছে বলেই বোধ হয় আমরা বেঁচে আছি। নিজেদেরকে ভাগ করবার সুবিধা হয়, নিজেকে নিত্য নতুন বলে ভাববারও সুযোগ হয়। তাই বলছি, আর কেন তুলছেন ওসব কথা? আমার নাম আজ সেবন্তী, মনে-প্রাণে আমাকে সেবন্তী হতে দিন। সেবন্তীর মধ্যে সরোজার সব কিছু হারিয়ে যাক।

বলে উঠলাম,—ঘনশ্যামদাসজী আপনাকে কী নামে ডাকতেন?

মুখ তুলে তাকালো, একটু অবাকই হয়েছে বোধ হয় আমার প্রশ্নে। তারপরে,

একটু থেমে, একটু ভেবে নিয়ে বললো,—সরোজা নয়। ডাকতে শিখিয়েছিলাম অন্য নামে। কিন্তু আবার ও-প্রসঙ্গ? কার কাছে এসেছেন আপনি? সেবন্তী—সেবন্তী! বুঝলেন?

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললাম,—বুঝেছি। কিন্তু, যদি আমি এখন চলে যাই? না থাকি?

ঠোঁটের কোণে বাঁকা একটা হাসি টেনে এনে বললে, সরোজার সব কথা শুনে ফেলেছেন, তাই তাকে অনুগ্রহ করতে চান? তাতে সেবন্তীর কী হবে?

বলে ফেললাম,—আসবে অন্য লোক।

—আর কোন লোক নেই।

—কেন, নারায়ণ নিজে?

মুহূর্তে যেন পাথর হয়ে গেলে সরোজা, তারপরে ধীরে ধীরে এক সময় প্রাণ সঞ্চারিত হলো সেই পাষাণমূর্তিতে। বললো,—আপনি যে নারায়ণের বন্ধু, কথায় কথায় সেটা ভুলে গিয়েছিলাম।

তারপরে একটু থেমে আবার বললো,—কিন্তু কারুরই কোনো উপকার করতে পারবেন না। আপনি গেলে, আর-একজন যে আসবে, এ নিয়ম নেই।

চমকে উঠলাম, বললাম,—কি বললেন!

অদ্ভুত সে কণ্ঠস্বর, বললো,—আপনি গেলে যে আপনার বন্ধু আসবে, সে উপায় নেই। আমার থাকবে ছুটি, কিন্তু সেবন্তীর কী হবে? সে শুকিয়ে যাবে।

এবার হেসে উঠলে খিলখিল ক'রে তারপরে বললে,—তার চেয়ে থেকেই যান না। মন হরণ করতে একা আপনার ভামতীই জানে না, সেবন্তীও জানে।

—শুনেছেন তার কথা?

—শুনেছি বই কি! আপনি সবার কথা জেনে বেড়াবেন, আপনার কথা কেউ জানবে না?

নিরুত্তর রইলাম।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা ধরে বলে উঠলো,—কী হলো! আসুন?

হাতটা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম,—না।

সরোজা আরও কাছে এগিয়ে এসে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো আমার দক্ষিণ বাহুটা। বললো,—না কেন! আসুন না?

নিজেকে মুহূর্তে ছাড়িয়ে নিলাম, দৃঢ় কণ্ঠে বললাম,—না। মাপ করবেন, আমি

বুঝতে পারি নি। ও-নিয়মটা সঠিক জানা থাকলে আমি কিছুতেই ফুলের নাম করতাম না। কিন্তু সে যাই হোক ; আপনি আমার একটা উপকার করবেন ?

অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো,—কী ?

বললাম,—নটরাজন কোন ঘরে আছে দেখিয়ে দেবেন ?

আর কোনো বাক্যব্যয় না ক'রে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বার হয়ে বারান্দার বাঁ দিকে বেঁকে সোজা হাঁটতে হাঁটতে একটা বন্ধ ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। কোন্ ঘরে যেন নৃত্যের উৎসব চলছিল, তার মৃদঙ্গ আর ঘুঙুরের শব্দের জন্য কানে আসে নি, এই দরজার কাছে আসামাত্রই শুনতে পেলাম বীণার তারে কোমল করুণ স্বরের মূর্ছনা !

সরোজা বললো,—দরজা ভেজানোই আছে। ঠেললেই খুলে যাবে।

ব'লে আর দাঁড়ালো না, যে পথে এসেছিল, সেই পথেই ফিরে গেল দ্রুতপায়ে।

খাটের ওপরে সত্যিই একটি বীণা নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে নটরনাজন। আর অদূরে মেঝের উপরে একটি অল্পবয়সী তরুণী মেয়ে—ধবধবে সাদা শাড়ি পরা—বসে চুপচাপ শুনে চলেছে সেই বীণার স্বর।

মেয়েটিই আমাকে দেখতে পেলো প্রথমে। উঠে দাঁড়ালো, নটরাজনকে বুঝি বললো আমার কথা, তার কাছে গিয়ে।

বীণার ঝংকার থামিয়ে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো নটরাজন, তারপরে হাসিমুখে বলে উঠলো,—আরে, এসো এসো। কী সৌভাগ্য !

—সৌভাগ্য আমার ;—বললাম,—তোমার বীণা শুনবো।

মকরমুখী বিপুলকায় বীণাটি খাটের উপরে রাখা, তার সামনে বসে আছে নটরাজন, একটু হেসে বললে,—চলে এলে যে ?

—এলাম।

—ছেড়ে দিলো ভামতী ?

ভামতীর নাম উচ্চারিত হতেই সাদা-শাড়ি-পরা তরুণী মেয়েটি অস্ফুট কলরব করে উঠলো, তার দিকে আমরা দুজনেই একযোগে মুখ ফেরাতে সে বলে উঠলো, —কবি ?

একটু আশ্চর্য হয়েই তার মুখের দিকে তাকালাম। আঁচল দিয়ে হাস্য গোপন করলেও চোখ দুটির হাসি সে লুকাতে পারে নি।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নটরাজনের দিকে তাকাতেই সে বললে,—এ বাড়ির সবাই

তোমাকে দেখে নি বটে, তবে সবাই তোমাকে চেনে। তোমার নাম দিয়েছে ওরা —কবি।

তারপর মেয়েটির দিকে ফিরে বললে,—চিনেছো তা হলে ভারাহালু? এই সেই বাঙালী বাবুটি। তোমাদের কবি।

—আমাদের কেন!—মেয়েটি তেমনি ভাবে হাসতে হাসতে বললে—ভামতীর কবি!

বলেই আর দাঁড়ালো না, ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বললাম,—এরই তো কাল—

—হ্যাঁ। আরঙ্গেত্রম্,—নটরাজন বললে,—নাচ অনেককেই শিখিয়েছি, কিন্তু সে হচ্ছে যাকে বলে মাত্র তালিম দেওয়া। কাজ-চালানো গোছের। যেটুকু শেখা দরকার, সেটুকুই ওরা শিখে রাখতো। কিন্তু এই মেয়েটি মাত্র তালিম নয়, গোড়া ধ'রে নিয়ম ক'রে নাচ শিখেছে। সেদিক থেকে এটিই আমার প্রকৃত প্রথম ছাত্রী। কাল দেখো, আমিই হব এর 'নট্টুভান'; 'নৃত্যশিক্ষক'; 'নৃত্যগুরু'ও বলতে পারো!

—কী নাচ ও শিখেছে?

বললে,—দাসী আট্টম্। যাকে সবাই 'ভারতনাট্যম্' বলে জানে।

—সবটা ও শিখেছে?

—না। কিছুটা। বাকিটা শিখবে। সব ওকে শেখাবো। নিষ্ঠা আছে মেয়েটির।

—সবটা শেখে নি বলছো, অথচ 'আরঙ্গেত্রম' হচ্ছে কী ক'রে?

—ওটা আর কিছুই নয়, এক কথায় 'গুরুবরণ' আর কী। দেখতেই পাবে।

বলে নটরাজন তার মকরমুখী বীণায় হাত দিলো। বেজে উঠলো স্থর। এমন তন্ময় হয়ে সে বাজাচ্ছিলো যে, ঘরে অন্য কেউ যে বসে আছে, এ তার খেয়ালও বুঝি নেই।

সত্যি কথা বলতে কী, সরোজা আমার মনের মধ্যে একটা ঝড় তুলেছিল, চিন্তার একটি ঝড়। হয়ত বা তারই ধাক্কায় আমি বাইরের পথে নারায়ণের সামনে না গিয়ে এর কাছে পালিয়ে চলে এসেছি। কথা বলছিলাম বটে, কিন্তু মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল সরোজার কথাগুলিই। কিন্তু আশ্চর্য সঙ্গীতের যাদু। প্রাথমিক আলাপের দিকটি, তত ভালো না লাগলেও ক্রমশ আকর্ষণ করতে

লাগলো আমায় সুর। সঙ্গে সঙ্গত নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে মৃদু—মাঝে মাঝে তীব্র—মাঝে মাঝে ঝড়ের গতিবেগ—অদ্ভুত একটা সুরের মায়াজাল! বোধ হয় একটানা ঘণ্টাখানেক সে বাজিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে দেয়ালে মাথা হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, পর্বতের গুহা থেকে প্রবল গতিবেগে যেন বেরিয়ে এসেছে কলহাস্যময়ী চঞ্চল কোনো ঝরণাধারা, উপলে-উপলে মুখরিত হতে হতে প্রপাতের মত ধাপে ধাপে সে যেন নেমে আসছে নিচে,—অবশেষে এলো সে সমতলে—মৃদু-মৃদু তরঙ্গ তুলে দুটি কূল ছুঁয়ে নদী হয়ে এগিয়ে চললো সে। ক্রমে ক্রমে মন্দ্রমুখর হলো তার জলকল্লোল—গভীর থেকে গভীরতর—বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর—শেষ পর্যন্ত বিলীন হলো ব্যাকুলিত সিন্ধু-তরঙ্গের আশ্লেষ-উচ্ছ্বাসে।

থেমে গেল। বললাম—অনেক গুণ তোমার। গাইতেও পারো, বাজাতেও পারো। আবার নাচও জানো।

—কোনোটাই সেইজন্য বেশী জানা হলো না।

নিবিড় আলিঙ্গনে বীণাটিকে সে কাছে টেনে নিলো, অপরূপ স্নেহে তার গায়ে হাত বুলাতে লাগলো, যেন প্রিয়জন তার অতি প্রিয়জনকে দীর্ঘ অদর্শনের পর আদর করছে।

অবাক হয়ে ওকে দেখছি, এমন সময় একটি ঝিকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলো ভারাহালু, দুটি থালায় ভর্তি ফল মিষ্টি মিষ্টান্ন প্রভৃতি।

দুটি আসনের সামনে দুটি থালা নামিয়ে রেখে জলের গ্লাস সাজিয়ে আমাদের দুজনকে আহ্বান জানালো ভারাহালু। নিশ্চুপে খাট থেকে নেমে এলো নটরাজন। আমি আপত্তি জানালাম, বললাম,—এসব কেন? বাড়ি গিয়েই তো খাবো।

নটরাজন বললে,—খাও। এ হচ্ছে প্রসাদ। শ্রীকৃষ্ণের মন্দির থেকে ভোগ দিয়ে নিয়ে এসেছে ভারাহালু। খেয়ে ওকে আশীর্বাদ করো।

আমাদের সামনে বসে ভারাহালুও মিনতির স্বরে বললে,—খান?

অগত্যা খেতে হলো। ভারাহালুর নির্দেশে। একে একে সব।

বললাম,—রাত্রের খাওয়া হয়ে গেল।

নটরাজন কিন্তু কেমন যেন অনমনস্ক। চুপচাপ খাওয়া শেষ ক'রে সে বাইরে গেল। আমিও মুখ হাত ধুয়ে ভিতরে এলাম। ভারাহালু আর ঝিটি চলে গেল থালা উঠিয়ে নিয়ে, মেঝেটা পরিষ্কার ক'রে। আমি এবার ভাবছিলাম ভামতীর কথা। পেট ভরে গেছে, আর কিছু খেতে পারবো না, তার রান্না-করা খাবার

যখন মুখে তুলতে পারবো না, সে তখন দুঃখই করবে না, হয়তো তিরস্কারও করবে।

ইতিমধ্যে ফিরে এলো নটরাজন, বললে,—নারায়ণ ভাই বাইরের ঘরেই আজ শুচ্ছে বিশ্বনাথমের পাশে। ভোর রাত্রে উঠে আবার ওকে পূজো করতে হবে কিনা ভারাহালুর জন্য! সুতরাং সারারাত এ-ঘরটা আজ আমার। সারারাত আজ বাজাবো। শুনবে তো?

বললাম,—আমাকে তো ফিরতে হবে।

—ফিরতে হবে!—মুখ নিচু করে কী যেন ভাবতে লাগলো, তারপরে মুখ তুলে বললে,—বেশ। যেয়ো। তবে কিছুক্ষণ শুনে যাও। ঘণ্টাখানেক।

—হ্যাঁ, তা শুনছি।

কিছুক্ষণ বাজাবার পর বললে,—ভারাহালুকে দাসী আট্টম শেখাচ্ছি। কিন্তু ওটাই আমার জীবনের শেষ সাধ নয়। আমার সাধ অন্য।

—কী বলো তো?

বললে,—তাঞ্জোরের কাছেই একটা গ্রামে এক 'নট্টুভান' বা 'নৃত্যগুরু'র বংশে আমার জন্ম। গান-বাজনা-নাচ অধ্যয়নের মতো শ্রদ্ধার সঙ্গেই শিখতে হয়েছিল। কিন্তু ভিতরে ছিল ঘূর্ণি। বেরিয়ে পড়েছিলাম। এখানে এসে জীবনের ধারাটা মুহূর্তে বদলে গেল।

থেমে গেল নটরাজন। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্যে কেটে যাবার পর ঈষৎ তরলকণ্ঠেই বলে উঠলাম,—মেয়েটি কে তা কিন্তু এখনও বলো নি।

আমার কথা ওর কানে ঠিক গিয়েছিল কি না কে জানে! নিজের মনেই বলতে লাগলো নটরাজন,—সরস্বতী আম্মার স্নেহ জীবনে কখনও ভুলবো না। অথচ জানো?

—কী?

বীণার তারে একটা ঝংকার তুলে, তারই রেশ মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই বললে,—এইসব মেয়েদের মতই ছিল সরস্বতী আম্মার জীবন। আজ বীণায় 'শঙ্করাভরণম্' বাজাতে গিয়ে ওঁর সেই সব কথাই মনে পড়ে গেল। উনি আমাকে স-ব বলেছিলেন। খুবই স্নেহ করতেন কিনা।

বললাম,—আমার হাতের এই আংটিটা দেখেছো?

একটু ঝুঁকে আংটিটা দেখতে দেখতে একসময় মুখ তুললো নটরাজন, বললে,—সরস্বতী আম্মার আঙুলে আগে থাকতো। তোমায় দিয়েছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। এটা ওঁকে দিয়েছিল কে যেন!

—তাঁর কথাই বলছি—নটরাজন বললে,—তাঁকে দেখি নি, শুনেছি তাঁর কথা। লোকটি বিদেশী, কিন্তু সাত্ত্বিক প্রকৃতির সেই লোক।

মনে মনে একটু চমকে উঠলাম, বললাম,—সাত্ত্বিক প্রকৃতি মানে?

নটরাজন বললে,—সাত্ত্বিক প্রকৃতি বলতে কী বোঝাতে চান সরস্বতী আম্মা, তা তিনিই জানেন। হয়তো অসাধারণ কোন ব্যক্তি হবেন। তাঁকে ভালবেসেই সব ত্যাগ করলেন তিনি।

—সব, মানে?

—সব, মানে এই জীবন। তার এই কন্যাটিকেও ত্যাগ ক'রেছিলেন, বলা যায়। ঐ যে বাসাটিতে তুমি গিয়েছিলে, ঐ বাসাটি নিয়ে বাস করতে লাগলেন। সেই লোকটি ছিল খেয়ালী, খেয়ালের বশে যেমন এসেছিল, তেমনি একদিন হঠাৎই চলে গিয়েছিল।

—তারপর?

—তারপর থেকে এই এতো বয়স পর্যন্ত সম্পূর্ণ একা কেটেছে সরস্বতী আম্মার জীবন। 'বঞ্চিত সত্তা' বলতে পারো। কিন্তু কখনও—কোনদিন—কোনও অভিযোগ শুনি নি কারুর বিরুদ্ধে। পূজা অর্চনা নিয়েই আছেন সব সময়। কতদিন দেখেছি, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন দেবমূর্তির দিকে, চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়ছে। এক এক সময় ভাবতাম, এ আধ্যাত্মিক সম্পদ উনি পেলেন কী করে?

বললাম,—তোমার সঙ্গে আলাপ বুঝি এইখানে? কেমন ক'রে হলো?

—সে অনেক কথা,—নটরাজন বললে,—সেই যে মেয়েটির কথা তোমাকে বলেছিলাম—

—হ্যাঁ,—বলে উঠলাম,—সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি, তোমার প্রণয়িণী সেই মেয়েটি কে?

—প্রণয়িণী?—নটরাজন বললে,—না। সে কথা আর বলা চলে না। তবে সেদিন আমার ভালবাসার কথা জানতে পেরে সরস্বতী আম্মা নিজেই এসে একদিন আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। কী অপূর্ব স্নেহপ্রবণ মন! বললেন, বাবা, আমার কাছে এসে তুমি থাকো।

—কিন্তু মেয়েটি কে?

নটরাজন একটু থেমে, তারপরে ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলে,—ভামতী।

হঠাৎ মনে হলো, চারিদিক অদ্ভুত নির্জন হয়ে গেছে। যত সংক্ষেপে আর সহজে নটরাজনের কথা আমি বলতে পারলাম, অতো সংক্ষেপে, অতো সহজে, সে আমাকে ও-কথা বলে নি। অনেক সময় নিয়ে, অনেক দ্বিধা ক'রে, অনেক ভূমিকার পরে, সে উদ্ঘাটিত করেছিল তার মনোরাজ্যের স্মৃতিভাণ্ডারটুকু।

রাতও বোধ হয় অনেক। নাচের শব্দও কানে আসছে না, কোনও গানের সুরও আর শোনা যায় না। শুধু নটরাজনদের ঘরের খোলা জানলাটার বাইরে স্বর্ণ-চাঁপা গাছটার উপরে চাপা জ্যোৎস্নার আলো এসে ঠিকরে পড়েছে, ঝিরঝিরে একটা হাওয়া লেগে পাতাগুলি কাঁপছে, আর ভেসে আসছে পাতায়-পাতায় ঢাকা প্রস্ফুটিত চাঁপাফুলের মৃদু সৌরভ।

কোথাও কোনো কোলাহলের সুর নেই, একটা রাত-জাগা পাখির ককিয়ে-ওঠাও শোনা যায় না, অপরূপ নিস্তব্ধতায় ভরে গেছে চারিদিক। নটরাজনের পাশে খাটের উপরে আমিও বসে আছি দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে। সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, আমারও যেন আর-কিছু করবার নেই, উঠে চলে যাবারও প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু এই অখণ্ড নীরবতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা, মগ্ন করে রাখা।

হঠাৎ বীণার তারে ঘা দিলো নটরাজন! গমকে-গমকে মীড়ে-মীড়ে যেন দুঃসহ এক অন্তর্বেদনাই মুচড়ে-মুচড়ে উঠছে! জানলার বাইরে আকাশ আর চাপা-জ্যোৎস্নার আবছা আলাছায়ার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর মনে হলো, বিচ্ছেদময়ী রাত্রিই বুঝি বুকফাটা কান্নায় গুমরে মরছে!

বহুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর চোখ ফেরালাম নটরাজনের দিকে। নিমীলিত দুটি চোখ, মুখের ভাবে অদ্ভুত এক প্রসন্নতা,—সুর-পরিবর্তন করে বসন্ত-জাতীয় কোন প্রাপ্তি-প্রমত্ত সুরের রাজ্যে অবগাহনে নেমেছে সে যেন! এই জাতীয় সুর বেহালায় বা এস্রাজে আমাদের দেশেও শুনেছি, কিন্তু বীণার তারে যে স্বাভাবিক স্বর জাগে, তা যেন আপনিই মাদকতায় ভরা—সেই স্বরে আবার জেগেছে ওই সুর,—সমস্ত মনটাকে যেন মুহূর্তে মাতিয়ে দিলো।

বীণাকে আঁকড়ে ধরেছে সে মদমত্তা কোনও রমণীর মতো! মনে হচ্ছিল, মাত্র একটি যন্ত্রই নয়, যেন কোনও প্রেমিকা নারীর সুসম দেহ-বীণায় পরম প্রেমভরেই সুর তুলেছে নটরাজন। কত দণ্ড পল অনুপল এমনভাবে যে কেটে গেল কে জানে! একসময় সে বাজানো থামিয়ে দিয়ে অকস্মাৎ বীণাটিই দু হাতে

জড়িয়ে ধরলো অতি আদরে। তারপরেই গভীর তৃপ্তিভরেই মাথাটা রাখলো বীণার এক দিকে।

কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হলো ওর ভাবভঙ্গি। বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে চেয়ে আছি। একসময় ও মুখ তুলে সোজা হয়ে বসলো, তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে একটু যেন অবাকই হলো। হঠাৎ যেন ততক্ষণে তার স্মরণে এলো আমার উপস্থিতি। অপ্রতিভের মতো একটু হেসে, বীণাটি অতি অন্তর্পণে সরিয়ে রেখে নেমে দাঁড়ালো খাট থেকে।

মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলো,—কটা বেজেছে ?

হাতঘড়ি দেখে জবাব দিলাম,—তিনটে বেজে গেছে !

শশব্যস্তে আলনার দিকে এগিয়ে কিছু কাপড়-চোপড় এবং কী কী যেন হাতে তুলে নিলো, তারপরে এলো আমার কাছে, বললে,—ওঠো। না হলে দেরি হয়ে যাবে।

—কীসের ?

অসহিষ্ণু হয়ে বললে,—তুমি নামো দেখি খাট থেকে ?

নামলাম। বললে,—এসো, স্নান-টান সব সেরে ফেলি। এর পর মেয়েরা উঠে পড়বে, তখন মুশকিল হবে।

—কেন ?

বললে,—আজ ভারাহালুর 'আরেঙ্গত্রম্' মনে নেই ? শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের সেই সরোবরে সবাইকে স্নান করতে হয় আজ। এসো এসো—আর দেরি ক'রো না।

—আমিও স্নান করবো নাকি ?

—নিশ্চয়ই।

—ঠাণ্ডা লাগবে যে !

—লাগবে না। এসো। গঙ্গার লুকানো ধারা ওতে এসে মিশেছে ব'লে সবার বিশ্বাস।

বাইরের ঘরের দরজাটা খোলা। তক্তাপোশের ওপর শুধু বিশ্বনাথম্ই শুয়ে আছে, নারায়ণ নেই, একটা বালিশ শুধু পড়ে আছে বিশ্বনাথমের মাথার পাশে।

বিশ্বনাথমের ঘুম ভাঙিয়ে ওকে বলবো নাকি, সরোজার সঙ্গে আমার আর দেখা করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই ? তার সঙ্গে প্রয়োজন আমার মিটে গেছে ?

কিন্তু থাক্, আরতির সময় মন্দিরে না গেলেই হলো। ক্রমে ক্রমে বিশ্বনাথম্ সবই বুঝতে পারবে।

নটরাজন বললে,—দেখলে? নারায়ণ ভাইয়ের স্নান বোধ হয় এতক্ষণে শেষ হয়ে এলো।

টানতে টানতে আমাকে নিয়ে চললো সেই সরোবরের তীরে। এগলি-সেগলি ক'রে অন্ধকারে কীভাবে যে আমাকে পার ক'রে আনলো, ও-ই জানে। সরোবরের ঘাটে রানার পাশে একটা হারিকেন জ্বলছে। আমরা যতক্ষণে পৌঁছলাম, দেখি নারায়ণের স্নান সত্যি সারা হয়ে গেছে।

নটরাজনকে দেখে বললে,—শীগগির সেরে নাও। মেয়েরা এসে পড়বে এখ্‌খুনি।

তারপরে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে,—তোমাকেও ধ'রে এনেছে বুঝি? নাও, তুমিও স্নান করো। 'আরঙ্গেত্রম্' দেখবে তো? মন্দিরে অস্নাত যেতে নেই।

নটরাজন বাড়তি কাপড়চোপড়-গামছা এসব এনে দিলো স্নানের জন্য,—তেল আর সাবান পর্যন্ত ভোলে নি। হাতে এগিয়ে দিলো একটা নিমের দাঁতন। বললে,—শীগ্‌গির।

নারায়ণ বললে,—সারারাত জেগেছো ত নটরাজনের পাল্লায় পড়ে?

—তুমি জানলে কী ক'রে!—প্রশ্ন করে, তাপরে একটু হেসে বললাম,—বাস্তবিক, কোথা দিয়ে যে রাত কেটে গেল, নিজেই বুঝতে পারি নি।

—তাই-ই হয়,—নারায়ণ বললে,—ওর বীণায় এমনি জাদু। আমরা একবার গিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি এমন তন্ময় হয়ে শুনছিলে যে, আমরা আর তোমার ধ্যান ভাঙি নি।

—তোমরা!—বললাম,—তুমি আর সরোজা?

—না, সে বললে,—আমি আর ভামতী।

—ভামতী!

—অবাক হচ্ছো কেন? ও এসেছিল তোমায় ডাকতে।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ।

বললাম,—তা ডাকলে না কেন?

নারায়ণ বললে,—আমিই বারণ করলাম। ও বললে, খেয়ে আসে নি যে। বললাম, ভারাহালু প্রসাদ খাইয়েছে।

আমি বলে উঠলাম,—ব্যস্! তোমার কথা শুনেই চলে গেল ?

—গেল। কিন্তু বোধ হয় রাগ করেছে, নারায়ণ কণ্ঠস্বর নামিয়ে একটু কৌতুক করেই বলে উঠলো—মান ভাঙাতে হবে তোমাকে।

চুপ ক'রে রইলাম।

নারায়ণ বললে,—মন্দিরে দেখা হবে ওর সঙ্গে তোমার। ও-ও আসবে তো? দেখলেই বুঝতে পারবে। আচ্ছা, আমি যাই তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসো।

বাইরে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা থাকলেও সরোবরের জলটা গরম। স্নানাদি সেরে, লণ্ঠন হাতে ফিরে এলাম আমরা, বিশ্বনাথম্ ততক্ষণে উঠে বাইরে গেছে, নারায়ণ ভাই নবগ্রহের পূজা সেরে নিচ্ছে, মেয়েরা তখনও কেউ ওঠে নি।

আমরা আমাদের ঘরে গিয়ে বসলাম। ভিজে কাপড়গুলি বাইরের উঠানে তারে মেলে দিয়ে এলো নটরাজন। তারপরে খাটের উপর বসলো এসে কাছে। বললে,—ভারাহালু উঠেছে। এইবার সবাই উঠবে একে একে। স্নানে যাবে।

বললাম,—কাল রাত্রে অদ্ভুত এক মূর্তি দেখলাম তোমার!

বললে,—অদ্ভুত কিছু নয়, তবে তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে ?

—কী বুঝবো ?

মুখের দিকে তাকালো, একটু হেসে বললে,—বোঝো নি বুঝতে পারছি। কিন্তু বোঝাবোই বা কী ক'রে ?

—কী ? বলতে চাইছো কী ?

বললে,—ভামতীর কথা বলছিলাম! কিন্তু আজ আমার মনের মধ্যে সে নেই! তাকে ভুলতেই বীণা নিয়েছিলাম তুলে, আজ ঐ বীণা আমার সমস্ত মন-প্রাণ জুড়ে আছে। যে-কোনো মেয়ের সঙ্গ থেকে ঢের বেশি আনন্দ দেয় ও।

ব'লে, সামনে-রাখা বীণার তারে ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগলো।

বললাম,—তুমি জিতেন্দ্রিয়।

—না,—মুখ তুলে বললে,—সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে বীণাটিকে ভালবাসি। বড় যত্নে রাখি। ভেঙে গেলে আমি মরেই যাবো।

একটু থেমে আবার বললে,—সরস্বতী আম্মার ঘরে রেখেছিলাম, নিভৃতে

বসে বাজাতাম। হলো সরস্বতী আম্মার অসুখ, বাড়লো ভিড়, বীণা নিয়ে এখানে চলে এসেছি। ওকে বাজালে, আমার দেহ-মন-প্রাণ সব মেতে ওঠে।

বললাম, —মন-প্রাণ তো বুঝলাম, কিন্তু 'দেহ' কথাটা ব্যবহার করছো কেন ?

অকস্মাৎ হাত বাড়িয়ে আমার হাত দুটি ধ'রে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললে,—পুরুষে পুরুষে কথা বলছি। একথা মেয়েরা বিশ্বাস করবে না। বন্ধু, এই বীণায় যখন সুর তুলে ক্রমশ তন্ময় হয়ে যাই, তখন আমার মন নয়, দেহটা পর্যন্ত মত্ত হয়ে ওঠে। শিরায় শিরায় রক্তস্রোত উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কানে কানে শুনবে ? পুরুষ স্ত্রীকে ভালবেসে যা পায়, আমি তা পাই এই আমার বীণার কাছ থেকে। এ'তো মাত্র বীণা নয়, যেন জীবন্ত স্ত্রী-শরীর !

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

শ্রীকৃষ্ণের মূল মন্দির নয়, ওদেরই 'পল্লী'র মধ্যে, একটি ছোট্ট মন্দির, এ মন্দিরের দেবতাকে ওরা 'পুরুষোত্তম' ব'লে ডাকে। সেই মন্দিরের গর্ভগৃহের সামনে যে নাটমন্দির, সেখানেই শুরু হলো ভারাহালুর 'আরঙ্গেত্রম্'।

সব মেয়ে আমাকে চেনে মনে হলো, আমি অনেককেই চিনি না। একটা সাদা কালো-পাড় সিল্কের শাড়ি প'রে হাতে পূজোর থালা নিয়ে গর্ভগৃহের দিকে চলে গেল ভামতী। আমি কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে সাড়া দিলো না, আমাকে পাশ কাটিয়ে সোজা চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে গর্ভগৃহ থেকে ভারাহালুকে সঙ্গে নিয়ে নাটমন্দিরে পৌঁছে দিয়ে আবার সে ফিরে গেল যথাস্থানে। দেবতার সামনে পুরোহিতের পায়ের কাছে বসে রইলো।

ততক্ষণে সূর্যোদয়ের প্রথম আলো এসে পড়েছে মন্দির-চত্বরে। মাঝে অনেকখানি জায়গা রেখে পাশে পাশে বসেছে সবাই, দেবতার দিকে যথাসম্ভব মুখ ক'রে। পাঁচজন যন্ত্রী বসে আছে যন্ত্র নিয়ে। একজন মৃদঙ্গ, একজন বাঁশী, একজন সারেঙ্গী, একজন সেতার, আর একজন নিয়ে বসেছে এসরাজের মত একটা যন্ত্র, তার একটা দিকে ময়ূরের মূর্তি বসানো, ওরা বললে, যন্ত্রটির নাম,—তাউস্।

আমাকে পাশে নিয়ে একদিকে বসে আছে নটরাজন হাতে ছোট্ট একজোড়া খঞ্জনি নিয়ে। পরনে ভারাহালুরই দেওয়া সিল্কের ধুতি, পাঞ্জাবি আর চাদর। অন্যদিকে একান্তে বসে নারায়ণ চন্দনচর্চিত ললাট, খালি গা, পরিধানে পট্টবস্ত্র। যন্ত্রীরাও তাই, খালি গা, পরনে পট্টবস্ত্র, ললাট চন্দনচর্চিত।

নৃত্যারতির আরম্ভে একটি মেয়ে প্রত্যেকের কপালে কুঙ্কুমের ফোঁটা দিয়ে গেল, এমন কি আমার কপালেও। মন্দিরে পূজার ঘণ্টা বেজে উঠতেই একযোগে সবাই প্রণাম জানালো দেবতাকে। পূজা শেষ। এইবার 'নৃত্য' শুরু হবে। সমস্ত মন্দিরটাই ভরে গেছে সুবাসিত ধূপ আর ধুনোর গন্ধে।

আলপাকা রংয়ের রেশমী কাপড় পরেছে ভারাহালু নাচবার উপযোগী করে। দুটি পা পেঁচিয়ে কাপড়ের দুটি প্রান্ত কটিদেশ বেষ্টন করে উঠেছে। একটি প্রান্ত তারপরে দু ভাঁজ হয়ে মেখলার মতো জড়ানো। অপর প্রান্ত, অর্থাৎ যেটি আঁচলের দিক, সেটি কোমর ছাড়িয়ে পিঠ দিয়ে বাম কাঁধে উঠে, আবার নেমে, বুকে কিছুটা ছড়িয়ে গিয়ে কটিবন্ধ ছাপিয়ে সামনের দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে ছত্রাকার পাখার মতো। পায়ে ঘুঙুর, কটিতে জরির-কাজ-করা কালো ভেলভেটের বন্ধনী, গলায় হার, হাতে দুগাছি ক'রে চুড়ি, বাহুমূলে বাজুবন্ধ, নাসিকায় আর কানে হীরের মত দ্যুতিময় শুভ্র পাথরের বিন্দু, শিরে—সিঁথিতে সোনার টিক্‌লি, বেণীবদ্ধ কেশরাশির মূলে একগুচ্ছ সেঁউতি ফুল, গায়ে আলপাকা রঙেরই চেলি।

রাত্রে প্রথম দর্শনে মেয়েটিকে একটু চটুল ধরনেরই মেয়ে ব'লে মনে হয়েছিল। কিন্তু কোথায় গেল সেই চটুলতা? ধুনুচিতে বাতাস করলে ধোঁয়া যেমন এঁকেবেঁকে চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে, মেয়েটির নৃত্যভঙ্গি দেখে আমার মনে হচ্ছিল, এঁকেবেঁকে তেমনি করেই যেন দেবতাকে আরতি করছে সে।

একসময় আমার কানে কানে নটরাজন বললে,—প্রাচীনকালে 'দাসী' তিন রকম ছিল। 'রাজদাসী', 'দেবদাসী', আর 'স্ব-দাসী। নাটমন্দিরের সামনে 'ধ্বজদণ্ড বা 'গরুড়স্তম্ভ' দেখলে না? ওর সামনে নাচত যারা, তাদের বলত 'রাজদাসী'। দেবতার সামনে যারা নাচত, তারা 'দেবদাসী'। আর 'স্ব-দাসী'রা নাচত বিশেষ কোনও উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাত্র। এরা নাকি ওর তিনটের একটাও নয়, এরা হচ্ছে 'দেববধূ'। এরা এসব নাচের জন্য নয়। এদের নাচ ছিল মাত্র লাস্যভাবের নাচ। মালাবারের কথাকলির কিছুটা প্রভাব আর তাঞ্জোরের মন্দির-নৃত্যের কিছু প্রভাব,—এই দুই মিলিয়ে ছিল 'মোহিনী আট্টম'। সরস্বতী আম্মার কাছে শুনেছি, 'মোহিনী আট্টম' ছিল 'দেববধূ'দের নাচ। অবশ্য এসব প্রাচীনকালের কথা।

মাথার উপরে দুটি হাত জড়ো ক'রে এবং কখনও বা দু হাত দু পাশে ছড়িয়ে

দিয়ে, চোখে আর হাতের ভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে, মাথা নাড়িয়ে, পায়ের ছন্দে তাল রেখে, চমৎকার নাচছিল ভারাহালু। নটরাজন বললে,—একে বলে আলারিপ্পু বা আলারিম্পু। কথাটার মানে হচ্ছে, ফুল দিয়ে সাজানো।

বললাম,—তা ঠিক। মেয়েটি যেন নৃত্যভঙ্গিতে ফুল দিয়েই তার দেবতাকে সাজাচ্ছে।

বললে,—সবই ও অল্পে অল্পে দেখাবে।

কিছুক্ষণ পরেই দেখি, দুটি মেয়ে বসে বসে অনেকটা আমাদের তানমালার মতো কী সব শব্দ উচ্চারণ করছে সুরে সুরে, আর নটরাজন নিজে উচ্চারণ করছে 'বোল', আর সঙ্গতি রেখে মেয়েটি নাচছে নানান ভঙ্গিতে।

এক সময় থেমে গেল মেয়েদের সুর, থেমে গেল নটরাজন। তারপরে নটরাজন বললে,—যেটা হলো একে আমরা বলি, যতিস্বরম। সঙ্গে কী সুর শুনলে? তোড়ি-বসন্ত। এবার 'পদম্' শোনো।

এবার আর-একটি মেয়ে শুরু করলো গান, সেই গানের অন্তর্নিহিত ভাব ধারাকে মুখের ভাবে ও অঙ্গভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলতে লাগলো ভারাহালু।

নটরাজন বললে,—এই সুরটিকে আমরা বলি, আনন্দ ভৈরবী।

ভারাহালুর নাচের তালে তালে মেয়েটি গাইছে,—মাঞ্চিদিনমু··· সুন্দর দিন! কেন সে আমার চোখের আড়ালে গেল? আড়াল থেকে সে আমাকে দেখছে লুকিয়ে লুকিয়ে, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না তাকে। সখী, তাকে আসতে বলো। তাকে আমি বুকের নিধি করে রাখবো। সখী, আমি কি তারই নই? আসছে না কেন? বলো যে আমাকে অতো ভালবাসে, তাকে আমি ছাড়বো কেমন করে?

নাটমন্দির থেকে দেবতার দিকে মুখ করলে সামনে পড়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপরেই মূল মন্দির, প্রথমে চত্বর, তারপরেই গর্ভগৃহ। ফুলের মালায় শোভিত হয়ে রূপোর পদ্মফুলের উপর দাঁড়িয়ে আছেন চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হাতে, মাথার উপরে চন্দ্রাতপ।

ভারাহালুদের 'পদম্' এর শেষ চরণটি শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতেই চোখ গেল গর্ভগৃহের দিকে। দেখি, চত্বরের এক কোণ ঘেঁষে এমনভাবে বসে আছে ভামতী, যাতে ক'রে সহজেই দেখতে পায় আমাকে।

আমাকেই সে দেখছিল নিষ্পলক চক্ষু মেলে। চোখে চোখ মিলে যেতেই তাড়াতাড়ি নত করেছে মুখ, যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাব ক'রে সামনের

থালায়-রাখা ফুল নৈবেদ্যর সঙ্গে সাজানো ধূপদানিটার নিবে-যাওয়া ধূপে করতে লাগল শিখা-সংযোগ ; অদূরের অতিকায় প্রদীপ-শিখাটি থেকে শলাকা দিয়ে ধূপের শিরে শিখান্তর।

দেখতে দেখতে একসময় শেষ হয়ে গেল 'আরঙ্গেত্রম্'। মেয়েরা এসে হাতে হাতে প্রসাদ দিলো। বর্ণনায় বাহুল্য এনে লাভ নেই, এবার যে-যার ফিরে যাওয়ার পালা, আমার চোখ কিন্তু সবার অলক্ষ্যে ভামতীকেই অনুসরণ করছে। গর্ভগৃহেই কিছুক্ষণের জন্য তাকে দেখলাম কী কী সব অনুষ্ঠানের মধ্যে। তারপর হঠাৎ সে ভিড়ে হারিয়ে গেল। নটরাজন আমার হাত ধ'রে বললে,—চলো, ঠাকুর প্রণাম ক'রে আসি।

—চলো।

নারায়ণও পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। একসময় নিম্নকণ্ঠে বললে,—এ মন্দির পুরানো নয়, প্রাচীন স্থাপত্যের কোনও নিদর্শন নেই। কংক্রীটে তৈরী। ঘনশ্যামদাসজী অনুগ্রহ করে 'দেবপল্লী'র জন্য করে দিয়েছিলেন। মূর্তিও তৈরী ক'রে আনিয়েছেন কাশী থেকে।

মেয়েরা এদিক-ওদিক দিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল, প্রণাম ক'রে চলেই যাচ্ছে এবার। কিন্তু কোথায় ভামতী ?

নটরাজন আমার হাত ধরে বললে,—চলো। এবার শ্রীকৃষ্ণের মূল মন্দিরে। সবাই প্রণাম করতে যাচ্ছে।

—চলো।

মূল মন্দিরেও সে নেই। তার অন্য সব মেয়েদের নিয়ে নারায়ণ প্রণাম সেরে চলে গেল। অন্য সব মেয়ে, কিন্তু সরোজা নয়, সরোজাকে কোথাও দেখতে পাই নি, সম্ভবতঃ সে আসেই নি, যোগই দেয়নি এই অনুষ্ঠানে। এলে, নিশ্চয়ই দেখা মিলতো। যাই হোক ওদের পিছনে পিছনে আমরাও চলে আসছিলাম। নটরাজন হাত ধরে টেনে বললে,—এসো।

কোথায় ?

—এসোই না ?

মন্দিরের পাশের সেই ঝিলটা। বাঁধাঘাট ছাড়িয়ে সে ঘাটের বিপরীত দিকে নিয়ে এলো। হঠাৎ দেখতে পেলাম বিশ্বনাথম্‌কে। চোখে তার সেই পুরু কাচের চশমাটা নেই, ভাল দেখতেও পাচ্ছে না বোধ হয়, আন্দাজে পা ফেলে চলছে। স্নান-টান সেরে পট্টবস্ত্র পরে একটা কলাপাতার ঠোঙায় বাগান থেকে

নানান ফুল তুলছে, সঙ্গে একটি মেয়ে। দূর থেকে ঠিক চিনতে পারলাম না। কিন্তু এত সকালে ওরা ওখানে কেন?

ওই দিকে নটরাজনের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললাম,—কী ব্যাপার!

নটরাজন বললে,—ওসব বুঝবে না। নারায়ণের ব্যাপার। পুজা-অর্চনা বার-ব্রত এসব লেগেই আছে। আমি ওসব জানিও না বুঝিও না, তবে ভালোবাসি নারায়ণভাইকে, সে তো তুমি জানো।

গাছপালার আড়ালে একটা গাছের ছায়ায় নিরিবিলিতে আমরা বসলাম।

কিছুটা দূরেই সেই বৃদ্ধ বেলগাছটা, যার পায়ে এসে আমি ভামতীরই লুকিয়ে-রাখা ফুল কুড়িয়ে নিয়ে যেতাম। জিজ্ঞাসা করতাম,—কী নাম হবে তোমার কাল?

মুচকি হেসে বলতো,—বুড়ো বেলগাছটার পায়ে গিয়ে সাধ্য-সাধনা করো, জানতে পারবে।

গাছটার দিকে তাকাতে তাকাতে সেই 'সাধ্য-সাধনা'র কথাই মনে পড়ছিল। আর আশ্চর্য হচ্ছিলাম নিজের শরীরের অবস্থা দেখে। কাল সারাটি রাত ঠায় জেগে কাটিয়েছি, কিন্তু তা বলে শ্রান্তিতে ভেঙে পড়ছে না তো শরীর, ঘুমও তো আসছে না চোখ জড়িয়ে! তবে কি ঝিলের জলে রাত থাকতে উঠে স্নান করারই ফল এটা? ঐ তো সেই বাঁধাঘাট, যেখানে লণ্ঠনের আলোয় স্নান করেছিলাম কাল রাত্রে।

চুপচাপ বসে কী যেন ভাবছিল নটরাজন, হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠল,—কী ভাবছো?

—কিছু না।

বললে,—তোমাকে কয়েকটা কথা বলবো ব'লে ডেকে আনলাম। অবাক হয়েছো কাল রাত্রে আমার অবস্থা দেখে, না?

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ও কী বলতে চায়! তবু সরাসরি কথাটা না তুলে বললাম,—খুব আশ্চর্য হই নি। ভামতী ভালবাসার মতই মেয়ে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—ছি-ছি, সে-কথা আমি বলি নি। সে মালা ছিঁড়ে গেছে বহুদিন, সে উন্মাদনা আর অনুভবও করি না। আমার সমস্ত মন ছেয়ে থাকে ওই বীণা আর ওর স্বর। আমি সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছি। অবাক হও নি তো?

বললাম,—খুব না। কী একটা বিদেশী পত্রিকায় যেন একবার পড়েছিলাম এক

বিদেশী বেহালা-বাদকের কথা। তার কাছে তার বেহালাটাই ছিল যেন এক তরুণী নারীশরীর। বেহালায় হাত দিয়ে সে যেন তার প্রিয়তমারই স্পর্শসুখ অনুভব করতো!

উচ্ছ্বসিত হয়ে ব'লে উঠলো নটরাজন,—তা হলে সত্যিই এটা হয়! আমি পাগল হয়ে যাই নি তো! মাঝে মাঝে মনে হতো, আমি বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি তো অদ্ভুত লোক! এই শুনতাম, অরসিক বিজ্ঞানী তুমি, মাটির নিচে কোথায় লোহা আর কোথায় কী পাথর, এই সবেরই খোঁজ করে বেড়াও, এখন দেখছি, রসের খোঁজও রাখো। বিদেশী বেহালা-বাজিয়ের খবরও তো রেখেছো দেখছি!

ঈষৎ লজ্জিত হয়েই বলে উঠলাম,—ও কিছু নয়। হঠাৎ চোখে পড়ে গিয়েছিল পত্রিকাটা। আসলে কাঠখোট্টা মানুষ আমি, কোদালকে কোদাল বলাই আমার অভ্যাস। আজেবাজে স্বপ্ন দেখি না।

—কিন্তু আমি দেখি, নটরাজন আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগলো, —সেটা বলবো বলেই ডেকে আনলাম তোমাকে। আমি তামিলনাদের লোক, ভারাহালুকে আমাদের তাঞ্জোরের ভারতনাট্যম্ শিখিয়ে আমার সুখী হবারই কথা। তুমি তো জানো, আমার স্বপ্ন—ওদের মধ্য থেকে আমি গায়িকা আর নৃত্যশিল্পী গড়ে তুলবো। কিন্তু তার থেকেও বড়ো সাধ, বড়ো স্বপ্ন আমার আছে।

—কী?

বললে,—অন্ধ্র মেয়েকে ভালবাসতে গিয়ে সারা অন্ধ্রদেশটাকেই ভালবেসে ফেলেছিলাম। ভারতনাট্যমেরই একটি প্রায় অপ্রচলিত প্রাচীন ধারাকে অন্ধ্রদেশ ধরে রেখেছে। বহু যত্নে সেই ধারাকে আমি আয়ত্ত করেছি। আমি সেই ধারায় শিক্ষিত ক'রে যেতে চাই এদের অন্তত একজনকেও।

—কেন?

—প্রচার হোক এই ধারার। যদিও এ নাচ পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমাদের দেশের 'দাসী আট্টম্' যেমন পুরুষরা শিখছে, এ নাচটাও মেয়েরা শিখুক, ক্ষতি কী? কিন্তু বড় শ্রমসাধ্য সে নাচ। বড় যত্ন, বড় নিষ্ঠার দরকার। আমার শরীর ঠিক তার উপযুক্ত নয়, এ নাচের উপযোগী শরীরে চাই সুগঠিত মসৃণ দেহলাবণ্য। যার মধ্য দিয়ে এ নাচ বেঁচে থাকবে, যার মধ্য দিয়ে এ নাচের প্রকৃত রূপায়ণ দেখতে পাবে লোকে।

বললাম,—কিন্তু নাচটা কী ?

বললে,—কৃষ্ণানদীর অববাহিকায় প্রাচীন একটি গ্রাম আছে, তার নাম, কুচিপুডী। প্রায় চার শো বছর আগের সৃষ্টি এই নৃত্যধারা। তাঞ্জোরপ্রবাসী এক তেলেগু ব্রাহ্মণ, তীর্থনারায়ণ, তিনিই এর মূল প্রেরণা। পরম ভক্ত ছিলেন তিনি, গান করতেন 'গীতগোবিন্দম্,' তোমাদেরই দেশের কবির রচনা। এঁরই শিষ্য সিদ্ধেন্দ্র যোগী রচনা করেছিলেন 'পারিজাত-অপহরণ' নামে এক নৃত্যনাট্য। তাঞ্জোর থেকে কুচেলাপুরমে এসে (তখন 'কুচিপুডী'র নাম ছিল 'কুচেলাপুরম্) ওখানকার ছেলেদের শিখিয়ে পড়িয়ে শুরু করলেন সেই নৃত্যনাট্য-প্রদর্শনী। এই নৃত্যধারারই নাম, 'কুচিপুডী' নৃত্য। এই নৃত্যের মূল প্রেরণা কিন্তু তোমাদেরই কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্'। পরে ভাগবতের আরও উপাখ্যান গ্রহণ করা হলো। 'পারিজাত-অপহরণ' বা 'ভাম-কলাপম্' তার মধ্যে বিশেষ একটি।

কথাটা শুনে একটু চমকেই উঠলাম এতক্ষণে, বললাম,—কী বললে, ভাম-কলাপম্ ?

হ্যাঁ। শুনেছো নাকি কথাটা ?

—শুনেছি। ভামতীর কাছ থেকে।

আমার দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ, বললে,—ভোলে নি তা হলে ?

—কী ?

নটরাজন বললে,—ভামতীর সুসম শরীরই এই নাচের উপযুক্ত। 'সত্যভামা'র ভূমিকায় এখানকার এতো মেয়ের মধ্যে মানায় মাত্র ওকেই।

—শেখাও না কেন ?

মুখ নিচু করল নটরাজন, কেমন বিরস বিবর্ণ মুখে বললে,—শিখতে চায় না।

—কেন ?

—কে জানে !—বলেই ফিরলো আমার দিকে,—তুমি ওকে কতো ভালোবাসো জানি, কিন্তু দেখো, ওর ঐ অপরূপ দেহছন্দ যেন ভেঙে না পড়ে। স্বাস্থ্য নইলে এ নাচ হয় না, প্রচুর দম না থাকলে এ নাচে সফল হওয়া যায় না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলাম,—নটরাজন ?

—কী ?

—তুমি ওকে চাও, এ কথা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করো কেন ?

তাড়াতাড়ি বলে উঠলো নটরাজন,—না ভাই, সেটা সত্য নয়। বিশ্বাস করো, উপভোগে আমার রুচি নেই, আমার রুচি শিল্প-সৃষ্টিতে।

বললাম,—ভালও ওকে বাসো তুমি মনে মনে।

বললে,—মনে-মনেই যদি তা থেকে থাকে, বাহ্যিক প্রকাশ যদি তার না ঘটে থাকে, তাতে কি কোন ক্ষতি হয়েছে?

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম,—কিছুমাত্র না। ঐ যে বীণা তুমি রাত্রে বাজাও, ও তোমার ভামতীরই প্রতীক।

বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো নটরাজন।

কী মনে করে নারায়ণের কাছে আর গেলাম না, গেলাম না ভামতীর বাসাতেও, দরজার কাছে গিয়েও ফিরে এলাম। কী এক প্রচ্ছন্ন অভিমান বুকে বয়ে ফিরে এলাম নিজের বাসায়, রামদাসজী আর পাম্বলুর সংস্পর্শে।

দুজনে বোধ হয় ঘনশ্যামদাসজীর সেই চাদর-পাতা গদিতেই বসে বৈষয়িক কথাবার্তায় মগ্ন। আমার আসাটা ওরা বোধ হয় প্রথমটায় লক্ষ্য করে নি। আমি দোতলায় সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উঠেও আবার নেমে গেলাম। ভঙ্গিতে একটা খুশির আমেজ এনে হাঁকডাক ক'রে উঠলাম,—কই, পাম্বলু এসেছো নাকি? রামদাসজী কোথায়?

বন্ধ হয়ে গেল ওদের কথাবার্তা, আমি ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। রামদাসজী সমাদরে আহ্বান জানালেন,—আসুন বাবুজী।

বললাম, তেমনি সতেজ আর উৎসাহপূর্ণ আমার কণ্ঠস্বর,—রামদাসজী, আমার প্রস্‌পেক্‌টিংয়ের কাজ বহুদিন হলো পড়ে আছে, আজ আমি বেরিয়ে পড়বোই। জনা তিনেক কুলি তুমি জোগাড় করো তো পাম্বলু।

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন রামদাসজী, বললেন,—সে হবে 'খন। এই বোধ হয় এলেন, আগে একটু বিশ্রাম করুন।

—বিশ্রাম আমার হয়ে গেছে, আমি এখুনি বেরুতে চাই। চা খেয়েই।

রামদাসজী বললেন,—তা হলে এখানেই চা খান। আমি ভজুয়াকে বলি।

বললাম,—চা খান আপনি? আপনার বাবা কিন্তু খেতেন না।

হেসে উঠলেন রামদাসজী,—বাবা সেকেলে মানুষ।

একটু পরেই রামদাসজীর খাস চাকর চা করে নিয়ে এলো। সঙ্গে মাখন-মাখানো পাউরুটির টোষ্ট আর কিছু বিস্কুট।

বললাম,—সবই নব্য আয়োজন দেখছি।

রামদাসজী একটু হাসলেন শুধু, কিছু বললেন না।

খেতে খেতে বললাম,—আপনার বাবার সেই পোষা ইঁদুর বাচ্চুর কথা মনে পড়ছে। এমনি সকালবেলা ডাকলেই সে আসতো।

—না বাবুজী,—রামদাসজী বললেন,—গণেশজীর বাহন হিসাবে ইঁদুর পোষার সংস্কার আমার নেই। কিন্তু সে কথা থাক্। প্রস্পেক্‌টিংয়ে যে যাবেন, তার আগে আপনার সঙ্গে আমার একটু জরুরী পরামর্শ আছে।

—বলুন ?

—বলছিলাম কি, প্রস্পেক্‌টিং ক'রে আর কী হবে ? এখানকার ব্যবসা ফলাও করার ইচ্ছা আমার নেই।

ওঁর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালাম, বললাম,—তার মানে ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানির ব্যবসা করার ইচ্ছে আপনার নেই !

—আছে। যে-কোয়ারিতে আপনি পরীক্ষা করেছেন, এই কোয়ারিই যথেষ্ট। কোয়ারি আর বাড়াতে চাই না।

কিন্তু আমার মন যা সেই মুহূর্তে চাইছিলো, সে হলো কাজ। যত সত্বর সম্ভব কাজের মধ্যে ডুবে যাওয়া। কেন তা জানি না, কাজের নেশা আমায় তখন পেয়ে বসেছে। উঠে দাঁড়ালাম, বললাম,—বেশ। কিন্তু আমি প্রস্পেকটিং বন্ধ করবো না ! এই পাহাড় অঞ্চলটায় ভালো পারসেণ্টের 'ম্যাঙ্গানিজ ওর' পাবো ব'লে আমার বিশ্বাস। আমি আরও স্যাম্পল্ তুলে আমার হেড-অফিসে পাঠাবো, তারা অন্য পার্টি খুঁজবে। আপনি ও-অঞ্চলটা 'লীজ' নিয়েছেন, একটা 'ট্যাক্স' আপনি পাবেনই।

—সে-কথা ভাবছি না বাবুজী।—বলতে বলতে রামদাসজীও উঠে দাঁড়ালেন, বললেন,—ব্যবসাতে টাকা ফেলতে কসুর করবো না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে অন্য কথা। 'ম্যাঙ্গানিজ ওর' আমাদের ন্যাশনাল ওয়েল্‌থ, এ-কথা মানেন তো ?

—নিশ্চয়ই।

—বিদেশী সওদাগর এসব নির্বিচারে বাইরে চালান দিতো, কিন্তু স্বাধীনতার পর আমরা তা করবো কেন ? 'ওর' চালান দিতে দিতে একসময় দেউলে হয়ে যাবো না ?

বললাম,—হাসালেন আপনি। ভারতবর্ষ অঢেল দিতে পারে। কত নেবে নিক না ওরা।

—এ-কথা অনেক কাল আগে, যখন প্রথম আসতে লাগলো বিদেশী সওদাগর, তখন ভেবেছিল সবাই। ভেবেছিল, কত নেবে, নিক না। ভারতবর্ষে মণি-মাণিক্যের অভাব আছে? অঢেল দিয়েও ফুরাবে না। কিন্তু ফুরিয়েছিল। আজ আমরা ভিখারী। নয় কি?

ওর মুখের দিকে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। একটু হেসে রামদাসজী বললেন,—কী, ভূতের মুখে রাম নাম শুনে অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন, ব্যবসায়ী লোকের মুখে এ কী কথা! হ্যাঁ বাবুজী, যুগটাও নতুন, আমি লোকটাও নতুন। আমার বাবার চিন্তার সঙ্গে আমার চিন্তা একেবারেই মিলবে না।

—বুঝলাম। কিন্তু ডলার আর্নিংয়ের অন্যতম কমোডিটি এই ম্যাঙ্গানিজ, কমার্সের ছাত্র হয়ে এটা ভুলবেন না।

— হাসলেন রামদাসজী, বললেন,—সেটা গভর্ণমেণ্টের ভাববার কথা, আমার নয়। একবার তো গভর্নমেণ্ট রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এক অচল অবস্থার। বিদেশ থেকে দরকারী জিনিসপত্রের আমদানি বন্ধ হয়ে গেল। অতএব বাধ্য হয়ে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম,—কিন্তু সেসব কূট প্রশ্নে আমাদের দরকার কী? প্রস্‌পেক্‌টিং ক'রেই দেখা যাক না, কোথায় কী সম্পদ আছে! সঙ্গে সঙ্গেই 'কোয়ারি' তৈরি করে মাল তুলে যে রপ্তানি করতে হবে, তার কী মানে আছে?

রামদাসজী বললেন,—তাতে আপনার সঙ্গে হাত মেলাতে আমি রাজী। কোয়ারিও করবো, যদি দেশী ফ্যাক্টরি মাল নেয়। আসল কথা, দেশের জিনিস দেশেই থাকুক আমাদের কাঁচা মাল নিয়ে বাইরের লোক যে সেটা দিয়েই অস্ত্র তৈরি ক'রে আমাদের ওপর ফেলবে, এটা মেনে নিতে রাজী নই।

—ব্রেভো!—বললাম,—একমত আপনার সঙ্গে। তা হলে আমরা বেরিয়ে পড়ি এখন, কী বলেন?

রামদাসজী বললেন,—দাঁড়ান, আমিও যাবো।

অতএব পূর্ণোদ্যমেই কাজ আবার শুরু হলো। যা চেয়েছিলাম।

সারাটা দিন খাটবার পর সন্ধ্যায় দু চোখ ভরে জড়িয়ে এলো ঘুম। ঘুমে টলতে টলতে বাড়ি এসে শুয়ে পড়লাম, উঠলাম যার নাম সেই বেলা আটটায় একেবারে। রামদাসজীও সমানে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। আবার বেরুলাম, আবার সন্ধ্যায় ফিরলাম শ্রান্ত হয়ে। এমনি করে পর পর তিনটি দিন। চতুর্থ দিন রামদাসজী বললেন,—আজ একটু বিশ্রাম নিন।

পাম্বলুও সমর্থন করলো সে-কথা। অস্বীকার করবো না, মনে মনে একটু বিরতি চাইছিলামও।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এ কয়দিন কেউ আসে নি আমার খোঁজ করতে। নারায়ণও না, বিশ্বনাথম্‌ও না।

সন্ধ্যায় বললাম রামদাসজীকে,—আমি একটু বেড়িয়ে আসছি। আজ রাত্রে নাও ফিরতে পারি। আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে রামদাসজী?

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি, বললেন,—না

তারপর একটু থেমে থেকে আবার বললেন,—বাবুজী, একটা কথা ভাবছি। ভাবছি 'দেবীপল্লী' উঠিয়েই দেবো। ও-বাড়িটাকে ধর্মশালা বানিয়ে দেবো। আপনি কী বলেন?

বললাম,—তা কেন? ওরা কী অপরাধ করলো? কিছু করবেন না।

—বেশ। আপনি যখন বলছেন, তখন—

—হ্যাঁ, আমার কথাটা আপনাকে রাখতেই হবে।

ব'লে দ্রুতপায়ে চলে এলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে কিছুটা রাত হয়ে গেছে ততক্ষণে। সোজা গেলাম ভামতীর বাড়ি। হয়তো অভিমান করবে, রাগও করবে। আমি তা করবো না। বলবোও না কিছু। শুধু বলবো,—কাজের চাপ পড়তে পারে না? আমি কি কুঁড়ে, অকেজো লোক নাকি?

দরজা ভেজানোই ছিল। ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। বুড়ী ঝিটির পাশ কাটিয়ে একেবারে সরস্বতী আম্মার ঘরে। দেখলাম, অনেকটা সুস্থ তিনি। বালিশের পর বালিশ সাজিয়ে, তাতে ঠেস দিয়ে বসে আছেন জানালার দিকে মুখ ক'রে। ঘরে আর-কেউ নেই।

পায়ের শব্দে মুখ ফেরালেন, আমাকে দেখে স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে গেল তাঁর মুখ, বললেন,—এ কয়দিন আসো নি কেন?

বললাম,—ভামতী কোথায়?

—ও-বাড়ি গেছে।

—ও!

বসে বসে ওঁর সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম, আর প্রতিটি মুহূর্তেই আশা করতে লাগলাম তাকে। এখুনি ফিরে এসে আমাকে দেখে সে চমকে যাবে। প্রথমেই হয়তো কথা বলবে না, মুখ ভার ক'রে থাকবে। কিন্তু সময় পার হতে লাগলো। কোথায় সে? অবশেষে বলেই ফেললাম,—এখনও আসছে না কেন?

—কে? ভামতী? সে তো আসবে না। আজ থেকে ও বাড়িতেই সে থাকবে।

মনে মনে চমকেই উঠলাম বলা যায়। মুখ দিয়ে আপনিই বার হয়ে গেল,—কয়েকটি দিন তার ছুটি ছিল না? এর মধ্যে ছুটি ফুরিয়ে গেল?

—না। কিন্তু কী যে মেয়ের মতিগতি, অত করে তোমার নাম ধরে বললাম সে আসবে। তবু শুনলো না, জোর ক'রে চলে গেল। বললে, তুমি ভাল হয়ে গেছো মা, মিছিমিছি ছুটির দরকার নেই।

বললাম,—দাঁড়ান, তাকে ধরে নিয়ে আসছি।

কিন্তু কাকে? নারায়ণ খাতার পাতায় দেখালো তার নাম, 'বেলফুল'—লালকালি দিয়ে কাটা।

ছুটে চলে এলাম। ভাবতে গেলে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু মন সেটি আর সহজ ভাবে নিতে পারলো না। ধাক্কা খেলাম, মিশ্র একটি অনুভূতি হলো। রাগ, অভিমান, বিতৃষ্ণা, সবই যেন পর্যায়ক্রমে ক্রিয়া করতে লাগলো মনের মধ্যে। সরোজার কথাগুলো মনে হতে লাগলো, আর তার পাশাপাশি ওর চিন্তাধারা। আজ কথা বলতে কি, সে রাত্রিটা যেন একটি অশান্ত দুর্নিবার ঝড়ের মধ্য দিয়েই আমার কেটেছিল। কোনক্রমে নিদ্রাবিহীন রাতটা কাটিয়ে—পরদিন সকালেই গেলাম সরস্বতী আম্মার বাসায়। মাকে দেখতে নিশ্চয়ই একবার সে আসবে। মিথ্যা হলো না আমার অনুমান, দেখা হলো তার সঙ্গে। সরস্বতী আম্মার বাসায়। সরস্বতী আম্মা ধীরে ধীরে উঠে গেলেন পাশের ঘরে, পূজোয় বসতে। আর ও দাঁড়িয়ে রইলো অদূরে, জানালার কাছে দুটি লোহার শিক শক্ত ক'রে দু হাতে ধরে।

বললাম,—তাড়াতাড়ি ও-বাড়িতে ঢুকলে কেন? আমায় এড়াতে? কী অপরাধ আমি করলাম?

উত্তর এলো না। উঠে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার করলাম আমার প্রশ্ন। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই! একটা হাত ধরতেই ঝাঁকি দিয়ে ফেলে দিলো, বললে,—সে রাত্রে খেতে এলে না কেন?

—তুমি তো জানই।

—আমার থেকে নটরাজনের বীণাই তোমার কাছে বেশি হলো?

বললাম,—সে বীণা যে তুমিই।

—তার মানে?

বললাম,– নটরাজনের কাছ থেকে সেদিন আমি সব শুনেছি, সব বুঝেছি।

—কী বুঝেছো! বলে চট করে ফিরলো আমার দিকে, তারপরে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো,—কিচ্ছু বোঝো নি। বোঝা অত সহজ নয়।

বলে উদ্‌গত অশ্রু রোধ করতেই সম্ভবত ছুটে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। আমি পিছন পিছন অনুসরণ করে গিয়ে দেখলাম, রান্নাঘরের আগড়টা সে টেনে বন্ধ করে দিলো। বুঝলাম, এখন আর সে বেরুবে না আমার সামনে। চলেই আসছিলাম, হঠাৎ কী মনে করে ফিরে গেলাম আগড়ের কাছে। প্রশ্ন করলাম,— নামটা জানতে পারি কী? আজ কী নাম হবে তোমার?

বন্ধ আগড়টার ও-পাশ থেকে উত্তর এলো,—জানি না, যাও।

সরস্বতী আম্মা পূজায় বসেছেন। গোলযোগ না বাড়িয়ে চলে এলাম চুপিচুপি। কিন্তু আশ্চর্য কালরাত্রির ঝড় আর নেই, মনটা অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেছে। আর সেটা অনুভব ক'রে নিজেও কম অবাক হয়নি।

যাই হোক, সে সন্ধ্যায় একটু তাড়াতাড়িই গেছি। নিজেরই ব্যস্ততার জন্য প্রথমটায় চোখ পড়ে নি। হাতবাক্সটার কাছে খাতা খুলে দুজনেই ওরা বসে থাকে, নারায়ণ আর বিশ্বনাথন্‌। নারায়ণ আমাকে দেখামাত্রই কী যেন বলতে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিলো বিশ্বনাথম্‌, বললে,—আজ তোমাকে অনিয়ম করতে দেবো না। ফুলের নাম করুক বাবুজী! নবগ্রহ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা এভাবে ভাঙলে পাপ হবে না তোমার?

নারায়ণ তাকালো তার দিকে, বললে,—কিন্তু তুমি তো ধর্ম মানো না?

বিশ্বনাথম্‌ বললে,—ট্রেডের খাতিরে মানছি। এটা আমার ট্রেড। জীবিকাও বটে।

—কী বললে!

বিশ্বনাথম্‌ স্বর নামিয়ে বললে,—যাই বলে থাকি, অনিয়ম তুমি করতে পারবে না। নাম করবেন বাবুজী? ফুলের?

করলাম কী যেন একটা ফুলের নাম। টাকাটা হাত পেতে নিয়ে বিশ্বনাথম্‌ বললে,—আসুন আমার সঙ্গে।

গেলাম ভিতরে। কিন্তু এ যে অন্য মেয়ে! বললাম,—না। থাক্‌।

—না বাবুজী, তা হবে না।

—তার সঙ্গে যে আমার দেখা হওয়া দরকার।

—উপায় নেই।

বললাম,—বেশ। এই মেয়ের সাহায্য নিয়েই তার সঙ্গে দেখা করবো।

—পারবেন না। তাকে আমি নিজে গিয়ে সাবধান করে দিচ্ছি। তার ধর্মভয় আছে। সে সাহস করবে না। আর আপনি যদি জোর-জবরদস্তি করেন, এবং তাতে নারায়ণ যদি আমাকে সাহায্য না করেন, তা হলে আমার যে লোকবল নেই, তা ভাববেন না।

অদ্ভুত রুক্ষ আর কঠিন দেখাচ্ছিল বিশ্বনাথমের মুখ। বললে,—আমিই এখন এখানকার পুরোহিত, নারায়ণ নয়।

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম,—তার মানে!

—মানে অনেক—

বিশ্বনাথম্ বললে,—নারায়ণকে কতটুকু জানেন আপনি? ও যে ব্রাহ্মণ-সন্তান, তা জানেন? এখানকার এই কাজটা করতো ব'লে নিজেকে 'বৈশ্য' বলে পরিচয় দিতো। অথচ এর কোনো দরকার ছিল না। এ-ও এক ধরনের চীপ্ সেন্টি-মেণ্টালিটি।

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ওর কথা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করছিলাম। নারায়ণ চরিত্রের যেন অন্য একটি দিক আমার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হচ্ছিল। ব্রাহ্মণের 'বৈশ্য' অর্থাৎ 'বণিক' সাজা, এ যেন এক সুগোপন কান্নারই রূপান্তর বলে মনে হচ্ছিল। সত্যিই তো, কতটুকু আমরা জানি মানুষের মনের আর জীবনের? কতটুকু জানতে পারি বাইরে থেকে?

বিশ্বনাথম্ বললে,—আমার ওসব সেন্টিমেণ্ট নেই। পিতৃপরিচয়হীন এক অভাগা মায়ের কোলে এসে জন্মেছিলাম। ঘা খেয়ে ঘা খেয়ে বড়ো হয়েছি। তবে এখানকার এসব মানতে হয়েছে ডিসিপ্লিনের জন্য। আপনাদের ওসব ভাবালুতার অর্থ বুঝি না। প্রীতি, প্রেম—এসবই পরিবর্তনশীল। তবে অত কাতর হন কেন?

—কে বললে! কাতর আমি হই নি।

—না হলে খুবই ভালো।—ব'লে সে সরে গিয়ে দাঁড়ালো অদূরে, একটা থামের পাশে।

উদ্দিষ্ট এবং অপেক্ষমান মেয়েটি বোধ হয় আমাকে চিনেছিল। বললে,—কবি, আসুন! নাচ দেখাবো।

—তাই চলো।

কোনো কিছুতে কাতর যে হইনি, তা বোঝাবার জন্যই ওর সঙ্গে ওর ঘরের

ভিতরে গিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু বসলে হবে কী, মন কিছুতেই স্থির হচ্ছিল না। কী যে সুর বাজালো যন্ত্রীরা, কী যে নাচ মেয়েটি নাচলো, কে জানে! শুধু মনে পড়ছিল, নাচটা ছিল খুব দ্রুত লয়ের। অন্যমনস্ক চিত্তে নাচ দেখতে দেখতে একবার মনে হয়েছিল নটরাজনের কথা। কিন্তু তার ধ্যানভঙ্গ ক'রেই বা লাভ কী?

অবসন্ন মন নিয়ে একসময় উঠে চলে এলাম বাইরে। নৃত্যশ্রমক্লান্তাকে যে ছুঁতে নেই, এ নিয়মটা থাকায় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। মেয়েটা কী যেন খাবার এনে রেখেছিল সামনে, বার বার অনুরোধ করেছিল খেতে। সামান্য একটু মুখে তুলেছিলাম মাত্র, খাওয়ার স্পৃহা ছিল না। নারায়ণ তেমনি বসে ছিল তার আসনে, বললে,—বিশ্বনাথম কই?

বললাম,—কে জানে! ভিতরেই হবে। পাহারা দিচ্ছিল আমাকে। যাতে ভামতীর কাছে না যাই।

শুনে, কী আশ্চর্য, হঠাৎ ছলছল করে এলো নারায়ণের দুটি চোখ। বললে,—তোমার ব্যথা বুঝি! কিন্তু আমারও কিছু করবার নেই।

—জানি।

সে বললে,—বিশ্বনাথম্ গেছে সরোজার কাছে, তাকে বোঝাতে। অথচ সরোজা কি কিছু বুঝতে চাইবে? চাইবে না। সে চলে যাবেই।

—কোথায়!

নারায়ণ বললে,—কাশীতে। আমাকে সঙ্গে নিয়ে।

—তুমি!

—হ্যাঁ। এখানকার সব ভার ঐ বিশ্বনাথমের উপর দিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি কাল।

—কেন?

আমার চোখের দিকে তাকালো, একটুক্ষণ নীরব থেকে তার পরে বললে,—ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণের কাজ করলাম না, বৈশ্যবৃত্তি করে কাটালাম।

—কে না কাটাচ্ছে এ-যুগে!—বললাম,—কিন্তু যাচ্ছো কেন হঠাৎ?

—হঠাৎই একদিন যেতে হয়।—বললে,—যা ঘটতে একদিন তোমরা দেখ, সত্যিই কিন্তু একদিনে তা ঘটে না, তার পিছনে থাকে বহুদিনের অলক্ষ্য প্রস্তুতি। যা হয়, তা হবার জন্য অনেক দিন থেকেই নেপথ্যে আয়োজন গড়ে ওঠে। তবে ভাই, এ-ও জানি, যাচ্ছি বটে, কিন্তু ভয়ানক কষ্টেই কাটবে বাকিটা জীবন।

—কেন?

বললে,—অপরাধ করেছি নবগ্রহের কাছে। এঁরা বড জাগ্রত দেবতা। নিস্তার নেই।

—কিন্তু অপরাধটা কী?

উত্তরে যা বললে নারায়ণ, সে এক অভূতপূর্ব কাহিনী। বললে,—শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরের সংলগ্ন যে ঝিলটা দেখছো, তাতে স্নান ক'রে ওরা ফুল তুলে আনে বাগান থেকে সেই ভোরে। তারপরে মন্দিরে পূজা দিয়ে ফিরে আসার সময় হয় একটা লটারি। নয়টি ফুলের নামে নামকরণ হয় মেয়েদের। আমিই পুরোহিত হতাম নিজে এ ব্যাপারে। কিন্তু—

—কিন্তু কী?

কেমন যেন কেঁপে গেল ওর কণ্ঠস্বর, বললে,—সরোজা আসবার পর পৌরোহিত্য আমার গেল। বিশ্বনাথমের ওপর এ সব ভার দিয়ে আমিও হয়ে দাঁড়ালাম পথিকদের একজন। বিশ্বাস করবে? সেই যে তুমি গিয়েছিলে 'সেবন্তী'র কাছে? তারপর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে খেরো-বাঁধানো খাতাটি খুলে নাম দেখে রাখতাম সরোজার। কিন্তু একবার মনে হলো নবগ্রহের মূর্তি ছুঁয়ে এ কী মিথ্যাচরণ ক'রে চলেছি আমি! আমারই নিয়মের অস্ত্র একদিন আমারই ওপর এসে পড়লো। সেদিনই সত্যি করে' বুঝলাম, এ অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা কতখানি। যার ওপর পড়ে, কী নিদারুণ যন্ত্রণাই না তাকে পেতে হয়!

বড়ো ক্লান্ত বড়ো বিষাদময় মনে হল চেট্টিবাবুর কণ্ঠস্বর, বললে,—ঘটনাটা শুনতে চাও ভাই?

—চাই।

বললে,—একদিন সন্ধ্যায় নিজের পূজা শেষ করতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল মন্দিরে। এসে দেখি, সেদিন ওর নাম হয়েছে কৃষ্ণচূড়া। আর সেই নাম লাল-কালি দিয়ে কাটা। যন্ত্রণায় ছটফট করে মরেছি, সারারাত ঘুমোতে পারিনি। সে যে কী দাহ, সে কী মর্ম-বেদনা, তা ভাষায় তোমাকে আমি বোঝাবো কতটুকু? সত্যি ভাই, সেদিনই বুঝলাম, কী মর্মান্তিক কষ্ট হয় তোমাদের, যেদিন দেখা পাও না তোমাদের মনোমত সঙ্গিনীর। কাছে আছে, অথচ নেই। এর থেকে দূরে থাকা অনেক—অনেক ভালো।

তুমি ত জানো, এখানকার নিয়ম কানুনের ব্যাপারে কতটা কঠোর ছিলাম। সেদিন নিজের মনে কিন্তু অনুশোচনার আর অন্ত ছিল না। বিশ্বনাথ শুনে পরিহাস করতে লাগলো, বললে,—তুমিও ভেঙ্গে পড়লে শেষ পর্যন্ত? কথাটির

উত্তর দিতে পারিনি। বিশ্বনাথ বললে,—তোমার মনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সরোজা যে তোমার মনের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছে এটা বোঝো নি? এ যে দেখছি সরোজারই জয় হলো।

একবারও উত্তর দিতে পারিনি।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নারায়ণ আবার বললে,—শেষ পর্যন্ত সরোজা নিজেই একদিন এসে সামনে দাঁড়ালো প্রেতিনীর মতো। ওর সেই রূপকে আমি বরাবর বড়ো ভয় করি। বললাম,—এমন করছো কেন?

দুঃখে ক্ষোভে ও যেন বিহ্বল হয়ে গেছে, বললে,—এই জন্যে কি এখানে এসেছিলাম? আর সহ্য করবো কতো? আমিও ত রক্ত মাংসের মানুষ।

—রক্ত মাংসের মানুষ আমিও,—বলতে আরম্ভ ক'রে একে একে সবই ওকে খুলে বললাম। মন দিয়েই ও শুনলো।

তারপরে একসময় অসহিষ্ণু হয়েই ও বলে উঠলো, বুঝি না আমি সে সব। আমি সমস্ত ছেড়ে-ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসতে পেরেছি, তুমি তা পারো না?

বললাম,—পারতেই হবে।

—তাই কাল আমরা দুজনে চলেই যাচ্ছি ভাই।

সত্যিই তাই হলো, স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়, পরদিন ওরা দুজনেই চলে গেল কাশীতে। সরোজা আর নারায়ণ।

বাড়িতে সেদিন রামদাসজী বললেন,—আর প্রস্‌পেক্‌টিং করবেন না?

—না। থাক্ না বন্ধ। যা করেছি, তারই ফলাফলের খবরটা আসুক, তখন দেখা যাবে।

—বেশ, তাই হবে।

মনের মধ্যে কিসের প্রতিক্রিয়া ঘটছিল কে জানে, হঠাৎ ব'লে ফেললাম,—রামদাসজী, আপনি ওই 'দেবীপল্লী' তুলে দেবার কথা বলছিলেন না? তাই করুন। তুলেই দিন।

রামদাসজী উৎফুল্ল দৃষ্টিতে তাকালেন,—আপনি রাজী তো?

—নিশ্চয়ই রাজী।

অবশ্য, ঘটনাটি যে এত সত্বর ঘটবে, ভাবতে পারি নি। রামদাসজী এক মাসের নোটিসে ওদের উঠে যেতে আদেশ জানালেন, ও-বাড়িটাকে করবেন ধর্মশালা। তা ছাড়া, নতুন আইনও তাঁর স্বপক্ষে।

বলা বাহুল্য, বিপুল আলোড়ন জাগলো।

তার পরে, একদিন এলো ডাক। বিশ্বনাথম্ নিজে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে এলো একদিন সকালে, একেবারে সরস্বতী আম্মার বাসায়। শুনলাম, ভামতীও এসেছে মায়ের কাছে।

বোধ হয় কথা বলছিলাম ওদের বাড়ির বাইরের বারান্দায় বসে আমরা তিনজন—আমি, নটরাজন আর বিশ্বনাথম্। কী হবে এই মেয়েদের? নটরাজন বললে, এদের আমি নাচ শেখাবো। এদের শিল্পী ক'রে তুলবো 'ভারতনাট্যমে'র, বিশেষ ক'রে 'কুচিপুডী' নৃত্যধারার।

বিশ্বনাথম্ বললে,—এরা হচ্ছে ক্রিচার অব-সারকমস্টান্সেস। শিল্পী-জীবন কাকে কতটা প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবে, সেটাই হচ্ছে সমস্যা।

এই সব আলোচনায় আমরা মগ্ন, হঠাৎ দেখি, ভিতর থেকে বাইরে এলো ভামতী। সবুজ পাড়ের সাদা বুটিদার একটা শাড়ি পরনে, গাঢ় সবুজ রঙের ব্লাউজ। অদ্ভুত একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে চেহারায়। যে মেয়ে এ কয়দিন পালিয়ে বেড়িয়েছে আমার কাছ থেকে, আজ সবার সামনে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো,—শোনো।

আশ্চর্য হয়েই চেয়ে আছি ওর মুখের দিকে। আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললে,—তোমাকেই বলছি। এসো আমার সঙ্গে। শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে যাবো।

আর সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে আমার পাশাপাশি চলতে লাগলো সে। না মন্দির নয়, ও বললে—অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারো এখন?

—কোথায় বলো তো?

—ওই পাহাড়টা পেরিয়ে—

উৎসাহিত হয়েই বলে উঠলাম,—পারবে যেতে? সুন্দর একটা ঝরনা আছে। তোমাকে দেখিয়ে আনবো।

সংক্ষেপে বললে,—চলো।

সেই মেঘমলিন দিনটিতে পর্বতের সানুদেশে কী যে চমৎকার বর্ণ ধারণ করেছিল সেই ঝরনাধারাটি, তা বলবার নয়। ঈষৎ নীলাভ একটা কুয়াশার অবগুণ্ঠন টেনে দিয়েছে যেন লজ্জাশীলা নববধূর মতো। দুজনে সেই খয়েরী পাথরটার উপরে বহুক্ষণ বসে রইলাম পাশাপাশি। চুপচাপ।

একসময় বললাম,—খুব রাগ করেছিলে, না?

—করবোই তো। কাঁদিয়েছিলে তুমি আমাকে। ভীষণ দুঃখ হয়েছিল। অভিমানও।

—ক্ষমা করো।

উত্তরে কিছু না ব'লে আমার একটা হাত টেনে নিয়ে নিশ্চুপে বসে রইল কিছুক্ষণ।

বলে উঠলাম,—এই যে এভাবে চলে এলে, ওরা কেউ কিছু মনে করলো না তো?

—এ কথা তোমার মনে হলো কেন?

—এমনি।

বললে,—নটরাজনের কথা তুমি শুনেছো, না?

অল্প একটু হেসে চুপ করে রইলাম। চুপচাপ চারিদিক। ঝিরঝির করে ঝরনার একটি ধারা বয়ে চলেছে আমাদের কাছ দিয়ে, সেই দিকে দুটো-একটা পাথরের নুড়ি ছুঁড়তে ছুঁড়তে একসময় বলে উঠলো,—শোনো।

—কী?

—একটা রহস্য ভেদ করে দিতে পারো?

—কী?

—মনের মধ্যে এই আবেগের সৃষ্টি করে কে? কে হঠাৎ ভিতর থেকে বলতে থাকে—এই-ই সেই, যাকে তুমি খুঁজছো। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করি তাকে। তার চলার ভঙ্গি, বলার ভঙ্গি, তাকাবার ভঙ্গি—সব-কিছু ভালো লাগতে থাকে।

একটু থেমে ধীর কণ্ঠে বললে,—মিথ্যে বলবো না, নটরাজনকে দেখেও একদিন আমার ও-রকম হয়েছিল। একটি মুহূর্ত ওকে না দেখলে মনে হতো, বুঝি পাগল হয়ে যাবো।

—খুব ভালবাসো বুঝি?

দীর্ণকণ্ঠে বলে উঠলো,—কেমন ক'রে তোমাকে বোঝাবো! সেই লোক, যার কণ্ঠস্বরটুকু শুনলেও নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম, তার আজ কিছুই ভাল লাগে না আমার। তুমি বিশ্বাস করবে? তার সঙ্গও বিস্বাদ লাগে।

বললাম—এ-রকমটা হয় নাকি?

—হয়।—আশ্চর্য এক কণ্ঠে ও বলতে লাগলো,—আজ আমাকে ঠিক তেমনি করে পাগল করেছ তুমি। তোমাকে একটি মুহূর্ত কাছে না পেলে বুকের ভিতরটা গুমরে গুমরে মরে।

তুমি সারারাত বসে নটরাজনের বীণা শুনলে আমার কাছে এলে না, তাতে এমন ভীষণ রাগ হলো যে, পরদিন,—ছুটি ফুরোবার আগেই গিয়ে ও বাড়িতে গিয়ে ঢুকলাম তোমাকে জব্দ করবার জন্য। আর তার বদলে নিজেই হলাম জব্দ। কখনো মনে যে দ্বন্দ্ব ছিল না, সেই দ্বন্দ্ব দেখা দিলো। মনে হলো, পুরুষোত্তমই যে নিত্য নতুন রূপ ধ'রে আসেন, এ চিন্তাটা ভুল, মস্ত বড়ো ফাঁকি !

বলতে বলতে দুহাতে মুখ রেখে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লো। ওর মুখখানা তুলে ধরবার চেষ্টা করতে করতে বললাম,—এই দেখো কী হলো। কাঁদছ কেন অমন করে ?

অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা নিজেই তুলে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, —তুমি চলে গেলে আমি কী করবো বলো ত ?

চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ, আস্তে আস্তে ও একটু শান্ত হয়ে আসবার পর বললাম,—আমাকে কি কাছে পেতে চাও অনুক্ষণ ?

সেই নির্জন নিভৃত পার্বত্য-প্রদেশে আমাকে দুটি বাহু দিয়ে কাছে টেনে নিলো সে, কেউ কোথায় দূরে-অদূরে আছে কিনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলো না, যেন প্রমত্ত হয়ে উঠলো মুহূর্তে, ডেকে উঠলো,—কবি ! ভামতীর কবি !

উচ্ছ্বাসের ঢেউ স্তিমিত হয়ে এলে আমি ওকে ধীরে ধীরে বলতে লাগলাম, এই ঝরনার ধারেই আমি এসে বসতাম অবসর পেলে। দেখে দেখে চোখ সত্যিই একসময় ভিজে উঠতো। কী যে আনন্দ হতো ! কেন এমন হয় বলতে পারো ?

খুশির তরঙ্গে যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল মুহূর্তে, আঁচলে চোখ মুছে ও বললে,— আমি জানতাম।

—কী ?

—তোমার মধ্যে এমনটি হবে। চোখ মেলে দেখতে জানে কজন গো ? কজন আনন্দ-রসে মগ্ন হতে পারে ? আমি জানি, তুমি তা পারবে।

বললাম,—ঠিক বুঝি না তোমার কথা, তবে দিন দিন যে পরিবর্তনের মুখে এগিয়ে যাচ্ছি, তা বেশ বুঝতে পারছি।

হঠাৎ বলে উঠলো,—আচ্ছা। তোমার কী হয় বলো না ? অর্থাৎ আমাকে না দেখে থাকতে পারো ?

বললাম,—সত্যি বলবো ? আজ বলতে বাধা নেই, কষ্ট হয়।

সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন শিউরে উঠলো, বললে,—কী হবে !

—কিসের কী ?

—তুমি যদি সত্যিই ভুলতে না পারো আমাকে ?

একটু অবাকই হলাম ওর কথায়, বললাম,—এ-কথা আসছে কেন ?

একটা আশ্চর্য কথাই শুনলাম এবার। ও বললে—মার কাছে শুনেছি, সহজে ধরা দাও না তোমরা। কিন্তু যদি একবার ধরা পড়ো তো, তোমাদের অবস্থা হয়ে পড়ে শিশুর মতো। সেটাই চিন্তার।

কেন ?

চোখ দুটি দেখতে দেখতে আবার সজল হয়ে উঠলো, আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল কণ্ঠ, কোনক্রমে বলতে লাগলো,—তোমার ভালবাসা পাওয়া যে-কোনও মেয়ের পক্ষে ভাগ্যের কথা, জানো ?

—কেন ?

—গভীরতার জন্য।

সেদিন, সেই মুহূর্তে, সেই পরিবেশে, ওর এ কথার উত্তর দিতে পারি নি। বলতে পারি নি, তোমার কথা সত্যি নয়। ওর সৃষ্টি-করা 'কবি' আমার সত্তাকে সেদিন অতিক্রম করে গিয়েছিল বলা চলে। ওর 'কবি' আমাকে নির্বাক করে দিয়েছিল।

যাই হোক, বাড়ি ফিরে আসার পর নটরাজন একসময় আমাকে একা পেয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো, বললে,—ওকে ভালবাসো তা জানি। থাকো না এখানে ওকে নিয়ে চিরজীবন ? ও-ও সুখী হবে।

একটু হেসেই বললাম—কী ক'রে জানলে ?

বললে,—মেয়েদের ভালবাসার দুটি প্রকৃতি আছে। এক, সংস্কার বা অঙ্গীকারের কাছে আত্মসমর্পণ। আর-একটি হচ্ছে, মুক্ত মনের বিকাশ। এই মুক্ত মন কখনও বাঁধা পড়ে না। পড়লে, সে হয় অপার্থিব, অসামান্য এক কাব্যলীলা। ওর হয়েছে তা-ই। তোমাকে না পেলে ও মরে যাবে।

বললাম,—তোমার কষ্ট হবে না এতে ?

—ছিঃ !—তিরস্কারের সুরে বলে উঠলো,—বলছো কী তুমি ! শুধু একটা কথা। নৃত্যশিক্ষার সুযোগটুকু দিও। অমন ছন্দোময় দেহ সৌষ্ঠব সহসা চোখে পড়ে না।

পরদিন সকালবেলা গিয়ে পৌছতে না-পৌছতেই হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেল। সরস্বতী আম্মা আমাকে কাছে বসিয়ে নানান গল্প করতে লাগলেন। তার পর বললেন,—যাও, পাশের ঘরে যাও। ওর পূজো সারা হয়েছে।

গেলাম। সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনটির মতই ঝরঝর বর্ষণ শুরু হয়েছে। গবাক্ষের বাইরে সেদিনের মতই চলেছে কৃষ্ণমেঘপুঞ্জের লীলা। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আকাশে মেঘ-সঞ্চার লক্ষ্য করতে করতেই বলে উঠলাম,—শুনছো? কী ঠিক করলাম জানো? যাবো না। ঘর বাঁধবো এখানে। তুমি আর আমি।

আমার পায়ের কাছে এসে বসলো মাটিতে। তারপরে আমার পায়ের উপর মাথা রেখে চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। বাইরে চলেছে ঝরঝর—ঝমঝম বৃষ্টি। একটা ময়ূর কোথায় যেন ডাকছে প্রমত্তের মতো।

বললে,—এত লোভ দেখাও কেন তুমি?

—লোভ!

বললে,—এর থেকে লোভের বস্তু আমার কী থাকতে পারে?

খাটিয়ার প্রান্তে বসে পড়ে, ওর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাতে বুলাতে ডেকে উঠলাম,—ভামতী!

—উঁ?

বললাম,—দুজনে যেমন সেই ঝরনার কাছে গিয়েছিলাম, তেমনি মাঝে মাঝে বেড়াতে যাবো—দুজনে। কেমন?

—তারপর?

—তারপর? একদিন শুধু ওই ঝরনাই নয়, যাবো দেশ-বিদেশ। যাবো সমুদ্র দেখতে, তুমি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠবে, কী সুন্দর!

—আর তুমি?

—আমি? আমি দু চোখ ভরে দেখবো তোমার সেই অবাক হওয়া দুটি চোখ।

থরথর করে কেঁপে উঠলো ওর ঠোঁট দুটি, কান্নাভরা কণ্ঠে কোনক্রমে বলে উঠলো—ব'লো না এমন ক'রে। ওগো, একটা কথা বলবো?

—বলো।

দুটি অশ্রুভরা চোখ আমার দিকে মেলে বলে উঠলো,—কালই তুমি চলে যাও এখান থেকে। দেরি ক'রো না।

অবাক হয়ে বলে উঠলাম,—কেন?

অস্থির, অসহিষ্ণু, অথচ দুঃখদীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো ভামতী,—রামচন্দ্র যেমন সীতাকে নির্বাসনদণ্ড দিয়েছিলেন, আমাকে তেমনি ক'রে ত্যাগ করতে পারবে না তুমি?

কী এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো আমাব বুক, বললাম,—কী হয়েছে বলো তো ?

বললে,—কী জানো ? বিষাক্ত হয়ে গেছে আমার মন। তাই ভয় হয় গো, তাই ভয় হয়।

—কিসের ভয় ?

আমার পায়ে ঠোঁটের ছোঁয়া রেখে বার বার বলতে লাগলো,—সবই তো তুমি জানো, সবই তো বলেছি আমি তোমাকে।

—তাতে হয়েছে কী ? পিছিয়ে যাচ্ছো কেন ? আমি দেশেই ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নিয়ে, আমার দেশে আমার ঘরে।

—ওগো, না গো না,—বলে উঠলো সে,—সে কামনা ক'রো না। আমি সব থেকে ভয় করি নিজেকে। আজ তোমাকে যেমন ভালবাসি, একদিন তো অন্যকেও ভালবেসেছিলাম ? যদি আবার সেইরকম কিছু ঘটে ? যদি আমার পুরানো হয়ে যায় আমার প্রেম ? যদি একদিন তোমারই সঙ্গ আমার কাছে অসহ্য লাগে ?

সুকঠিন বিস্ময়ে নির্বাক হয়েই তাকিয়েছিলাম ওর দিকে। সে দৃষ্টি লক্ষ্য করে যেন আর্তনাদ করে উঠলো ও। সহসা বললে,—অমন ক'রে আমার দিকে চেয়ো না। তুমি পুরুষ, তোমার এ দুঃখ দুঃখই থাকবে না একদিন। না না, তুমি বাঁধা পড়ো না, তুমি চলে যাও।

প্রস্তরখণ্ডের মত নিথর-নিশ্চুপ বসে ছিলাম বহুক্ষণ, মনে আছে। একসময় বলে উঠেছিলাম,—সরস্বতী আম্মার কথাও তো শুনেছি। কিন্তু তিনি তো—

বাধা দিয়ে বলে উঠলো,—মায়ের মনের দৃঢ়তা—মায়ের তপস্যার শক্তি, সে আমার নেই। আমি তাই ভরসা করি না তোমাকে কাছে রাখতে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে,—পারো তো আমাকে ঘৃণা ক'রো, ভালবেসো না।

বৃষ্টিটা ততক্ষণে ধরেছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, জানি না সেটা সম্ভব হবে কিনা—কিন্তু একটা কথা, যাওয়ার আগে একটিবারও দেখা হবে কী ?

দুই পিপাসিত দৃষ্টি মেলে বললে,—হবে গো হবে।

তারপরে মুখখানা নত ক'রে ধরা গলায় বললে,—আজ সন্ধ্যায় ও-বাড়িতেই এসো না হয়। আজকাল তো আর ওসব ব্যাপার নেই। বন্ধ হয়ে গেছে। তুমি এসো। তোমার কোনও অসুবিধা হবে না।

বলেই প্রণাম করলো পায়ে মাথা ঠেকিয়ে। বললে,—হাতের আংটিটি কখনও কাছছাড়া ক'রো না, ঐ পোখরাজ-মণিই তোমাকে রক্ষা করবে আমার মোহ থেকে।

ম্লান একটু হেসেছিলাম মাত্র, আর-কিছু বলিনি। চলেই আসছি, বাইরের ঘরের চৌকাঠে পা দিতে না-দিতেই পিছন থেকে শুনতে পেলাম ওর ডাক,—শোনো ?

দাঁড়ালাম। এঘরেও তখন ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই। আমার একটি হাত দু হাতে ধ'রে দুটি জলভরা চোখে বললে,—জানি, আমার কথা অনেক দিন তোমার মনে পড়বে, কিন্তু তবু চেষ্টা করো, ভেবো না আমার কথা। আমাকে ঘৃণা করতে শেখো। আমি যে কতো ছলনাময়ী, আমি যে কতো নিষ্ঠুর, আমি যে কতো মায়াবিনী, আমি যে কতো—

শেষ করতে পারলো না কথা, দু হাতে মুখ ঢেকে ছুটে পালালো, যেন আশ্রয় নিলো গিয়ে কক্ষান্তরের নিভৃতে।

সারাটা দিন ঐ বৃষ্টিভরা আকাশটার মতোই থমথমে মন নিয়ে কাটিয়ে দিলাম। রামদাসজীকে বললাম,—দেশে যাবো ভাবছি, মনটা হঠাৎ একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ছুটি নিলাম।

মুখে ওঁকে এ-কথা বলেছি বটে, মনে মনে বেজেছে অন্য সুর। দুরন্ত অভি-মানের কঠিন স্তর যতই দ্রবীভূত হয়েছে তাই কেবলি মনে হয়েছে, সন্ধ্যায় যখন দেখা হবে, তখন ও নিশ্চয়ই বলবে,—কী বলতে কী বলেছি, আমাকে নিয়ে চলো তুমি যেখানে খুশি—কিংবা, মাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না, তুমিও থাকো এখানে, চিরদিনের মতো।

কিন্তু যা আশা করা যায়, তা-ই কি সবসময় ঘটে ?

সেই বাড়িতে, সন্ধ্যাবেলা, ওর সেই ঘর খুঁজে খুঁজে বার করলাম, দেখি ঘর বন্ধ, প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে দরজায়।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম ওই তালাটিকেই। ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই। শুধু নটরাজনের ঘর থেকে ভেসে আসছে বীণার-সুর, হাহাকারের মতো—কান্নার মতো !

ধীরে ধীরে ওর ঘরের কাছে এসে দাঁড়ালাম। দরজা খোলা। আমাকে

দেখতে পেয়েই একসময় ও থামিয়ে দিলো বীণা। তারপরে খাট থেকে নেমে এসে দাঁড়ালো আমার পাশে। নিশ্চুপেই একটা হাত তুলে দিলো আমার কাঁধের ওপর। প্রশ্ন করতে গিয়ে গলাটা একটু কেঁপে গেল, বললাম,—কোথায় ভামতী ?

বললে,—জানি না। তবে, আমার কাছে কাল এসেছিল। তুমি তো জানো, আজকাল আমি এ-বাড়িতেই থাকি। ভামতী যা কোনদিন করে না, তাই করেছিল কাল। আমার ঘরে ঢুকে হঠাৎ প্রণাম করেছিল আমার পায়ে। বলেছিল,—আমাকে নাচ শেখাতে চাও না ? শেখাও। কাল সন্ধ্যায় এসো আমার ঘরে। দিও আমাকে তোমার নাচের প্রথম পাঠ। আমার 'নট্টুভান' হিসাবে তোমাকেই বরণ ক'রে নেবো।

একটু থেমে তারপর আবার নটরাজন বললে,—কিন্তু কাল ঘরে এসে যখন কথা বলছিল, তখন ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম, ও প্রচণ্ড ভুল করেছে। ভেবেছে, আমার কামনার বহ্নি বুঝি নেভে নি। ভেবেছে, আমি বুঝি আজও ওকে চাই। ভেবেছে, মনের কোণে আজও বুঝি জেগে আছে ওকে কাছে পাবার সূক্ষ্ম কামনা !

রুদ্ধকণ্ঠে বললাম,—তারপর ?

নটরাজন বললে,—কিন্তু আমার মনের ভাব আমি ওকে বুঝতে দিলাম না। জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি যে আমার ঘটে গেছে, এটা বুঝতে পারলে ওর আত্মাভিমানে ঘা লাগতে পারে। মেয়েদের মন তো ? এসব ব্যাপারে ভয়ানক অভিমান থাকে ওদের। তাই বললাম, বেশ। যাবো।

নটরাজন থামলো। আমি বললাম,—গিয়েছিলে ?

উত্তর এলো,—না। ও যে থাকবে না, এ-ও জানতাম।

—ওর ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে।

নটরাজন বললে,—তাও শুনলাম। কিন্তু কখন থেকে যে ঝুলছে তা কেউ জানে না। দেখছো তো, বাড়ির অবস্থা ? নিজের নিজের ইচ্ছামত সব মেয়েই চলে গেছে কোথায়-কোথায় যেন। আছে শুধু আমার ছাত্রী ভারাহালু, আর অন্য দুটি মেয়ে। এরা ভালভাবে সত্যিকার নাচ শিখবে, শিল্পী হবে। আমি এদের নিয়ে যাবো কুচিপুড়ি গ্রামে।

বললাম,—আচ্ছা ? ভামতীর খোঁজ করেছো তার বাড়িতে ?

—না।

—এসো না, খুঁজি।

—বেশ। চলো।

প্রথমেই গেলাম বিশ্বনাথমের কাছে।

বিশ্বনাথম্ বললে,—বেলা বারোটা নাগাদ ভামতী এসে ঘরের চাবি দিয়ে গেছে আমার হাতে, বলেছে,—সে বাড়ি যাচ্ছে, মায়ের কাছে।

কিন্তু মায়ের কাছেই বা কোথায় ভামতী ?

নটরাজন ধীরে ধীরে ফিরে গেল তার নিজের ঘরে, সরস্বতী আম্মা বসলেন গিয়ে পূজোয়। ডাকলেন শুধু আমাকে। বললেন,—তুমি আমার কাছে এসো।

কাছে গিয়ে বসলাম। পূজোর আসনে বসেও স্থির থাকতে পারছেন না তিনি, বার বার চোখে জল এসে পড়ছে, কথা বলতে গিয়েও আটকে যাচ্ছে কথা, দেবতার ধ্যানের জন্যও আপন চিত্তকে স্থির রাখতে পারছেন না। বললেন,—সে বিকেলের দিকেই রওনা হয়ে গেছে বাবা। বলেছে, কোনও মন্দিরে গিয়ে সে আশ্রয় নেবে। দূরের নিভৃত কোনও মন্দিরে।

—কিন্তু কেন ?

সরস্বতী আম্মা বললেন,—মন্দিরই তো আমাদের শেষ আশ্রয় বাবা। কেউ ঘরে বসেই মনটাকে বাঁধতে পারে, তখন তার কাছে ঘরটাই হয়ে ওঠে মন্দির। আর তা যে না পারে, তাকে ছুটতে হয় মন্দিরে। কাঁদতে হয়, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাঁদতে হয়, বলতে হয়—ওগো প্রিয়তম, আমার মনটাকে তোমার মন্দির ক'রে নাও। মন ধীর—মন্দির।

বললাম,—কিন্তু মা, আমাকে সে শেষ পর্যন্ত ভয় করলো ?

—তোমাকে নয় বাবা—সরস্বতী আম্মা বলতে লাগলেন,—আমি তাকে জানি। তার ভয় শুধু নিজেকে। তাই সে পালালো। সব দেখে শুনে যেতে দিলাম, যাক ও যেখানে খুশি, শান্তি পাক। দুঃখ ক'রো না, তোমাকে সে প্রাণ ঢেলেই ভালবাসে। এই প্রেমকে সে পেতে চায় ধ্যানের মধ্যে, স্মৃতির মধ্যে ; প্রেমকে সে প্রদীপ করতে চায়। কথাটা তুমি হয়তো আজ বুঝবে না, বুঝবে অনেক পরে, যখন আমাদের মতন বয়সে জীবনের সমস্ত ধূপ জ্বলে জ্বলে স্মৃতির ভস্মটুকু পড়ে থাকবে মাত্র মনের কোণে।

আমাকে ঘৃণা করতে শেখো। আমি যে কতো ছলনাময়ী, আমি যে কতো মায়াবিনী, আমি যে কতো !……

……আজও মাঝে মাঝে কানের কাছে অতর্কিতে বেজে ওঠে তার সেই কণ্ঠস্বর।

কতোদিন, কতো মাস, কতো বছর কেটে গেছে,—কতো পরিবর্তন এসেছে আমার জীবনে। দুঃখ-সুখের কত পালার মধ্য দিয়ে পার হয়ে চলেছে আমার জীবন। কতো নিষ্ঠুরতা কতো হৃদয়হীনতার পরিচয় পাই দৈনন্দিনতার মধ্যে। কতো মিথ্যা, কতো হীনতা এসে আঘাত দেয় প্রাণের মধ্যে,—তবু মনের আকাশ সংশয়ের মেঘে ঢেকে যায় না। যখন চারিদিকে শুনি নৈরাশ্যের হাহাকার কিছু হচ্ছে না, কিছু হয় নি, কিছু ভালো নয়, কেউ ভালো নয়, সব খারাপ, —তখন অনুকম্পা জাগে। আমি যে জানি, নিশ্চয়ই আছে কোথাও আলোকের রাজ্য। অতীতেও ছিলো, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আজও মানুষ মানুষকে ভালবাসছে দেখলে মন খুশি হয়ে ওঠে, আজও প্রকৃতির শোভা দেখে ভরে যায় দুটি চোখ। মনের কন্দরে আজও উঁকি দেয় কোনও "ছলনাময়ী", আজও বুঝি মধুর কণ্ঠে ডেকে ওঠে কোনও মায়াবিনী —কবি!

না। তাকে ঘৃণা করতে পারি নি। আজও তার দেওয়া পোখরাজ মণিটির দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে বিভ্রম ঘটে। মনে হয় ও বুঝি মণি নয়, কার এক ফোঁটা চোখের জল চিরকালের জন্য আমার কাছে বাঁধা পড়ে আছে।

———